সমাজবিজ্ঞান

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC1859

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট (এইচএসসি) প্রোগ্রাম

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজবিজ্ঞান

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC1859

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট (এইচএসসি) প্রোগ্রাম

রচনায়

ড. ইকবাল হুসাইন

মো. আব্দুস সাত্তার

ড. আবু রাসেল মুহাঃ রিপন

মনিশংকর সরকার

সম্পাদনায়

ড. মাহবুবা নাসরীন

ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন

সমন্বয়কারী

ড. ইকবাল হুসাইন

মো. আব্দুস সাত্তার

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজবিজ্ঞান

কোর্স কোড : HSC1859
এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১৭
পুনঃমুদ্রণ : আগস্ট,২০১৮; মার্চ, ২০১৯; জানুয়ারি, ২০২০: জুন, ২০২৪; ডিসেম্বর, ২০২৫
অনলাইন সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২২;

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ শরিফুল ইসলাম

© **বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়**

ISBN : 978-984-34-3155-4

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ
সৃষ্টি প্রিন্টার্স
৪৮, হাসেম রোড
মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : সমাজবিজ্ঞান **কোর্স কোড : HSC 1859**

জাতীয় জীবনের উন্নয়নে ও গতিশীল জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। সুশিক্ষিত জনশক্তি ছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা ও প্রাথমিক স্তরের অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে গড়ে তোলা। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত উন্নতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, সমকালীন চাহিদা ও পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েছে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণের বিকল্প নেই। এ বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র বইটি।

দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে এইচএসসি প্রোগ্রামের স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র বইটি রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একইসাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। এ কারণে বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বোঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। কোর্সবইটি মোট ১৩ টি ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিট আবার কতগুলো পাঠে বিন্যস্ত। প্রতিদিন গড়ে একটি করে পাঠ অধ্যয়ন করলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কোর্সটি সম্পন্ন হবে।

প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা এবং পাঠসমূহের শিরোনাম দেয়া হয়েছে। ইউনিটটি অধ্যয়নে ক'দিন ব্যয় হবে তা ও ইউনিটের শুরুতে বলা আছে। প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের শিখনফল/উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিখনফল অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কি না শিক্ষার্থী তা যাচাই করতে পারবেন। প্রতিটি পাঠের শেষে ঐ পাঠের সার-সংক্ষেপ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীদের স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়ন এবং ইউনিটের শেষে চূড়ান্ত মূল্যায়নে নমুনা আকারে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদি সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন এবং সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে।

কোর্সটি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থীরা যাতে এ বইটি পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল:

- ইউনিটের শিরোনাম, ভূমিকা এবং পাঠ-শিরোনাম পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠের সবগুলো 'উদ্দেশ্য' পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- কোনো পাঠের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- বিষয়বস্তু ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে অনুশীলনের জন্য প্রতিটি পাঠে "শিক্ষার্থীর কাজ" সংযোজন করা রয়েছে। পাঠের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অধ্যয়ন করে "শিক্ষার্থীর কাজ" সম্পন্ন করুন।
- অধ্যয়ন শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করুন এবং ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। চূড়ান্ত মূল্যায়নেও নমুনা আকারে বহুনির্বাচনি (নৈর্ব্যক্তিক), বহুপদি সমাপ্তিসূচক এবং সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। এগুলোও সঠিকভাবে অনুশীলন করুন। প্রয়োজনে আপনার স্টাডি সেন্টারের টিউটর এবং সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করুন। দেখবেন সমাধানের পথ সহজ হয়ে গেছে।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

অধ্যয়ন শুরু করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সব আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে পরিচিত হতে হবে। এতে পূরো কোর্স-মডিউল এর কোনটি শিখনফল, কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোনটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন এবং কোনটি উত্তরমালা সে সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে এ পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

কোর্সবই অনুসরণের নির্দেশনা	কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	শিক্ষার্থীর কাজ	সারসংক্ষেপ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	উত্তরমালা	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজনে

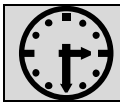 **কোর্স সমাপ্তির সময়**	**কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮৫ দিন**

অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র কোর্সটির বেশকিছু ভিডিও প্রোগ্রাম বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন। বাউবি-টিউবেও বিভিন্ন ভিডিও-লেকচার আপলোড করা হয়েছে। বাউবি'র ওয়েব টিভি এবং ওয়েব রেডিও'তেও নিয়মিত প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়। বাউবি'র ওয়েব সাইটে কোর্সটির 'ই-বুক' রয়েছে। উল্লিখিত মাধ্যমগুলোর যেকোনোটি থেকে আপনি আপনার শিখন প্রক্রিয়া সমৃদ্ধ করতে পারেন।

	সহায়তা প্রয়োজন হলে পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন:	**আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স-টিউটর** **অথবা,** **ড. ইকবাল হুসাইন** এবং **মো. আব্দুস সাত্তার** ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

সূচিপত্র

ইউনিট-১ : সমাজবিজ্ঞানের প্রারম্ভিক ধারণা ---------- ১-২৫

পাঠ-১.১: সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ---------- ২

পাঠ-১.২: সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও আলোচ্য বিষয়---------- ৪

পাঠ-১.৩: সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা---------- ৭

পাঠ-১.৪: সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ---------- ৯

পাঠ-১.৫: সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক : সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান ----------১৩

পাঠ-১.৬: সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ----------১৫

পাঠ-১.৭: সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি ---------- ১৭

পাঠ-১.৮: সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস ১৯

পাঠ-১.৯: সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ২১

পাঠ-১.১০: সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ ২৩

ইউনিট- ২: সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা---------- ২৬-৩৯

পাঠ-২.১ : বিজ্ঞানের ধারণা এবং সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা ----------২৭

পাঠ-২.২ : গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ----------২৯

পাঠ-২.৩ : সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি গবেষণা পদ্ধতি : সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি ----------৩১

পাঠ-২.৪ : ঘটনা অনুসন্ধান এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি----------৩৪

পাঠ-২.৫ : জরিপ পদ্ধতি এবং পিআরএ ---------- ৩৬

ইউনিট- ৩ : সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান ----------৪০-৬৫

পাঠ-৩.১ : অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান ---------- ৪১

পাঠ-৩.২ : ইবনে খালদুন ----------৪৩

পাঠ-৩.৩ : অগাস্ট কোঁৎ ----------৪৫

পাঠ-৩.৪ : হার্বার্ট স্পেন্সার----------৪৯

পাঠ-৩.৫ : এমিল ডুর্খেইম----------৫২

পাঠ-৩.৬ : কার্ল মার্কস ---------- ৫৬

পাঠ-৩.৭ : ম্যাক্স ওয়েবার ----------৬১

ইউনিট-৪ : সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক প্রত্যয় ---------- ৬৬-৮৯

পাঠ-৪.১: সমাজ ----------৬৭

পাঠ-৪.২: সম্প্রদায় ---------- ৬৯

পাঠ-৪.৩: দল ----------৭৩

পাঠ-৪.৪: প্রতিষ্ঠান ও সংঘ ----------৭৬

পাঠ-৪.৫ : সংস্কৃতি ও সভ্যতা ---------- ৮০

পাঠ-৪.৬ : সমাজ কাঠামো ---------- ৮৩

পাঠ-৪.৭ : প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতি ---------- ৮৫

ইউনিট-৫ : সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ----------৯০-১১২
পাঠ-৫.১ : বিবাহ: ধারণা ও ধরন ---------- ৯১
পাঠ-৫.২ : পরিবার: ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ----------৯৫
পাঠ-৫.৩ : পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব ---------- ৯৮
পাঠ-৫.৪ : পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলি ----------১০২
পাঠ-৫.৫ : পরিবারের সাম্প্রতিক প্রবণতা ----------১০৭
পাঠ-৫.৬ : জ্ঞাতিসম্পর্ক ----------১১০
ইউনিট- ৬: সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ ---------- ১১৩-১২৮
পাঠ- ৬.১: সমাজজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব ---------- ১১৪
পাঠ- ৬.২: সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব ----------১১৮
পাঠ- ৬.৩: সমাজজীবনে গোষ্ঠীর প্রভাব ----------১২১
পাঠ- ৬.৪: সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব ---------- ১২৫
ইউনিট- ৭: সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ---------- ১২৯-১৩৭
পাঠ- ৭.১: সামাজিকীকরণের ধারণা ও প্রক্রিয়া ---------- ১৩০
পাঠ- ৭:২: সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ ---------- ১৩৩
পাঠ- ৭.৩: সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব ---------- ১৩৫
ইউনিট- ৮: সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাস ----------১৩৮-১৬০
পাঠ- ৮.১: সামাজিক অসমতা: ধারণা, উৎপত্তি ও প্রকারভেদ ---------- ১৩৯
পাঠ- ৮.২: সামাজিক স্তরবিন্যাস: ধারণা ও প্রকারভেদ ---------- ১৪১
পাঠ- ৮.৩: সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ ----------১৪৪
পাঠ- ৮.৪: সামাজিক শ্রেণি ----------১৪৭
পাঠ- ৮.৫: জেন্ডার: ধারণা ও মতবাদ ---------- ১৫০
পাঠ- ৮.৬: জেন্ডার বৈষম্যের সামাজিক প্রভাব ---------- ১৫৩
পাঠ- ৮.৭: বৈষম্যবাদ: ধারণা, ধরন ও দৃষ্টিভঙ্গি ---------- ১৫৫
পাঠ- ৮.৮: সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা এবং মাধ্যম ---------- ১৫৮
ইউনিট- ৯: সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও গতিশীলতা ----------১৬১-১৭৫
পাঠ- ৯.১: সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ---------- ১৬২
পাঠ- ৯.২: সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ ---------- ১৬৪
পাঠ- ৯.৩: সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবার ও ধর্মের ভূমিকা ---------- ১৬৮
পাঠ- ৯.৪: সামাজিক গতিশীলতা ----------১৭০
পাঠ- ৯.৫: স্থানান্তর গমন: ধারণা, ধরন ও প্রভাব ---------- ১৭৩
ইউনিট- ১০: সমাজ ব্যবস্থা ---------- ১৭৬-২১০
পাঠ- ১০.১: সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ----------১৭৭
পাঠ- ১০.২: সম্পত্তি ---------- ১৮০
পাঠ- ১০.৩: সম্পত্তির বিবর্তন ---------- ১৮৩
পাঠ- ১০.৪: শিক্ষা ---------- ১৮৫
পাঠ ১০.৫: শিক্ষার শ্রেণি বিভাগ ও ভূমিকা ----------১৮৭
পাঠ ১০.৬: শিক্ষা মতবাদ ---------- ১৮৯

পাঠ ১০.৭: ধর্ম----------১৯১
পাঠ ১০.৮: ধর্মের উৎপত্তি ---------- ১৯৩
পাঠ ১০.৯ : নৈতিকতা---------- ১৯৬
পাঠ ১০.১০: রাষ্ট্র---------- ১৯৯
পাঠ ১০.১১: রাষ্ট্রের উৎপত্তি---------- ২০২
পাঠ ১০.১২: ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব---------- ২০৫
পাঠ ১০.১৩: কর্তৃত্বের ধরন, উপাদান ও প্রভাব---------- ২০৭
ইউনিট ১১: বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ----------২১১-২২৬
পাঠ ১১.১: বিচ্যুতিমূলক আচরণ ---------- ২১২
পাঠ ১১.২: বিচ্যুতিমূলক আচরণ সম্পর্কিত তত্ত্ব ---------- ২১৫
পাঠ ১১.৩: অপরাধ---------- ২১৮
পাঠ ১১.৪: অপরাধের কারণ ও প্রতিকার---------- ২২১
পাঠ ১১.৫: বিচ্যুতি ও অপরাধ: সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ---------- ২২৪
ইউনিট-১২: সামাজিক পরিবর্তন ----------২২৭-২৩৮
পাঠ ১২.১: সামাজিক পরিবর্তন: ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ ---------- ২২৮
পাঠ ১২.২: সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব: কার্ল মার্কস ও ভিলফ্রেডো পেরেটো---------- ২৩১
পাঠ ১২.৩: সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব ----------২৩৩
পাঠ ১২.৪: সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়ন----------২৩৫
ইউনিট-১৩: সামাজিক সমস্যা ----------২৩৯-২৬১
পাঠ ১৩.১: সামাজিক সমস্যা---------- ২৪০
পাঠ ১৩.২: দারিদ্র্য---------- ২৪৩
পাঠ ১৩.৩: দারিদ্র্যের কারণ ও দারিদ্র্য নিরসনের উপায়---------- ২৪৫
পাঠ ১৩.৪: বেকার সমস্যা ----------২৪৭
পাঠ ১৩.৫: জনসংখ্যা সমস্যা ---------- ২৪৯
পাঠ ১৩.৬: অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ---------- ২৫২
পাঠ ১৩.৭: মাদকাসক্তি ---------- ২৫৫
পাঠ ১৩.৮: দুর্নীতি ----------২৫৮

মানবণ্টন

পূর্ণমান : ১০০

সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র **কোর্স কোড : HSC 1859**

১) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন – ৬০ নম্বর (৬×১০ = ৬০)
০৯টি প্রশ্ন হতে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০ নম্বর।

প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

ক. জ্ঞানমূলক
খ. অনুধাবনমূলক
গ. প্রয়োগমূলক
ঘ. উচ্চতর দক্ষতামূলক

২. বহুনির্বাচনি (নৈর্ব্যক্তিক/MCQ) প্রশ্ন – ৪০ নম্বর (৪০×১ = ৪০)
৪০টি প্রশ্ন থাকবে, সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

সমাজবিজ্ঞানের প্রারম্ভিক ধারণা
Introduction to Sociology

ইউনিট ১

বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিটি শাস্ত্রেরই নিজস্ব আলোচ্য বিষয় (Subject matter) রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হচ্ছে 'সমাজ' (Society)। সহজ কথায় যে শাস্ত্র সমাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে তাই সমাজবিজ্ঞান (Sociology)। বস্তুত সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের বিজ্ঞান (The science of society)। তবে সমাজ প্রত্যয়টি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাই সমাজবিজ্ঞানকে সরাসরি 'সমাজের বিজ্ঞান' বললে অস্পষ্টতা থেকে যায়। কেননা অর্থনীতি ও রাজনীতি, আইন, ইতিহাস ইত্যাদি প্রত্যয়গুলোও সমাজঘনিষ্ঠ। কিন্তু এসব প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র শাস্ত্র বিকশিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান সমাজের এমন কিছু বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেয়, যে বিষয়গুলো অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। এ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১০ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১: সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
পাঠ-১.২: সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও আলোচ্য বিষয়
পাঠ-১.৩: সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-১.৪: সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি
পাঠ-১.৫: সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক : সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান
পাঠ-১.৬: সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান
পাঠ-১.৭: সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি
পাঠ-১.৮: সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস
পাঠ-১.৯: সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান
পাঠ-১.১০: সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ

পাঠ-১.১ সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
Definition and Nature of Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি।

সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজ এবং সমাজস্থ মানুষের সামাজিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা। সমাজবিজ্ঞান একটি নতুন বিজ্ঞান। ১৮৩৯ সালে সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁৎ 'Sociology' নামে এ শাস্ত্রের প্রবর্তন করেন। ইংরেজি Sociology শব্দটি ল্যাটিন Socious (সমাজ) এবং গ্রিক Logos (জ্ঞান) শব্দ থেকে উদ্ভুত। শব্দগত অর্থে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এখানে কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, সমাজবিজ্ঞান এমনই একটি বিজ্ঞান, যা সামাজিক সম্পর্ক এবং সমাজ নিয়ে এককভাবে পাঠ করে। ("Sociology alone studies social relationships themselves and society itself").

সমাজবিজ্ঞানী সামনার সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক প্রপঞ্চের বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ("Sociology is the science of social phenomena").

সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড ড্রেসলার বলেন, সমাজবিজ্ঞান হলো মানুষের আন্তক্রিয়ার বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন। ("Sociology is the scientific study of human interaction").

সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খেইম বলেন, সমাজবিজ্ঞান হলো প্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান। ("Sociology is the science of institutions").

সমাজবিজ্ঞানী শেফার বলেন, সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক আচরণ এবং মানব গোষ্ঠীর প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়ন। ("Sociology is the systematic study of social behavior and human groups").

সমাজবিজ্ঞানী স্মেলসার এর মতে, সমাজবিজ্ঞান হলো অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞান যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক অধ্যয়ন করে। ("Sociology is an empirical science that studies society and social relations").

ম্যাকস ওয়েবার সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। ("Sociology is the study of social action").

উল্লেখিত সংজ্ঞসমূহের প্রত্যেকটিই সমাজের এক একটি বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং প্রতিটি সংজ্ঞাই তাৎপর্যপূর্ণ। তাই সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক, আন্তঃক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান, আচার-আচরণ, সমাজের গঠন প্রণালী এবং পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামো সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ।

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি বলতে সমাজবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যেই এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত: সমাজবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়;

দ্বিতীয়ত: সমাজবিজ্ঞান সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ;

তৃতীয়ত: সমাজবিজ্ঞান তুলনামূলকভাবে একটি বিমূর্ত বিজ্ঞান, সুনির্দিষ্ট বস্তু বা ঘটনানির্ভর বিজ্ঞান নয়;

চতুর্থত: সমাজবিজ্ঞান সমাজের গঠন-কাঠামো সম্পর্ক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে;

পঞ্চমত: সমাজবিজ্ঞান সমাজকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করে;

ষষ্ঠত: সমাজবিজ্ঞান একটি তত্ত্বীয় বিজ্ঞান, ফলিত বা ব্যাবহারিক বিজ্ঞান নয়;

সপ্তমত: সমাজবিজ্ঞান সমাজের স্থিতিশীল, গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে;

অষ্টমত: সমাজবিজ্ঞান একটি বস্তুনিরপেক্ষ বিজ্ঞান, আদর্শ নির্দেশক বিজ্ঞান নয়।

উপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান সামগ্রিকভাবে সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণে মনোযোগী। এ বিশ্লেষণ বস্তুনিষ্ঠ এবং মূল্যবোধ নিরপেক্ষ।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞানের পাঁচটি প্রকৃতি উল্লেখ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞান একটি নতুন বিজ্ঞান। ১৮৩৯ সালে সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁত 'Sociology' নামে এ শাস্ত্রের প্রবর্তন করেন। ইংরেজি Sociology শব্দটি ল্যাটিন Socious (সমাজ) এবং গ্রিক Logos (জ্ঞান) শব্দ থেকে উদ্ভুত। শব্দগত অর্থে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি বলতে সমাজবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। সমাজবিজ্ঞান সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সুবিন্যস্ত ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ। শাস্ত্র হিসেবে সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণে মনোযোগী। বস্তুনিষ্ঠতা এবং মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'সমাজবিজ্ঞান হলো প্রতিষ্ঠানসমূহের বিজ্ঞান' কে বলেছেন?
(ক) এমিল ডুর্খেইম (খ) কার্ল মার্কস
(গ) ম্যাক্স ওয়েবার (ঘ) ফ্রাঙ্ক ওয়ার্ড

২। সমাজবিজ্ঞানের জনক কে?
(ক) ম্যাক্স ওয়েবার (খ) ফ্রাঙ্ক ওয়াড
(গ) অগাস্ট কোঁৎ (ঘ) সরোকিন

৩। কোনটি সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি নয় ?
(ক) সমাজবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান (খ) সাংস্কৃতিক সমাজবিজ্ঞান
(গ) সমাজবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয় (ঘ) সমাজবিজ্ঞান একটি তত্ত্বীয় বিজ্ঞান

৪। **Socious** শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
ক. হিব্রু খ. ইটালিক গ. গ্রিক ঘ. ল্যাটিন

পাঠ-১.২ সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও আলোচ্য বিষয়
Scope and Subject matter of Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজবিজ্ঞানের পরিধি আলোচনা করতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজবিজ্ঞানের পরিধি, আলোচ্য বিষয়।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি

সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণই সমাজবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সে অর্থে বলা যায় যে, পুরো সমাজই সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানের পরিধি কত ব্যাপক ও বিস্তৃত। অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর আলোকে বর্ণনা করেছেন-

১. **সামাজিক প্রতিষ্ঠান :** সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তি ও দলের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ নির্ধারিত হয়। কিভাবে মানুষের সমাজে নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে এবং কিভাবে এসবের ভেতর পরিবর্তন এসেছে এগুলোর বিচার বিশ্লেষণ করে সমাজবিজ্ঞান।

২. **সামাজিক পরিবর্তন :** সমাজ গতিশীল তাই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে সমাজের রূপান্তর একটি চিরন্তন সত্য। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সম্পর্ক, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করাই সমাজবিজ্ঞানের কাজ।

৩. **সামাজিক কর্মকাণ্ড :** সমাজবিজ্ঞানের পরিধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সামাজিক কর্মকাণ্ড। সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের নানাবিধ দিক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।

৪. **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ :** সমাজকে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালনা করাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কতগুলো আচার-অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৫. **সামাজিক ধারণা :** সামাজিক ধারণাসমূহ নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে। মরিস জিন্সবার্গের মতে, মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং এর ফলাফল সম্পর্কিত আলোচনাই হল সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

৬. **সামাজিক আদর্শ :** সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু হিসেবে সামাজিক আদর্শের ভূমিকা রয়েছে। কারণ সামাজিক আদর্শ ছাড়া কোনো জাতি কাঙ্ক্ষিত উন্নতি করতে পারে না।

৭. **সমাজের সামগ্রিক বিষয়ে আলোচনা :** মানুষের কার্যকলাপ এবং মানুষের সাংগঠনিক প্রতিভা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলো সমাজবিজ্ঞানের পরিধিকে অনেক বেশি বিস্তৃত করে তুলেছে।

৮. **সামাজিক সমস্যা :** নৈতিকতার প্রশ্নে সমাজবিজ্ঞান নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। কাজেই সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষণ করতে চায়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত অধ্যয়নের একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, যার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সমাজ জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা সমাজবিজ্ঞানের আওতায় আসে না। তাই বলা যায়, সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তথা সমগ্র মানবিক সম্পর্ক সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

সমাজে যত প্রকার সামাজিক ঘটনা আছে, অর্থাৎ সমাজে যা কিছু ঘটছে, সবই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অর্ন্তভুক্ত। সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে দল। আবার কতকগুলো কার্যপ্রণালী এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ আপন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। সমাজের এসব কিছুই সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। সমাজের বিভিন্ন দিক পঠন-পাঠন এবং গবেষণার জন্য সমাজবিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখা বিকশিত হয়েছে। এসব শাখা-প্রশাখা সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত। এখানে সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসেবে কতকগুলো শাখার উল্লেখ করা হল:

১. **সমাজবিজ্ঞানে তত্ত্ব (Sociological Theory)-** এ শাখাটি সমাজ পরিচালনার নিয়ম-রীতি, সমাজ পরিবর্তনের পেছনে কোন সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিসমূহ কাজ করে সে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব ও প্রত্যয়সমূহ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে।

২. **সামাজিক ইতিহাস (Social Historical)**- এ শাখা সমাজের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক বিকাশ তথা আদিম সমাজ থেকে বর্তমান সমাজ পর্যন্ত মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও গবেষণা করে থাকে।

৩. **পরিবারের সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Family)-** এ শাখায় পরিবারের উৎপত্তি, বিকাশ, পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট, পরিবারের কার্যাবলী এবং পরিবারের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে।

৪. **সামাজিক জনবিজ্ঞান (Social Demography)-** এ শাখায় জনসংখ্যাতত্ত্ব, জনসংখ্যার কাঠামো যেমন জন্মশীলতা, মৃত্যুশীলতা, জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, সমাজ জীবনের উপর এর প্রভাব যেমন বিবাহ, স্থানান্তর, সামাজিক গতিশীলতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে।

৫. **গ্রামীণ এবং নগর সমাজবিজ্ঞান (Rural and Urban Sociology)-** সমাজবিজ্ঞানের এ শাখায় যথাক্রমে গ্রামীণ সমাজ জীবনের প্রকৃতি এবং নগর সমাজের নানাবিধ দিক নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়।

৬. **ধর্মের সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Religion**)- এ শাখায় ধর্মের উৎপত্তি, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, প্রথা ও লোকাচারসহ, ধর্মের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৭. **শিক্ষার সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Education)-** সমাজবিজ্ঞানের এ শাখাটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক বিষয়ে পঠন-পাঠন এবং গবেষণা করে থাকে ।

৮. **সাংস্কৃতিক সমাজবিজ্ঞান (Cultural Sociology)**- এ শাখায় সংস্কৃতির সংজ্ঞা, ধরন, সংস্কৃতির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, সাংস্কৃতিক পার্থক্য, সাংস্কৃতিকরণ, সংস্কৃতির বিস্তার, আত্তীকরণ, সমাজ জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।

৯. **রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান (Political Sociology)**- এ শাখাটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয়াদির সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, গোষ্ঠী তথা নাগরিকের সম্পর্ক নিরূপণ করে। এটি বিশেষ করে সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রেসার গ্রুপ, প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে।

১০. **সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)-** এ শাখায় সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির মনোভাব, ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, শিক্ষণ ও সামাজিকীকরণ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।

১১. **উন্নয়নের সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Development)-** এ শাখায় উৎপাদন, বন্টন, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের যোগসূত্র বিশ্লেষণ করা হয়। তাছাড়া উন্নয়নের সমাজবিজ্ঞান উন্নয়ন-অনুন্নয়নের নানাবিধ মডেল, তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে।

১২. **অপরাধবিজ্ঞান (Criminology)**- সমাজবিজ্ঞানের এ শাখাটি সমাজের অপরাধ, এর ধরন, কারণ, প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে।

১৩. **চিকিৎসা সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞান (Medical Sociology)-** এ শাখায় মানুষের চিকিৎসার উপর ভিত্তি করে যেসব প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠেছে তার সামাজিক বৈশিষ্ট্য, প্রেক্ষিত ও তাৎপর্য আলোচনা করা হয়। এছাড়া রোগ-ব্যাধি,

অসুস্থতা, এর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব, জনসচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে এখানে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করা হয়।

১৪. **সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি (Social Research Method)-** এ শাখায় সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল, প্রত্যয় ইত্যাদি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও শিল্পকলার সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Art), লোক সমাজবিজ্ঞান (Folk Sociology), গোষ্ঠীর সমাজবিজ্ঞান (Sociology of Group), ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজবিজ্ঞান (Sociology of minority) ইত্যাদি শাখা-প্রশাখা সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়কে সমৃদ্ধ করেছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, সমাজবিজ্ঞানের পরিধি এবং বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজজীবনের এমন কোন দিক নেই যা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আওতায় আনা যায় না। এভাবে দেখা যায় যে, ব্যক্তির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রায় সম্পূর্ণ মানবিক আচরণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীগণ আলোচনা করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞানের ০৫ টি শাখা-প্রশাখার নাম উল্লেখ করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। বলা যায়, সমগ্র সমাজই সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত মুখ্য বিষয়বস্তুগুলো হল সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক ধারণা, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সমন্বয়, সামাজিক আদর্শ, সংস্কৃতি ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অর্ন্তত বিষয়সমূহ হল সামাজিক তত্ত্ব, ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান, পরিবারের সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক জনবিজ্ঞান, গ্রামীণ ও নগর সমাজবিজ্ঞান, ধর্মীয় সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষার সমাজবিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক সমাজবিজ্ঞান, রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, উন্নয়নের সমাজবিজ্ঞান, অপরাধবিজ্ঞান, চিকিৎসা সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি ?
(ক) সামাজিক গতি (খ) সামাজিক স্থিতি
(গ) সামাজিক ক্রিয়াকর্ম (ঘ) সামাজিক প্রগতি

২। যেকোন জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে উঠতে হলে কোন বিষয়টি অধিক প্রয়োজন?
(ক) কঠোর পরিশ্রম (খ) সামাজিক আদর্শ
(গ) সামাজিক মূল্যবোধ (ঘ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

৩। জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানের কোন শাখায় বেশি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়?
(ক) শিক্ষার সমাজবিজ্ঞান (খ) সাংস্কৃতিক সমাজবিজ্ঞান
(গ) সামাজিক মনোবিজ্ঞান (ঘ) সামাজিক জনবিজ্ঞান

৪। সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় কী?
(ক) সমাজ (খ) সমাজ ও সংস্কৃতি
(গ) মানুষের আচরণ ও সমাজ (ঘ) শিক্ষা ও সমাজ

পাঠ-১.৩ সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
Importance and Necessity of the Study of Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কারণ সমাজের মানুষ কিভাবে জীবন-যাপন করে, তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন রয়েছে। সমাজ উন্নয়নে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলেও সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তুত যেকোনো দেশ, জাতি বা সমাজকে টেকসই উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে হলে সমাজবিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নয়নের সামাজিক প্রভাব, দারিদ্র্য কিংবা অনুন্নয়নের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ব্যক্তি জীবনে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে সমাজবিজ্ঞান এক অপরিহার্য শাস্ত্র। সমাজের সার্বিক দিক জানার জন্যও সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিম্নে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

(১) সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জানা : সমাজবিজ্ঞান পাঠ করলে সামাজিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করার সুযোগ হয়। তাই যেকোনো সামাজিক সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ অত্যাবশ্যক।

(২) সমাজের শ্রেণি কাঠামো সম্পর্কে জানা : সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ বসবাস করে। অবস্থানভেদে তাদের সুযোগ-সুবিধা, সমস্যা-সম্ভাবনা, সামাজিক ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(৩) সমাজ সম্পর্কে জানা : সমাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। সমাজ কী, সমাজ কেন এবং কিভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে কিভাবে সমাজের কাঠামো পরিবর্তন ঘটেছে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব রয়েছে।

(৪) সমাজের মানুষ সম্পর্কে জানা : সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, জীবন প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়।

(৫) সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানা : পরিবর্তনশীল সমাজের গতি-প্রকৃতি এবং পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে অবগত হয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব রয়েছে।

(৬) সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে জানা : মানুষ সমাজেই বসবাস করে। সমাজ কিভাবে এবং কেন পরিবর্তিত হয়, এর প্রভাব, পরিবর্তনশীল সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ করতে হবে।

(৭) বিভিন্ন দেশের সমাজ সম্পর্কে জানা : সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে পারি। তাদের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি জানার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়।

(৮) সামাজিক উন্নতি বিধান : সামাজিক উন্নতি বিধানে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন। আর সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন ব্যতীত সমাজস্থ মানুষের চাহিদা, উপভোগ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা কখনও সম্ভব নয়।

(৯) সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা : সমাজের যেকোনো কাজ সফলতার সাথে সমাধান করতে হলে সমাজকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানা আবশ্যক। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মধ্য দিয়েই সমাজকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানা সম্ভব।

উপর্যুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন। সমাজ এবং সামাজিক জীবনের সার্বিক দিক সম্পর্কে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। সর্বোপরি,

সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় তথা মানুষের যাবতীয় মানবিক আচরণ সম্পর্কে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি ছক তৈরি করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজ ও সামাজিক ঘটনাবলিকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সমগ্র মানব সমাজ, সমাজস্থ মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, সমাজের গতি-প্রকৃতি, বিভিন্ন দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি, সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা, সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক উন্নতি বিধানে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও নবতর জ্ঞান অর্জন করার জন্য অবশ্যই সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা উচিত। সমাজবিজ্ঞান সমাজের জটিলতাকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক জ্ঞান দান করে। তাই আধুনিক সভ্য সমাজে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে মানুষের–
   (ক) ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানা যায়
   (খ) রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানা যায়
   (গ) আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, জীবন প্রণালী জানা যায়
   (ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

২। আধুনিক উন্নয়নের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে জানতে হলে প্রয়োজন–
   (ক) সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন
   (খ) অর্থনৈতিক গবেষণা
   (গ) পরিবেশবাদী আন্দোলন
   (ঘ) রাজনৈতিক সংস্কার।

পাঠ-১.৪ সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি
Origin of Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞান উৎপত্তিতে পথিকৃৎ সমাজ চিন্তাবিদদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি, সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎ, সমাজ চিন্তাবিদ।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে বিকাশ লাভ করেনি। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte) ১৮৩৯ সালে সর্বপ্রথম Sociology বা সমাজবিজ্ঞান শব্দটি উদ্ভাবন করেন। তবে সমাজকে অধ্যয়নের এ শাস্ত্রটিকে কোঁৎ প্রথমে Social physics বা সামাজিক পদার্থবিদ্যা বলে অভিহিত করেন। পরে এই বিষয়টিকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান হিসেবে নামকরণ করেন। সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি বিশেষ বিজ্ঞান যা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সমাজকে বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করে। সমাজবিজ্ঞান মানব সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করে থাকে। সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গতিশীল শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পঠন-পাঠন এবং গবেষণায় আগ্রহী।

সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ

সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান সর্বকনিষ্ঠ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শাস্ত্রটির উৎপত্তি হয়। সমাজের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। প্রাথমিক অবস্থায় মানব জীবন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রকৃতির অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশেই মানব চিন্তা বিকশিত হতে থাকে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা আদিকাল থেকে চলে আসছে। আদিতে সকল রকম চিন্তা-চেতনা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মানবচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারায় দর্শনশাস্ত্রের সীমানা পেরিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। এভাবে মানুষের বিচিত্র জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হিসেবে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।

প্রাচীন গ্রিক ও রোমান দার্শনিকদের লেখায় সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা সমৃদ্ধি লাভ করে। গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো এবং এরিষ্টটল এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মূলত প্লেটো, এরিষ্টটল ও পিথাগোরাস প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানকে দর্শনশাস্ত্রের আওতাভুক্ত বলে মনে করতেন। দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গ হিসেবেই তাঁরা সামাজিক বিজ্ঞানকে পর্যালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে প্লেটোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখন ধারাবাহিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ আলোচনা করা হলো।

কৌটিল্য

ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৫ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। কৌটিল্য চাণক্য ও বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। তবে খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রচিত অর্থশাস্ত্রের লেখক হিসাবে কৌটিল্য নামটিই বোদ্ধা সমাজে অধিকতর পরিচিত। কৌটিল্য ছিলেন প্রাচীন ভারতের প্রথম সম্রাট মৌর্যবংশীয় চন্দ্র গুপ্তের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থটি চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য শাসনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত। কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে তৎকালীন ভারতের আইন, রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, সমাজনীতি ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধ্যান-ধারণা রয়েছে।

প্লেটো

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে গ্রিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে মৃতুবরণ করেন। প্লেটো তাঁর *'Republic'* নামক গ্রন্থে সমাজ সম্পর্কে যেসব চিন্তার অবতারণা করেছেন সেসব মূলত যুক্তি নির্ভর হলেও বহুলাংশে কাল্পনিক । তিনি তাঁর গ্রন্থে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন, যেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকলের কল্যাণ সম্ভব। এ লক্ষ্যে তিনি বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন যা শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক বিকাশ লাভে সহায়ক। এ গ্রন্থে সামাজিক শ্রমবিভাজনের এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও প্রশ্নের পর্যালোচনা রয়েছে। তিনি একাডেমি নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ একাডেমিতেই প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল শিক্ষা গ্রহণ করেন ।

এরিস্টটল

গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪ অব্দে গ্রিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। প্লেটোর প্রিয় ছাত্র এরিস্টটল সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। *'The Politics'* গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের গঠন, সরকারের ধরন, শ্রেণি-নির্ভর সমাজের দাস-মনিব সম্পর্ক এবং সামাজিক বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর এসব মতবাদের সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। প্লেটোর চেয়ে এরিস্টটল অধিকতর বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মূলত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে একটি আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবে তিনি প্রাচীন গ্রিসের দাসপ্রথার বিলোপের কথা বলেননি। বরং তাঁর মতে, সমাজের অস্তিত্বের জন্য দাসপ্রথা ছিল অপরিহার্য। শিক্ষাদানের জন্য তিনি লাইসিয়াম নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

ইবনে খালদুন

উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দার্শনিক ও চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃতুবরণ করেন। মধ্যযুগের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন সমাজচিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি ঐতিহাসিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব-উল-ইবর্' রচনা করেন। এ গ্রন্থের দুটি খন্ড 'আল-মুকাদ্দিমা' এবং 'আল-উমরান' সমাজের গতি-প্রকৃতি এবং সমাজ জীবনে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইবনে খালদুন সমাজ জীবনের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সামাজিক সংহতি সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য social solidarity বা সামাজিক সংহতির গুরুত্ব রয়েছে। মধ্যযুগের এই মনীষী তাঁর চিন্তা-ভাবনা এবং জ্ঞান-দর্শনের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি সামাজিক সংহতিকে 'আসাবিয়াহ' (Assabiyah) বা গোষ্ঠীসংহতি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সঠিক ইতিহাস রচনায় সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইবনে খালদুনকে অনেকে সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলেও মনে করেন।

ম্যাকিয়াভেলি

ইটালীয় মনীষী ম্যাকিয়াভেলি ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। সমাজ দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি তাঁর 'The Prince' নামক গ্রন্থে একজন শাসকের গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী শাসকের যে কার্যাবলির সুপারিশ তিনি করেছেন তা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। তিনি মানব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছেন। সমাজ এবং মানব চরিত্র সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ম্যাকিয়াভেলিকে আধুনিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি ঐক্য প্রতিষ্টার মাধ্যমে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি *'Father of power politics'* হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি রাষ্ট্রের কল্যাণে শাসকের অবাধ ক্ষমতার পক্ষে ছিলেন। তার মতে, রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে শাসক স্বৈরাচারী হলেও কোনো ক্ষতি নেই। মানুষের সমালোচনায় বিভ্রান্ত না হয়ে শাসক যা ভালো মনে করবেন তা-ই করা উচিত। সবশেষে যখন প্রমাণিত হবে, তিনি যা করেছেন তা রাষ্ট্র ও জনসধারণের কল্যাণ বয়ে এনেছে তখন আর কোনো সমালোচনা থাকবে না।

ভিকো

ইটালীয় মনীষী ভিকো ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ভিকো সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি সমাজবিজ্ঞান পাঠের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। ভিকো তাঁর 'The New Science' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বির্বতিত হয়। ভিকো সমাজ বিবর্তনের ধারায় তিনটি যুগ লক্ষ করেন। তা হলো:

১। দেবতাদের যুগ (Age of Gods);
২। বীর যোদ্ধাদের যুগ (Age of Heros) এবং
৩। মানবের যুগ (Age of Men)।

সেন্ট-সাইমন

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী সেন্ট সাইমন ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মানুষের মাঝে সামাজিক অসাম্যের প্রতিকার খুঁজতে গিয়ে বলেন 'উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে যদি আর্থিক কল্যাণ বাড়ানো যায়, তবে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সামাজিক কল্যাণ বাড়ানো যাবে না কেন'? সেন্ট সাইমন মনে করেন যে, বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে যদি প্রাযুক্তিক প্রগতি (Technological progress) হতে পারে তাহলে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে নিশ্চয়ই সামাজিক প্রগতি (Social progress) অর্জন করা সম্ভব। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই সেন্ট সাইমন মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য এক নতুন বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি সমাজবিকাশ ও সমাজ পরিবর্তনের সূত্রের একটি রূপরেখা প্রদান করেন। সেই সূত্র অনুসরণ করে পরবর্তীতে তাঁরই ছাত্র ও অনুগামী অগাস্ট কোঁৎ 'সমাজবিজ্ঞান'- এর প্রবর্তন করেন।

অগাস্ট কোঁৎ

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁৎ ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। প্রতিষ্ঠা ও নামকরণের জন্য অগাস্ট কোঁতকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করা হয়। সমাজকে জানার জন্য একটি আলাদা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তিনি সেন্ট সাইমন থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। সমাজ অধ্যয়ন সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে প্রথমে কোঁত 'Social physics' বা 'সামাজিক পদার্থবিদ্যা' নামে নামকরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি এই শাস্ত্রকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান নামে নামকরণ করেন। অগাস্ট কোঁৎ মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞান হবে এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে এককভাবে সমাজ সম্পর্কিত সমস্যা, ঘটনা ও পরিস্থিতি বিষয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যাবে। তিনি তাঁর বিখ্যাত রচনা 'Positive philosophy' গ্রন্থে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা বিকাশের তিনটি স্তরের (Three Stages) উল্লেখ করেছেন। মানবজ্ঞান বিকশিত হওয়ার মাধ্যমে সমাজেরও বিকাশ সাধিত হয়েছে। তিনি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের তিনটি স্তরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমাজেরও তিনটি স্তর ব্যাখ্যা করেছেন। মানবজ্ঞান বা সমাজ বিকাশের তিনটি স্তর হল:
১। ধর্মতাত্ত্বিক স্তর (Theological Stage);
২। অধিবিদ্যার স্তর (Metaphysical Stage) এবং
৩। দৃষ্টবাদী স্তর (Positive Stage)।

অগাস্ট কোঁৎ এর মতে, মানবচিন্তা ঐতিহাসিকভাবে ধর্মতাত্ত্বিক স্তর থেকে অধিবিদ্যার স্তর অতিক্রম করে দৃষ্টিবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে। তাঁর মতানুসারে, মানবজ্ঞানের ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে মানুষ সর্বপ্রাণবাদ (Animism) ধারণা থেকে ক্রমান্বয়ে একেশ্বরবাদে (Monotheism) বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। উক্ত চিন্তার বশবর্তী হয়েই তিনি মানবতার ধর্মের (Religion of Humanity) ধারণাটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তবে তাঁর এ ধারণাটি সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। তবে কোঁতের মানবজ্ঞানের বিবর্তনভিত্তিক সমাজবিকাশের তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার স্তরে মানুষের পদযাত্রা এক অপরিহার্য ও বাস্তব পরিণতি। অর্থাৎ কোঁত এর সমাজবিজ্ঞানের ধারণার ভিত্তিমূলে রয়েছে প্রথমে ধর্ম, দ্বিতীয় পর্যায়ে দর্শন (তথা অধিবিদ্যা) এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজ্ঞানের অবদান। আর এভাবেই তিনি সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরিউক্ত চিন্তাবিদদের রচনা এবং চিন্তাধারা সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজও অনেকে মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞান তার শৈশবকাল অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত স্পষ্ট, নির্ভরযোগ্য কোনো তত্ত্ব হয়ত সমাজবিজ্ঞান দিতে পারেনি, কিন্তু তাই বলে সমাজবিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান বিবর্জিত নয়। কারণ সমাজের বাস্তবতা বিশেষ করে শিল্পায়ন, নগরায়ন, বিশ্বায়ন ইত্যাদি বিশ্লেষণে এর প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে।

সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান দান করতে পারছে বলেই অল্প সময়ের মধ্যে শাস্ত্রটি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। তবে শাস্ত্রটি 'শূন্য' হতে যাত্রা শুরু করেনি। রাজনৈতিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, জৈবিক ও সংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণার সার্বিক বিশ্লেষণই সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির উল্লেখযোগ্য কারণ। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী জিনস্‌বার্গ তাঁর Reason and

Unreason in Society নামক গ্রন্থে সমাজতত্ত্বের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, 'সুস্পষ্টভাবে সমাজবিজ্ঞানের রয়েছে চারটি উৎপত্তিসূত্র, যথা রাজনৈতিক দর্শন, ইতিহাসের দর্শন, বিবর্তনের জৈবিকতত্ত্ব এবং সামাজিক জরিপ।' এগুলোই সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তিকে ত্বরান্বিত করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তিতে যেকোনো তিনজন মনীষীর অবদান লিপিবদ্ধ করুন। **সময় ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী Anguste Comte ১৮৩৯ সালে সর্বপ্রথম Sociology বা সমাজবিজ্ঞান শব্দটি প্রবর্তন করেন। তবে শাস্ত্রটি 'শূন্য' হতে যাত্রা শুরু করেনি। সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তিতে কৌটিল্য, প্লেটো, এরিস্টটল, ইবনে খালদুন, ম্যাকিয়াভেলি, ভিকো, সেন্ট সাইমন, অগাস্ট কোঁৎ এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। সমাজ সম্পর্কে এঁদের লেখা, অনুসন্ধান, গবেষণা, তত্ত্ব ও মতবাদ সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবকে যেমন ত্বরান্বিত করেছিল, তেমনি শাস্ত্রটির বিকাশেও এদের অমূল্য অবদান রয়েছে। রাজনৈতিক দর্শন, ইতিহাসের দর্শন, বিবর্তনের জৈবিকতত্ত্ব এবং সামাজিক জরিপ– এ চারটি উপাদান সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা ও উত্তরোত্তর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। লাইসিয়াম কে প্রতিষ্ঠা করেন?
(ক) প্লেটো (খ) এরিস্টটল
(গ) ভিকো (ঘ) কৌটিল্য

২। সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বিবর্তিত হয় এ উক্তিটি কে করেছেন?
(ক) ভিকো (খ) অগাস্ট কোঁৎ
(গ) ম্যাকিয়েভেলি (ঘ) সেন্ট সাইমন

৩। 'আসাবিয়াহ' প্রত্যয় দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) সমাজিক ঐক্য (খ) সামাজিক স্থিতি
(গ) সামাজিক সংহতি (ঘ) সামাজিক গতি

পাঠ-১.৫ সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক : সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান

Relationship among Sociology and other Social Sciences : Sociology and Anthropology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নৃবিজ্ঞান কী তা বলতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত নৃবিজ্ঞানের সাথেও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নৃবিজ্ঞান হল মানুষ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। মানুষের সামগ্রিক অধ্যয়ন বিষয়ক বিজ্ঞানকেই বলা হয় নৃবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মত নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুও অত্যন্ত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়। নৃবিজ্ঞানকে প্রধানত দৈহিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান– এই দুই শাখায় বিভক্ত করা হয়। দৈহিক নৃবিজ্ঞানে বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য, তাদের জৈবিক দিক এবং তাদের উপর পরিবেশগত উপাদানের প্রভাব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্থান ও কালভেদে বিবর্তিত সমাজ, সম্প্রদায় ও মানবগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি তুলে ধরা হয় সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে। সেদিক থেকে সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ই অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিজ্ঞান যাদের বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞান এবং দুই বিজ্ঞানই উনবিংশ শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করে। উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

দ্বিতীয়ত: নৃবিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান সমাজ কাঠামো, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, দল, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

তৃতীয়ত: নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ের গবেষণার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। গবেষণার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানী একে অপরের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

চতুর্থত: সমাজবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন। সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিকাশধারা আলোচনা করতে গিয়ে সমসাময়িক মানব সমাজ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে। অপরদিকে, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান আদিম মানুষ ও তাদের জীবনপ্রণালী নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে।

পঞ্চমত: সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান আদিম এবং অনগ্রসর মানব সমাজের জীবনযাত্রার প্রণালী, তাদের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং তাদের আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় জীবন এবং সামাজিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সমাজবিজ্ঞান আধুনিক সমাজের নানাবিধ সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি মানব সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব নিরূপণ করে।

ষষ্ঠত: নৃবিজ্ঞান মানুষের সামগ্রিক অধ্যয়ন বিষয়ক একটি বিজ্ঞান। মানুষের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সবকিছুই নৃবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। সমাজবিজ্ঞান মানুষের সমাজ জীবনের সাথে সম্পর্কিত নানা দিক সম্পর্কে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করে।

সপ্তমত: সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান উভয়েই মূল লক্ষ্য হল মানব সংস্কৃতির অনুশীলন। সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য ক্ষেত্র সমকালীন সমাজ, আর নৃবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য ক্ষেত্র হল আদিম, অনগ্রসর ও নিরক্ষর সমাজের মানুষ ও এর সংস্কৃতি। মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্তন উভয় বিজ্ঞানেরই অভিন্ন আগ্রহের বিষয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, নৃবিজ্ঞান বুদ্ধিমান প্রাণি হিসাবে মানুষের অধ্যয়নের পাশাপাশি সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের সংস্কৃতি নিয়েও গবেষণা করে। আর সমাজবিজ্ঞান সমসাময়িক মানব সমাজ অধ্যয়নের বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

শিক্ষার্থীর কাজ	নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক চিহ্নিত করুন।	**সময় ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানের জগতে দু'টি ভিন্ন শাখা হলেও মূলত উভয়ের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রায় অভিন্ন। সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিকাশ ধারা অধ্যয়ন করতে গিয়ে মানুষ ও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করে। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, বিবর্তন, সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। নৃবিজ্ঞান মূলত সমাজবিজ্ঞানেরই একটি অংশ। মানব বিবর্তন ধারা উভয় বিজ্ঞানেরই অভিন্ন আগ্রহের বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে মিল কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়?

(ক) মানব বিবর্তন অধ্যয়নে। (খ) সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়নে।

(গ) মানুষ সংক্রান্ত অধ্যয়নে। (ঘ) সমাজ ও জীবন প্রণালী অধ্যয়নে।

২। নৃবিজ্ঞান মূলত কয়টি শাখায় বিভাক্ত?

(ক) দুটি (খ) চারটি

(গ) তিনটি (ঘ) পাঁচটি

৩। নৃবিজ্ঞান কোন শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করে?

(ক) উনবিংশ শতাব্দী (খ) সপ্তদশ শতাব্দী

(খ) বিংশ শতাব্দী (ঘ) অষ্টাদশ শতাব্দী

পাঠ-১.৬ সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান
Sociology and Political Science

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান।

জ্ঞান চর্চার গোড়ার দিকে সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হত না। বরং মানব সভ্যতায় দীর্ঘদিন যাবৎ সমাজবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শাখা হিসেবেই অধ্যয়ন করা হত। কিন্তু বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান দু'টি পৃথক শাখা হিসেবে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনার বিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্বরূপ, কার্যাবলি; সরকারের গঠন, ধরন, শাসন প্রক্রিয়া; সংবিধান, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অপরপক্ষে, সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি-বিকাশ, সামাজিক পরিবর্তন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হল সমাজ। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হচ্ছে রাষ্ট্র। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এরিস্টটল সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য করেননি। বস্তুত রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়ই মানুষের কল্যাণে মানুষের দ্বারা তৈরি প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। একজন মানুষ যেমন সমাজের সদস্য, তেমনি সে রাষ্ট্রের নাগরিকও বটে। আর এ কারণেই সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। নিচে সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচ্য বিষয় সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবেও আলোচিত হয়। এদিক থেকে সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে।

দ্বিতীয়ত: আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর সমাজবিজ্ঞানের প্রভাব অনেক বেশি লক্ষ করা যায়। বর্তমানে সমাজতাত্ত্বিক অনেক ব্যাখ্যা ও মডেল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সরাসরি ব্যবহার করা হয়।

তৃতীয়ত: স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পূর্বে সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাত্ত্বিক আলোচনা, বিষয়বস্তু, শাস্ত্র হিসেবে উদ্ভবের পটভূমি নানা দিক থেকে সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে ঋণী। এদিক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে।

চতুর্থত: রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে রাষ্ট্রীয় সংগঠন, রাষ্ট্রের কার্যাবলি, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ আলোচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য।

পঞ্চমত: সমাজবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের সার্বিক দিক নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই সমাজস্থ মানুষের কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতি কোনোভাবেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা না গেলে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যর্থ প্রতীয়মান হতে পারে। সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান ছাড়া রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ বিবেচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অবশ্যই সমাজতত্ত্বের পাঠ গ্রহণ করতে হয়।

ষষ্ঠত: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব আলোচ্য বিষয় থাকলেও কতকগুলো মৌলিক বিষয়- যেমন: আইন, শাসনতন্ত্র, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, সামাজিক অনুশাসন প্রভৃতি বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

সপ্তমত: অনেক ক্ষেত্রে যেকোনো রাজনৈতিক সফলতা কিংবা ব্যর্থতা সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। সামাজিক বাস্তবতা অনুধাবন ব্যতীত সফল রাষ্ট্রনায়ক হওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ণ, নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন অপরিহার্য।

অষ্টমত: সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ই নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা, গবেষণা এবং বিশ্লেষণ করে। অনেক সমস্যাই একদিকে যেমন রাজনৈতিক, অন্যদিকে তেমনি সামাজিকও বটে। তাই সমস্যাগুলোকে বুঝতে এবং সমাধানের পথ খুঁজে পেতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে যেমন সমাজবিজ্ঞানীর সাহায্য নিতে হয়, তেমনি সমাজবিজ্ঞানীকেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মৌলিক ধারণাগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে হয়।

নবমত: রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীগণ একে অপরের নিকট থেকে রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। ফলে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরিকল্পনা প্রণয়ন অনেক বেশি কার্যকর ও বাস্তবসম্মত হতে পারে।

দশমত: প্লেটোর 'রিপাবলিক', এরিস্টটলের 'পলিটিক্স', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', ইবনে খালদুনের 'আল-মুকাদ্দিমা' গ্রন্থসমূহে সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রবিষয়ক দিকসমূহ অভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। অভিন্ন এই সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ক চিন্তা ও মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অবদান যা বর্তমান কালেও সমাজবিজ্ঞান গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক এতই গভীর যে, সমাজবিজ্ঞানীকে যেমন বিভিন্ন তথ্যের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হতে হয় তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকেও বিভিন্ন তথ্যের জন্য সমাজবিজ্ঞানীর দ্বারস্থ হতে হয়। তাই অধ্যাপক গিডিংস বলেন- "সমাজবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলো সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়"।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য নিরূপণ করুন।	**সময় ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান দু'টি পৃথক শাখা হিসেবে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্বরূপ, কার্যাবলি; সরকারের গঠন, ধরন, শাসন প্রক্রিয়া; সংবিধান, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অপরপক্ষে, সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি-বিকাশ, সামাজিক পরিবর্তন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। তবে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পরকে প্রভাবিত করে, পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর এ কারণেই সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় কোনটি?
(ক) সমাজ (খ) মানুষ
(গ) রাষ্ট্র (ঘ) সম্পত্তি

২। সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কী ধরনের?
(ক) ঘনিষ্ঠ (খ) পরিপূরক
(গ) দ্বান্দ্বিক (ঘ) বৈরীমূলক

৩। সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় কী?
(ক) সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি (খ) সমাজ বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা
(গ) মানুষের সম্পূর্ণ জীবন প্রণালী (ঘ) রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান

পাঠ-১.৭ সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি
Sociology and Economics

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান।

সমাজস্থ মানুষের নানামুখী ক্রিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অন্যতম। মানব জীবনের যেসব কার্যক্রম উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের সঙ্গে জড়িত সেটিই তার অর্থনৈতিক দিক। অর্থনীতি মানুষের জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক দিক নিয়েই আলোচনা করে। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজকে জানতে গিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বিশ্লেষণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকেন। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত সমাজের পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধ প্রভৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমাজ থেকে পৃথক করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এখানে সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যেকার সম্পর্ক আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ। আর সমাজবিজ্ঞান সমাজের সাথে সম্পর্কিত হবার ফলে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদন সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। এদিক থেকে অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত: অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, অন্যান্য আচরণমূলক বিজ্ঞান (behavioural science) এর ভিত্তি হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন আচরণমূলক কর্মকাণ্ড। মানুষের অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকাণ্ড সবকিছুই মূলত সামাজিক কাঠামো, সামাজিক পরিবেশ ও মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে। ফলে অর্থনীতি ও সমাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়।

তৃতীয়ত: সমাজজীবন দ্বারা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যেমন প্রভাবিত তেমনি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া দ্বারা সমাজজীবন প্রভাবিত। দারিদ্র্য কিংবা অর্থনৈতিক উন্নতি মানুষের সামাজিক জীবন, সম্পর্ক, ক্ষমতা ও শ্রেণি কাঠামো ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। ফলে কার্যকর সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নে মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থা, পেশা, জীবিকা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন সূচককে ত্বরান্বিত করে।

চতুর্থত: কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে জানতে হলে সবার আগে সেদেশের সামাজিক অবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা প্রয়োজন। মানুষের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, রীতিনীতি ইত্যাদি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

পঞ্চমত: মানুষের সামাজিক পারিপার্শ্বিকতাকে অবহেলা করে অর্থনৈতিক আলোচনা এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা অর্থহীন ও অবাস্তব হতে বাধ্য। যেহেতু সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সমাজস্থ মানুষকে ঘিরেই আবর্তিত হয় সেহেতু সমাজ ও এর কাঠামো সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করা ছাড়া অর্থনেতিক আলোচনা বাস্তবতা বিবর্জিত।

ষষ্ঠত: বহু অর্থনৈতিক প্রশ্নের সামাজিক দিক আছে। যেমন: কর-নীতি, জাতীয় বাজেট, ভূমিব্যবস্থা, ভূমিবন্টন, মূল্যহ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির যে সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে কোনো অর্থনীতিবিদের পক্ষে তা উপেক্ষা করা কঠিন।

সপ্তমত: সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক আচরণকে বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

অষ্টমত: সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার মান সংশ্লিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে । কারণ মানুষের জীবনধারা অর্থনৈতিক গতি দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া অর্থনীতির আলোচনা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি অর্থনৈতিক ধারণা ব্যতীত সমাজবিজ্ঞানের আলোচনাও পরিপূর্ণ হয় না। তাই বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের দু'টি পৃথক শাখা হওয়া সত্বেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান মূলত একে অপরের পরিপূরক। কারণ সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া যেমন অর্থনীতিকে জানা যায় না, তেমনি অর্থনৈতিক জ্ঞান ছাড়া সমাজবিজ্ঞানকেও পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব না।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞানের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক নিরূপণ করুন। **সময় ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

অর্থনীতি মানুষের জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক দিক নিয়েই আলোচনা করে। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজকে জানতে গিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বিশ্লেষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত সমাজের পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধ প্রভৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমাজ থেকে পৃথক করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান মূলত একে অপরের পরিপূরক। কারণ সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া যেমন অর্থনীতিকে জানা যায় না, তেমনি অর্থনৈতিক জ্ঞান ছাড়া সমাজবিজ্ঞানকেও পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক মানুষের জীবনধারা কোন নিয়ামকটি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত?

(ক) প্রাকৃতিক (খ) রাজনৈতিক

(গ) অর্থনৈতিক (ঘ) জৈবিক

২। অর্থনৈতিক আলোচনা কখন অর্থহীন হয়ে পড়ে?

(ক) যখন সামাজিক সংগঠন পর্যালোচনা করা হয় না।

(খ) যখন সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

(গ) যখন মানুষের জীবন প্রণালী আলোচনা করা যায় না।

(ঘ) যখন মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় না।

পাঠ-১.৮ সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস
Sociology and History

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ইতিহাস বলে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করতে পারবেন এবং
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান।

ইতিহাসের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিবিড়। উভয়ের উৎপত্তির পটভূমি মানুষের সমাজ। তবে ইতিহাস হচ্ছে অতীতের ঘটনাবলির বিশ্লেষণ। ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলীকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতকে বর্তমানের কাছে অর্থবহ করে তোলে। ইতিহাসের বিষয় হচ্ছে মূলত মানুষ এবং সমাজের ক্রমবিবর্তনের ঘটনা। এখানেই সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের সেতুবন্ধন রচিত হয়। এ সেতুবন্ধনের ফসল হিসেবে 'সামাজিক ইতিহাস' সমাজবিজ্ঞানের এক জনপ্রিয় শাখা। সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন ইতিহাসের আলোচনা অসম্পূর্ণ, তেমনি সমাজের অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান অর্থহীন। এ বিবেচনায় ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান মূলত একে অপরের পরিপূরক। সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: সমাজবিজ্ঞান সমাজ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। ইতিহাসও সমাজকে নিয়ে আলোচনা করে। তবে ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলীকে বেশি প্রাধান্য দেয়।

দ্বিতীয়ত: ইতিহাস অতীতের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক নানাবিধ ঘটনার বিবরণ দেয় যা সমাজবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমাজ অধ্যয়ন, গবেষণা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত: সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাস উভয়ই তথ্যনির্ভর। ইতিহাসে যেমন ধারাবাহিকভাবে অতীতের ঘটনাবলি সন্নিবেশিত থাকে তেমনি সমাজবিজ্ঞানেও মানব সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিবরণ ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত থাকে।

চতুর্থত: সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হলো সহযোগিতা এবং নির্ভরশীলতার। অতীত ঘটনাবলি বিশ্লেষণে ইতিহাস যেমন সমাজকাঠামো, সংস্কৃতি, পেশা, অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় মূলবোধ ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়, তেমনি আধুনিক সমাজ বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানকে এর শেকড়ের সন্ধান করতে হয়। তখন অনিবার্যভাবেই ইতিহাস হয়ে ওঠে সমাজের সবচেয়ে বড় তথ্যভাণ্ডার।

পঞ্চমত: সমাজবিজ্ঞানেরই অংশ হিসেবে সামাজিক ইতিহাস অধ্যয়ন করা হয়। সামাজিক ইতিহাস হচ্ছে সমাজের সাধারণ মানুষের অতীত জীবনের ঘটনাসমৃদ্ধ বর্ণনা। এটি যেমন ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি সমাজবিজ্ঞানকেও।

ষষ্ঠত: সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানব সমাজ ও তার সংস্কৃতি। সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অতীত ঐতিহাসিক প্রেক্ষপট ছাড়া বর্তমানের আলোচনা অসম্পূর্ণ।

সপ্তমত: ইতিহাস যুদ্ধ, যুদ্ধের জয়-পরাজয়, রাজ্যজয়, শাসনকাল ইত্যাদি তুলে ধরে। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞান এসবের সামাজিক প্রভাব, প্রতিক্রিয়া এবং সমাজের কোন উপাদান এগুলোকে প্রভাবিত করে তার বর্ণনা দেয়।

অষ্টমত: সমাজবিজ্ঞানীগণ কোন পরিবেশে একটি ঘটনা ঘটছে তার সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেন। আধুনিককালে মূল তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে পর্যালোচনা করা হয়।

নবমত: ইতিহাস চর্চায় তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন- ক) ঘটনার যথাযথ বর্ণনা (খ) বর্ণিত ঘটনার পটভূমি ব্যাখ্যা এবং (গ) ঘটনার কারণ ও ফলাফল নির্ণয়। সমাজবিজ্ঞানীরা ঐতিহাসিক ঘটনার সামাজিক প্রেক্ষপট, কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করে।

দশমত: ইতিহাস অতীতের অনুবীক্ষণ আর ভবিষ্যতের দিকনির্দেশক। আর বর্তমানের জন্য ইতিহাস হচ্ছে শিক্ষক। এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই সমাজকে বিশ্লেষণ করতে হয়। যথাযথভাবে অতীত ঘটনা জানার মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজের স্বরূপ উদঘাটন করতে হয়। সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বায়ন ও সাধারণীকরণেও রয়েছে ইতিহাস-নির্ভরশীলতা। আর এ কারণেই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক এতবেশি দৃঢ়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ঐতিহাসিকগণ যখন ইতিহাস রচনা করেন ঘটনার সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের আগ্রহের অন্যতম বিষয়। তাঁরা বিভিন্ন ঘটনার সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ফলাফলের উপরও নির্ভর করেন। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানও ইতিহাসকে বাদ দিয়ে যথাযথভাবে অগ্রসর হতে পারে না। ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যতীত সমাজের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই বলা যায় ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	'ইতিহাস কিভাবে সমাজবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল'– পাঁচটি বাক্যে লিখুন। **সময় ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলিকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতকে বর্তমানের কাছে অর্থবহ করে তোলে। ইতিহাসের বিষয় হচ্ছে মূলত মানুষ এবং সমাজের ক্রমবিবর্তনের ঘটনা। এখানেই সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে আরো বেশি সুদৃঢ় করেছে 'সামাজিক ইতিহাস', যা সমাজবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ঐতিহাসিকগণ যখন ইতিহাস রচনা করেন ঘটনার সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের আগ্রহের অন্যতম বিষয়। তারা বিভিন্ন ঘটনার সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ফলাফলের উপরও নির্ভর করেন। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানও ইতিহাসকে বাদ দিয়ে যথাযথভাবে অগ্রসর হতে পারে না। আর এ কারণেই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইতিহাস চর্চায় কোন তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়?
- (ক) ঘটনার কাল, পরিবেশ ও কার্যকারণ।
- (খ) ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তাৎপর্য ও কার্যকারণ।
- (গ) ঘটনার যথাযথ বর্ণনা, বর্ণিত ঘটনার পটভূমি ব্যাখ্যা এবং ঘটনার কারণ ও ফলাফল নির্ণয়।
- (ঘ) ঘটনার পুনরাবৃত্তি, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ।

২। ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
- (ক) বর্তমান সমাজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা
- (খ) ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা প্রদান করে।
- (গ) ধারাবাহিকভাবে অতীতের তথ্য সন্নিবেশ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা।
- (ঘ) তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ও সাধারণীকরণ।

পাঠ-১.৯ সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান
Sociology and Psychology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মনোবিজ্ঞান কী তা বলতে পারবেন;
- মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন এবং
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান।

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল রূপ হচ্ছে সমাজ। মানুষই হচ্ছে এর রূপকার। আবার সামাজিক মানুষ সমাজেরই সৃষ্টি। মানুষ কতকগুলো সম্পর্কের বশবর্তী হয়ে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। এসব সম্পর্কের মূলে মনস্তত্ত্বের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের আচরণ, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে। বস্তুত মনোবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের আচরণের বিজ্ঞান। মানুষ যা কিছু চিন্তা করে এবং যেরূপ আচরণ করে তার প্রভাব সমাজের উপরই পড়ে। তাই সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক লক্ষ করা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: মনোবিজ্ঞান হলো সমাজস্থ ব্যক্তির আচারণের বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক আচরণের বিজ্ঞান যা সামাজিক উদ্দিপক দ্বারা প্রভাবিত। ব্যক্তির আচরণই সামাজিক আচরণে পরিণত হয়। ফলে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে মনোবিজ্ঞানের ধারণা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়ত: সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সমাজস্থ মানুষ। আর মনোবিজ্ঞান সেই সমাজস্থ মানুষের মনোজগত, আচরণ, মনোভাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। এদিক থেকে মনোবিজ্ঞানীকে সামাজিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। সামাজিক পটভূমি না জেনে ব্যক্তির আচরণের কার্যকর ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান প্রায় অসম্ভব।

তৃতীয়ত: মনোবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সমাজতাত্ত্বিক অনুশীলন অসম্ভব হয়ে ওঠে। সামাজিক গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞানের ধারণা বিশেষভাবে কার্যকর। তথ্য সংগ্রহের কৌশল, তথ্যের সঠিকতা, নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীকে মনোবিজ্ঞানের ধারণা প্রয়োগ করতে হয়।

চতুর্থত: মানুষের যৌথ আচরণের (Collective behaviour) বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে সমাজ। মানুষের যৌথ আচরণ এবং সামাজিক সম্পর্কের মূলে রয়েছে এক বিশেষ ধরনের মানসিক প্রবণতা। এদিক থেতে সমাজবিজ্ঞান ও তাকে মনোবিজ্ঞান নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ এবং পরস্পর নির্ভরশীল।

পঞ্চমত: মনোবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের আচরণের বিজ্ঞান। এ আচরণ যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তেমনি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের মতে সমাজজীবনে একজন জীবিত ব্যক্তি যা কিছু করে তার সবই হল মানসিক ঘটনা।

ষষ্ঠত: ব্যক্তি-মানুষ এবং গোষ্ঠী, এদের আচরণ, সামাজিক জীবন, সম্পর্ক ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। এরই ফসল হচ্ছে সমাজ মনোবিজ্ঞান। সমাজ মনোবিজ্ঞান যেমন সমাজবিজ্ঞানের শাখা, তেমনি মনোবজ্ঞিানের সাথেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। বস্তুত সমাজ মনোবিজ্ঞানের দিকে তাকালেই সমাজবিজ্ঞান ও মনোবজ্ঞিানের ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সপ্তমত: মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে গিয়ে সমাজের সৃষ্টি করেছে। আর মানুষের মায়া–মমতা, স্নেহ-ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্কের মাধ্যমেই পরিবার তথা সমাজের সৃষ্টি ও স্থায়িত্বলাভ করেছে। মানুষ যেখানেই দলবদ্ধ হয়েছে, সমাজবদ্ধ হয়েছে সেখানেই মানুষের মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান উভয়ই সমাজস্থ মানুষকে নিয়েই আলোচনা করে। ফলে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মানুষের আচরণ, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে। বস্তুত মনোবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের আচরণের বিজ্ঞান। মানুষ যা কিছু চিন্তা করে এবং যেরূপ আচরণ করে তার প্রভাব সমাজের উপরই পড়ে। সমাজবিজ্ঞান সমাজের নানাদিক নিয়ে অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করে। এরই ফল হিসেবে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় কী ?

(ক) মানুষের দেহ (খ) সমাজের কার্যকলাপ

(গ) মানুষের আচরণ (ঘ) মানুষের আত্মা

২। মনোবিজ্ঞানকে কিসের বিজ্ঞান বলা হয়?

(ক) মানবিক বিজ্ঞান (খ) আচরণের বিজ্ঞান

(গ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (ঘ) সামাজিক বিজ্ঞান

পাঠ-১.১০ সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ
Sociology and Social Welfare

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজকল্যাণ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার আগে 'সমাজবিজ্ঞান' ও 'সমাজকল্যাণ' এই দুটি বিষয় সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞান হল সমাজের বিজ্ঞান যা মানব সমাজ নিয়ে পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করে। সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, পরিবর্তন, সমস্যা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আচার-বিশ্বাস এককথায় সমগ্র সমাজকে বিশ্লেষণ করে। অপরদিকে, সমাজকল্যাণ সমাজসেবার সংগঠিত ব্যবস্থাকে নিয়ে আলোচনা করে। সমাজস্থ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও মানুষের জীবনে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাই সমাজকল্যাণের মূল উদ্দেশ্য। সমাজস্থ মানুষের জীবন মান ও স্বাস্থ্যের মান উন্নতি এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মঙ্গল সাধনের জন্য সমাজকল্যাণ নিয়োজিত থাকে। তাই সমাজবজ্ঞান ও সমাজকল্যাণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

প্রথমত: সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ উভয়ই মানব সমাজকে নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে।

দ্বিতীয়ত: সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ উভয়ের উদ্দেশ্য হলো সমাজের কল্যাণ সাধন করা।

তৃতীয়ত: সমাজকল্যাণ সামাজিক সমস্যার দ্রচত সমাধানে অধিকতর তৎপর। সমাজকল্যাণ সামাজিক সমস্যা দূর করে মানুষের আর্থ-সামাজিক সুখ ও সমৃদ্ধি প্রদানে নিয়োজিক থাকে।

চতুর্থত: সমাজবিজ্ঞান সমাজের প্রায় সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সমাজকল্যাণ সমাজের সমস্যা, এর সমাধান, মানবকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করে।

পঞ্চমত: গবেষণার মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত এবং এর স্বরূপ উদঘাটন করে। কিন্তু সমাজকল্যাণ সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রায়োগিক দিকের উপর গুরুত্ব প্রদান করে।

ষষ্ঠত: সমাজবিজ্ঞানে অর্জিত তত্ত্বীয় জ্ঞান সমাজকল্যাণের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে। কারণ সমাজের সমস্যা দূর করে সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজকল্যাণকে সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

সপ্তমত: সামাজিক সমস্যাবলি দূর করতে হলে সমাজকল্যাণের শিক্ষার্থীদের অবশ্যই সামাজিক সমস্যার কারণ ও সংশ্লিষ্ট সমাজকাঠামো সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান নিতে হবে। বস্তুত সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে তত্ত্বীয় বিজ্ঞান এবং সমাজক্যলাণ হচ্ছে ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

তবে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নে ফলিত সমাজবিজ্ঞান (Applied Sociology) সমাজকল্যাণ থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পাঠদান প্রক্রিয়া, গবেষণা পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক জ্ঞান দান করে, তবে সমাজকল্যাণ সেই জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য সক্রিয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান যেহেতু সমাজ তথা সমাজস্থ মানুষের সার্বিক জীবনপ্রণালী নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে সেহেতু সেই সমাজস্থ মানুষের কল্যাণ করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। আর সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ নামক বিষয় দুটোর মধ্যে সম্পর্ক খুবই নিবিড়। সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সমস্যা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আস্থা-বিশ্বাস তথা সমগ্র সমাজকে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করে। অপরপক্ষে, সমাজকল্যাণ সমাজসেবার সংগঠিত ব্যবস্থাকে নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজকল্যাণ কী ধরনের জ্ঞান দান করে?
- (ক) তাত্ত্বিক জ্ঞান দান করে।
- (খ) ফলিত জ্ঞান দান করে।
- (গ) রুটিন-মাফিক জ্ঞান দান করে।
- (ঘ) বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায়োগিক জ্ঞান দান করে।

২। সমাজকল্যাণের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
- (ক) সমাজকে সেবা করা।
- (খ) সমাজের মানুষের কল্যাণ করা।
- (গ) সমাজের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা।
- (ঘ) সমাজের সমস্যার সমাধান করা।

ইউনিট-১ এর উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ঘ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩ ঃ ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৬ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৭ ঃ ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৮ ঃ ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৯ ঃ ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১০ ঃ ১। ঘ ২। খ।
চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্র হিসেবে কত সালে প্রবর্তিত হয়?

ক. ১৭৩৯ সালে খ. ১৮৩৯ সালে

গ. ১৯০০ সালে ঘ. ১৯৩১ সালে

২. ভিকো সমাজ বিবর্তনের ধারায় কয়টি যুগের উল্লেখ করেছেন?

ক. দু'টি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩. সমাজবিজ্ঞান-

i. সামাজিক বিজ্ঞান

ii. সামাজিক প্রপঞ্চের বিজ্ঞান

iii. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

সঠিক উত্তর কোনটি?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. অগাস্ট কোঁৎ-এর মতে সমাজবিজ্ঞান–

(i) সামাজিক কাঠামোর বিজ্ঞান

(ii) সামাজিক স্থিতিশীলতার বিজ্ঞান

(iii) সামাজিক গতিশীলতার বিজ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii, ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

মাসুদ ও সাদী দু'জন মামা-ভাগ্নে। দু'জনই সমাজ নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী। তবে ভাগ্নে সাদী সমাজের গঠন কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক, প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে জানতে অধিক আগ্রহী। অপরপক্ষে, মামা মাসুদ সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চান। অতীত সমাজের সাথে বর্তমান সমাজের সাদৃশ্য ও পার্থক্য, আদিম সমাজ থেকে কীভাবে আধুনিক সমাজের রূপান্তর হয়েছে, গ্রামীণ ও শহুরে সমাজের এবং কৃষি ও শিল্পভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য সম্পর্কেও মাসুদের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

(ক) Sociology শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন? ১

(খ) সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে? ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলো লিখুন। ৩

(ঘ) সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরুন। ৪

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা
Scientific Status of Sociology

ইউনিট ২

সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য শাখা। সমাজকে কেন্দ্র করেই সমাজবিজ্ঞান আবর্তিত। সমাজ অধ্যয়নের মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সমাজ অধ্যয়ন এ শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে। বস্তুত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান ব্যতীত সমাজবিজ্ঞান আজকের এ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারত না। সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে গবেষণা, তথ্যানুসন্ধান, ব্যাখা-বিশ্লেষণ, তত্ত্ব গঠন, সাধারণীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকেই সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের মর্যাদা অর্জন করেছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : বিজ্ঞানের ধারণা এবং সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা
পাঠ-২.২ : গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া
পাঠ-২.৩ : সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি গবেষণা পদ্ধতি : সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি
পাঠ-২.৪ : ঘটনা অনুসন্ধান এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
পাঠ-২.৫ : জরিপ পদ্ধতি এবং পিআরএ।

পাঠ-২.১ বিজ্ঞানের ধারণা এবং সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা
Concept of Science and Scientific Status of Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিজ্ঞান কী তা বলতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা।

বিজ্ঞানের ধারণা

সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা তা বিশ্লেষণের পূর্বে জানা প্রয়োজন, বিজ্ঞান কী? বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ Science যা ল্যাটিন শব্দ Scientia থেকে এসেছে। Scientia শব্দের অর্থ হলো to know বা জানা। সাধারণভাবে বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান যা কোনো বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জন করতে হয়। সুসংবদ্ধ অনুশীলনের বিষয়বস্তুকেই বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানকে ধারাবাহিক জ্ঞানের সমষ্টিও বলা হয়। বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় Manheim বলেছেন, Science is an objective, accurate, systematic analysis of a determinate body of empirical data, in order to discover recurring relationships among phenomena. (বিজ্ঞান হলো অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের বস্তুনিষ্ঠ, সঠিক, নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণ যা বিভিন্ন ঘটনাসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক আবিষ্কার করে।) বস্তুত বিভিন্ন ঘটনাবলির পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে অর্জিত বিশেষ জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের ভিত্তি হলো বর্ণনা (deseription), ব্যাখ্যা (explanation), পূর্বাভাস (prediction) এবং নিয়ন্ত্রণ (control) করা। বিজ্ঞানের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন: বিজ্ঞান নিয়মতান্ত্রিক এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান; বিজ্ঞান সাধারণ ঘটনাবলির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে; বিজ্ঞান তত্ত্ব গঠন, তত্ত্বের উন্নয়ন এবং পুনঃপরীক্ষণের মাধ্যমে তত্ত্ব সংশোধন করে থাকে। সর্বোপরি বিজ্ঞান ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম। যেকোনো শাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হতে হলে এসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হবে।

সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা

সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের (Social Science) অন্তর্ভুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো সমাজ। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে এর আলোচ্য বিষয়, গৃহীত গবেষণা পদ্ধতি এবং তত্ত্বের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সমাজবিজ্ঞান সমাজ গবেষণার বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। সামাজিক গবেষণায় সমাজবিজ্ঞান যেসব বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলো হলো:

১। সমস্যা নির্বাচন (Selection of problem);
২। পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ (Observation and data collection);
৩। তথ্যের বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিন্যাস (Analysis and Classification of data);
৪। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে অনুসিদ্ধান্ত প্রণয়ন (Formulation of hypothesis based on collecting data) এবং
৫। ভবিষ্যদ্বাণী (Prediction)।

গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানের আরো কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা উপাদান রয়েছে যার ভিত্তিতে এ শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায়। যেসব বৈশিষ্ট্য, উপাদান বা যুক্তির আলোকে সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা হয় তা হচ্ছে:

১। বিজ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে: বিজ্ঞানের যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতেও সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। সর্বজনীন (Universal), কারণিক (Causal) এবং অভিজ্ঞতা (Empirical)—এ তিনটিকে বিজ্ঞানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানেও এ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণায়, তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি, কার্যকারণ সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

২। বিজ্ঞানের পূর্বশর্তের ভিত্তিতে: বিজ্ঞানের বিভিন্ন পূর্বশর্ত সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সমাজ। সমাজ একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান। এখানে রয়েছে নিয়ম-শৃঙ্খলা। এর মূলনীতি ও তত্ত্বের সারল্য ও স্বাভাবিকতা যেমন রয়েছে, তেমনি এখানে কার্যকারণ সম্পর্কে মূলতত্ত্ব এবং সামাজিক ঐক্যের মূলনীতির বিষয়টিও অনস্বীকার্য। অর্থাৎ সমাজও এখানে প্রকৃতির একটা অংশ এবং প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও পূর্বশর্তের অধিকারি। এ সমাজ নিয়ে আবর্তিত হবার ফলে অন্যন্য বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজবিজ্ঞানও একটি স্বীকৃত এবং গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞান।

৩। শৃঙ্খলা ও প্রণালীবদ্ধতার ভিত্তিতে: বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন বা গবেষণা। সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। কেননা, সমাজবিজ্ঞান সমাজকে সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে (Systematically) অধ্যয়ন করে। আনুষ্ঠানিক সমাজবিজ্ঞান উদ্ভবের আগেও সমাজ সম্পর্কে অনেক অধ্যয়ন ও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু তাকে 'বিজ্ঞান' বলে দাবি করা হয়নি। কেননা সমাজতাত্ত্বিক সেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও বস্তুনিষ্ঠ ছিল না। তাই শৃঙ্খলা, প্রণালীবদ্ধতা ও বস্তুনিষ্ঠতার ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক সমাজবিজ্ঞান অবশ্যই বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা।

৪। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে : বিজ্ঞান একটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়। অভিজ্ঞতা ছাড়া বিজ্ঞানের কোন ভিত্তি নেই, মূল্য নেই। সমাজবিজ্ঞানেও বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামাজিক ঘটনাবলি অনুধাবনের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও মূল্য দেয়া হয়। অনেক সমাজবিজ্ঞানী প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতামূলক গবেষণা করে থাকেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানমনস্কতা প্রমাণিত হয়।

৫। কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে : বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যকারণ সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সমাজবিজ্ঞান সামাজিক ঘটনা, সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান যে সব বিষয়ে আলোচনা-গবেষণা করে সেখানে অনিবার্যভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। যেমন— দারিদ্র্য, বেকারত্ব, সন্ত্রাস ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করে। সুতরাং বিজ্ঞানের এ বৈশিষ্ট্যটিও সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানমনস্কতা দান করেছে।

৬। সর্বজনীনতার ভিত্তিতে: সর্বজনীনতার ভিত্তিতেও সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, চুম্বক কিংবা গণিতের সূত্র যেমন সর্বজনীন, তেমনি পারিবারিক অশান্তি ও অসংগতি সমাজে কিশোর অপরাধের মত বাস্তবতাও সর্বজনীন।

৭। **বস্তুনিষ্ঠতার ভিত্তিতে:** বিজ্ঞানের অন্যতম মূল ভিত্তি হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠতা। সমাজবিজ্ঞানে বস্তুনিষ্ঠতার গুরুত্ব অনেকখানি। এর যে কোনো আলোচনা, গবেষণা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বস্তুনিষ্ঠ হওয়া অপরিহার্য। এদিক থেকেও সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদার পক্ষে পাঁচটি যুক্তি দিন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান যা কোনো বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জন করতে হয়। সুসংবদ্ধ অনুশীলনের বিষয়বস্তুকেই বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানকে ধারাবাহিক জ্ঞানের সমষ্টিও বলা হয়। সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের (Social Science) অন্তর্ভুক্ত। সমাজবিজ্ঞান সমাজ গবেষণার বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানের আরো কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা উপাদান রয়েছে যার ভিত্তিতে এ শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিজ্ঞান কী?

(ক) ধারাবাহিক জ্ঞানের সমষ্টি (খ) শৃঙ্খলার উন্নয়ন (গ) ভাববাদের উন্নয়ন (ঘ) বস্তুবাদের উন্নয়ন

২। সামাজিক গবেষণায় সমাজবিজ্ঞান কয়টি পদক্ষেপ মেনে চলে?

(ক) চারটি (খ) পাঁচটি (গ) ছয়টি (ঘ) তিনটি

পাঠ-২.২ গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
Scientific Method in Research

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা

যেকোনো বিজ্ঞানের সফলতা নির্ভর করে তার অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে তত্ত্ব নির্মাণের উপর। যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়। সাধারণভাবে বলা হয়, গবেষণায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহের কৌশল হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এখানে সুনির্দিষ্ট ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। একজন গবেষক তার গবেষণায় কোন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া বা কৌশল অনুসরণ করবেন তা গবেষণার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য এবং গবেষকের দক্ষতার উপর।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সংজ্ঞায় Phillips বলেন, The scientific method is a problem-solving process which involves: (a) creating theory (b) using data to verify theory and (c) creating more profound explanations and accurate predictions of phenomena. (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি প্রক্রিয়া হিসেবে তত্ত্ব তৈরি, তত্ত্ব নিরীক্ষায় তথ্যের ব্যবহার এবং অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও ঘটনার পূর্বানুমানের সঙ্গে জড়িত)।

Barry F. Anderson বলেন, The scientific method is here defined as the following set of rules for describing and explaining phenomena: operational definition, generality, controlled observation, repeated observation, confirmation and consistency (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ঘটনার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যার লক্ষ্যে কতিপয় বিধিমালা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন: কার্যকরী সংজ্ঞা, সাধারণতা, নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ, পুন:পর্যবেক্ষণ, নিশ্চিতকরণ এবং সংগতিবিধান)।

বস্তুত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণগত প্রভাব ও কার্যকারিতার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের পদ্ধতিসমূহ হলো প্রস্তাবিত জ্ঞানের উৎপাদন, রূপান্তর ও সমালোচনার সাংস্কৃতিক রীতি।

সমাজবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কার্যপ্রণালীর প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, পরিপ্রেক্ষিত, ব্যবহৃত কৌশল, দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি প্রভৃতি গবেষণার কার্যপ্রণালীতে প্রভাব বিস্তার করে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে এর সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। কার্যকর পদ্ধতি ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎকর্ষ অসম্ভব। এখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল:

১। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক;
২। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের বিষয় সম্পর্কে অনুসিদ্ধান্ত গঠন করা হয়;
৩। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়মতান্ত্রিক এবং যাচাইযোগ্য;
৪। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রায়োগিক সাফল্য বিষয়গত যথার্থতা তুলে ধরে;
৫। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমস্যাকে চিহ্নিত করে এবং সমাধানের দিকনির্দেশনা প্রদান করে;
৬। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তথ্য-উপাত্ত এবং যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে উপসংহারে পৌঁছাতে সাহায্য করে;
৭। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চূড়ান্তভাবে বাস্তবতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে;

৮। গবেষণায় কার্যকর নির্দেশনা দেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রত্যয়গত ও তাত্ত্বিক কাঠামোর সহায়তা প্রদান করে;
৯। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে অনুমান ও পূর্বধারণা প্রদান করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি;
১০। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রণীত অনুসিদ্ধান্ত আরোহমূলক উপায়ে পর্যবেক্ষণ ও পুন:পরীক্ষণ পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

গবেষণায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহের কৌশল হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এখানে সুনির্দিষ্ট ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। যেকোনো বিজ্ঞানের সফলতা নির্ভর করে তার অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে তত্ত্ব নির্মাণের উপর। যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গবেষণা করে তত্ত্ব নির্মাণ করা হয়। বস্তুত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণগত প্রভাব, তত্ত্ব নির্মাণ, সাধারণীকরণ এবং ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের সক্ষমতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। এজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালনা হচ্ছে সবেচেয়ে কার্যকর উপায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী নির্দেশ করে?
(ক) একটি অনুশীলনকে (খ) একটি প্রক্রিয়াকে
(গ) একটি পদ্ধতিকে (ঘ) একটি রীতিকে

২। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয় কোনটি?
(ক) ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক (খ) বস্তুনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক
(গ) অনুসিদ্ধান্ত প্রণয়ণ করে (ঘ) নিয়মতান্ত্রিক এবং যাচাইযোগ্য

৩। বিজ্ঞানের সফলতা কিসের উপর নির্ভর করে?
(ক) তথ্যেও উপর (খ) পূর্বঘোষণার উপর
(গ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর (ঘ) তত্ত্বের উপর

পাঠ-২.৩ সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি গবেষণা পদ্ধতি : সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি

Some Research Methods used in Sociology : Qualitative and Quantitative Method

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি কী তা বলতে পারবেন;
- সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির সুবিধাবলি ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করতে পারবেন;
- সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি।

সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি

সামাজিক গবেষণায় সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির বহুলব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। গবেষণার বিষয়, ধরন, বৈশিষ্ট্য, তথ্যের পর্যাপ্ততা, গবেষকের দক্ষতা, সময়, অর্থ ইত্যাদি বিবেচনা করে পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। মোটাদাগে সংখ্যাত্মক পদ্ধতিকে পরিসংখ্যানমূলক এবং গুণাত্মক পদ্ধতিকে বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে মনে করা হয়। বস্তুত সামাজিক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কৌশল এবং তথ্যের ধরন, প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনা করে সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি নিরূপণ করা হয়।

সংখ্যাত্মক পদ্ধতি

সংখ্যাত্মক গবেষণায় বিভিন্ন চলকের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে তত্ত্বীয় অনুসিদ্ধান্ত পরীক্ষা করা হয়। এ পদ্ধতিতে ঘটনার সাধারণীকরণ করা হয় চলকের মাধ্যমে। তথ্য বিশ্লেষণ করা হয় বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখে। সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যানিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। সংখ্যাত্মক পদ্ধতির কতিপয় দৃষ্টিভঙ্গি (Approach) রয়েছে। তা হলো বিভিন্ন ধরনের জরিপ (Survey), প্রশ্নমালা জরিপ বা সাক্ষাৎকার (Questionnaire Survey or Interview), সহ-সম্পর্ক (Correlation), প্রবণতা বিশ্লেষণ (Trend Analysis) ইত্যাদি।

সংখ্যাত্মক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যবলি

সংখ্যাত্মক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যবলি নিম্নরূপ:

১। সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে চলকভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়;

২। এ পদ্ধতিতে যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, যথার্থতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়;

৩। সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে সমগ্রকের পরিমাণ অধিক হলে লেখচিত্রের মাধ্যমে এর পরিসংখ্যানিক প্রকাশ করা হয়;

৪। সারণি, গ্রাফ, আয়তলেখ প্রভৃতির সাহায্যে তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন সংখ্যাত্মক পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য;

৫। সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে গবেষক নির্দিষ্ট বিষয়ে পুনরায় গবেষণার সুযোগ পান;

৬। এ পদ্ধতিতে তথ্যের ভিত্তিতে ফলাফল যাচাই করে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের সুযোগ রয়েছে;

৭। আধুনিক কৌশল প্রয়োগ করে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাথমিক তথ্য (Primary data) সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার যায়।

সংখ্যাত্মক পদ্ধতির সুবিধাবলি

সংখ্যাত্মক পদ্ধতির কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন: ক) সংখ্যাত্মক পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণায় সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পাওয়া যায়, খ) দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করা যায়, গ) তথ্য বিশ্লেষণে অপেক্ষাকৃত কম সময় ব্যয় হয়, ঘ) বৃহৎ সমগ্রক নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, ঙ) গবেষক স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান, চ) গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের সাধারণীকরণ করা যায়, ছ) এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা তুলনামূলকভাবে বেশি জ) প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

সংখ্যাত্মক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

সংখ্যাত্মক পদ্ধতির উল্লিখিত সুবিধার বিরপীতে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন: (ক) কোনো কোনো ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় না, খ) উত্তরদাতার মতামতের পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটে না, গ) উত্তরদাতার উপর তথ্য সংগ্রহকারীর তেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

গুণাত্মক পদ্ধতি

গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতিতে সংখ্যার গুরুত্ব কম। এখানে উত্তরদাতার বিস্তারিত মতামত নেওয়া হয়। এ ধরনের পদ্ধতিতে প্রশ্নের উত্তর গভীরভাবে খোঁজা হয়। গুণাত্মক গবেষণায় পূর্বনির্ধরিত কোনো ফলাফল থাকে না। গুণাত্মক পদ্ধতিতে গবেষণাধীন বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন ও চিহ্নিতকরণ সহজ হয়। গুণাত্মক পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য কৌশলগুলো হচ্ছে: অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participatory Observation), গভীর বা বিস্তারিত সাক্ষাৎকার (In-depth Interview), ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (Focus Group Discussion- FGD), ঘটনা পর্যালোচনা (Case study), পিআরএ ইত্যাদি।

গুণাত্মক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যবলি

গুণাত্মক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। গুণাত্মক পদ্ধতিতে বাস্তব জগত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়;
২। এ পদ্ধতিতে তথ্য অনুসন্ধানের সুযোগ ও প্রক্রিয়া উন্মুক্ত থাকে;
৩। এখানে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন ব্যবহার করা হয়;
৪। গুণাত্মক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়;
৫। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়;
৬। এটি আরোহমূলক (Inductive) বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সংমিশ্রণ করে;
৭। গুণাত্মক পদ্ধতিতে ঘটনার বিশ্লেষণে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Holistic Approach) প্রয়োগ করা হয়;
৮। এখানে বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা বিবেচনায় নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়;
৯। গুণাত্মক পদ্ধতিতে গবেষকের নিজস্ব বিশ্লেষণের প্রতিফলন থাকার সম্ভাবনা থাকে।

গুণাত্মক পদ্ধতির সুবিধাবলি

গুণাত্মক পদ্ধতির কতিপয় সুবিধা রয়েছে। যেমন: ক) উন্মুক্ত প্রশ্নের কারণে গুণাত্মক পদ্ধতিতে ঘটনা উদ্ঘাটন সহজতর হয়, খ) বিস্তারিত তথ্যের মাধ্যমে সাধারণীকরণ সম্ভব হয়, গ) তথ্য পরীক্ষণের সুযোগ থাকে, ঘ) এ পদ্ধতিতে স্থানীয় জনগণের নিকট থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ সম্ভব, ঙ) সংশ্লিষ্ট সবার নিকট থেকেই তথ্য সংগ্রহের সুযোগ থাকে, চ) উত্তরদাতাগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটে, ছ) অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

গুণাত্মক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

গুণাত্মক পদ্ধতির সুবিধা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা। এগুলো হচ্ছে: ক) গুণাত্মক পদ্ধতিতে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম বেশি হয়, খ) ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা থাকে যা বস্তুনিষ্ঠতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে, গ) গুণাত্মক গবেষণায় সাধারণীকরণ কষ্টসাধ্য হয় এবং কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় সম্ভব হয় না।

সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নের সারণিতে পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হল:

ক্রমিক#	সংখ্যাত্মক পদ্ধতি	গুণাত্মক পদ্ধতি
১.	আবদ্ধ প্রশ্ন নির্ভর	উন্মুক্ত প্রশ্ন নির্ভর
২.	অবরোহমূলক (Deductive)	আরোহমূলক (Inductive)
৩.	পরিসংখ্যানিক পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়	বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ণনামূলক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়
৪.	ঘটনা সম্পর্কে অনুসিদ্ধান্ত নিশ্চিত করতে চায়	ঘটনার সমূল উদ্ঘাটন করতে চায়
৫.	তথ্য সংগ্রহ কৌশল কঠোরভাবে পালন করা হয়	তথ্য সংগ্রহ কৌশলে নমনীয়তা থাকে

৬.	বস্তুনিষ্ঠ (Objective)	অপেক্ষাকৃত পক্ষপাতমূলক (Subjective)
৭.	মূল্যবোধ বিযুক্ত	মূল্যবোধ আরোপিত
৮.	বেশি মাত্রায় সারণি ও চিত্র প্রদর্শন করা যায়	চিত্র ও সারণির ব্যবহার কম
৯.	কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়	আংশিক পাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সমাজ সর্ম্পকিত গবেষণায় সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক উভয় পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে কোন ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির পাঁচটি পার্থক্য চিহ্নিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সামাজিক গবেষণায় সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতির বহুলব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। গবেষণার বিষয়, ধরন, বৈশিষ্ট্য, তথ্যের পর্যাপ্ততা, গবেষকের দক্ষতা, সময়, অর্থ ইত্যাদি বিবেচনা করে পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। মোটাদাগে সংখ্যাত্মক পদ্ধতিকে পরিসংখ্যানমূলক এবং গুণাত্মক পদ্ধতিকে বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে মনে করা হয়। বস্তুত সামাজিক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কৌশল এবং তথ্যের ধরন, প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনা করে সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক পদ্ধতি নিরূপণ করা হয়। সংখ্যাত্মক গবেষণায় বিভিন্ন চলকের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে তত্ত্বীয় অনুসিদ্ধান্ত পরীক্ষা করা হয়। সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যানিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতিতে সংখ্যার গুরুত্ব কম। এখানে উত্তরদাতার বিস্তারিত মতামত নেওয়া হয়। গুণাত্মক পদ্ধতিতে গবেষণাধীন বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন ও চিহ্নিতকরণ সহজ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংখ্যাত্মক পদ্ধতির অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে–

(ক) জরিপ (খ) গবেষণার পরীক্ষণ

(গ) এফজিডি (ঘ) গ্রন্থাগার অধ্যয়ন

২। 'অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ' কোন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি?

(ক) সংখ্যাত্মক (খ) গুণাত্মক

(গ) পরীক্ষণমূলক (ঘ) ঘটনা অনুসন্ধান

এককথায় উত্তর দিন

৩। কোন পদ্ধতিতে চলকভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়?

৪। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Holistic Approach) কোন গবেষণা পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য?

পাঠ-২.৪ ঘটনা অনুসন্ধান এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
Case Study and Direct Participatory Observation Method

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির পদ্ধতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি (Case Study Method)

যখন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হয় তাকে ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি বলে। সমাজবিজ্ঞানে একজন গবেষক গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে যে কোনো ব্যক্তির যাবতীয় আচরণ, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, মতামত, অভিযোজন কৌশল জানার চেষ্টা করেন। ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনার গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে অর্ন্তনিহিত বিষয়াবিলর বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতির সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

Burgess এর মতে, ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি হলো সামাজিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র। (Case study method is the social microscope)। **Young** বলেছেন, ঘটনা অনুসন্ধান হলো সামাজিক এককের জীবনধারা উদঘাটন ও বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি। এই একক একজন ব্যক্তি, একটি পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি দল অথবা একটি পুরা সম্প্রদায় হতে পারে। (Case study is a method of exploring and analysing the life of a social unit- be that unit a person, a family, institution, culture-group, or even an entire community.) **Kothari** বলেছেন, ঘটনা অনুসন্ধান একটি পদ্ধতি যা ব্যাপ্তির চেয়ে গভীর বিষয় অধ্যয়ন করে। (Case study is a method of study in depth rather than breadth…).

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি সমাজ গবেষণার বর্ণনামূলক, তথ্য উদঘাটনমূলক এবং অনুসন্ধানমূলক একটি কৌশল।

ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে বিভিন্ন ব্যক্তি, ঘটনা, অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করা যায়। এ পদ্ধতিতে নমুনায়নের প্রয়োজন হয় না। গবেষণা একক সম্পর্কে নবতর ধারণা পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে গবেষকের অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারণ এবং তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। গবেষকের পর্যবেক্ষণ সক্ষমতাকে আরো তীক্ষ্ণ করে তোলে।
ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে গবেষকের পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বেশি। এ পদ্ধতিতে সাধারণীকরণ দুরূহ। ঘটনা অনুসন্ধানে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে অল্প তথ্য সংগৃহীত হয়। এখানে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়। সংখ্যাত্মক উপাত্তের ঘাটতি থাকে। এ পদ্ধতিতে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ঘটনার সামগ্রিকতা বজায় রেখে গবেষণা চালানো প্রায় অসম্ভব।

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Direct Participatory Observation Method)

সামাজিক গবেষণায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। যে গবেষণায় গবেষক কোনো বিশেষ সমাজ, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে সেখানে অবস্থান করে তাদের নিত্যকার আচার আচরণ, রুচি-মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনধারা আয়ত্ত করে নিজ গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন তাই হলো প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে এ পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন:

Phillips তাঁর সংজ্ঞায় বলেন, এটা এমন এক পদ্ধতি যাতে গবেষক সামাজিক ঘটনাবলির অংশ হিসেবে তথ্য লিপিবদ্ধ এবং সংগ্রহ করেন। (A method of data collection in which the researcher notes and records ongoing social phenomena with his own behavior constituting past of the phenomena)। **Wax** এর মতে, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সেই ধরনের গবেষণাকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে অনুসন্ধানকারী নির্দিষ্ট দলের একজন সদস্য হিসেবে গবেষণার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হন। (Participant observation method refers to those forms of research in which the investigator devotes himself to attaining some kind of membership in or close attachment to an alien exotic group that he wishes to study.)

পরিশেষে বলা যায়, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষক গবেষণাধীন এলাকায় অবস্থান করে উত্তরদাগণের জীবনরীতি পর্যবেক্ষণের সাহায্যে গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেন।

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

গবেষক যখন কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন তার বিস্তারিত অনুধাবনে সক্ষম হয়। এ পদ্ধতিতে গভীর তথ্যানুসন্ধান করতে পারে। সমাজ নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এধরনের পদ্ধতির আশ্রয়ে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষক গবেষণা এলাকা ও গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করতে সক্ষম হন। সমাজ বাস্তবতার অনেক সূক্ষ্ম বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিতে গবেষক কোনো দল বা সমাজের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়। ফলে গবেষক নির্দিষ্ট দল বা সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। এতে গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। কোনো সামজিক বা সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য দীর্ঘসময় অবস্থান করার প্রয়োজন হয়। দীর্ঘদিন অবস্থানের কারণে গবেষকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে। পর্যবেক্ষণ ও গবেষকের আবেগ অনুভুতি মিলে অপ্রাসঙ্গিক তথ্য লিপিবদ্ধ হবার আশংকা থাকে। অনেক সময় পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণের তুলনায় নতুন কিছু আবিষ্কার করার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, যখন গবেষক নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অবস্থান করে তাদেরই একজন সদস্য হয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন তাকে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ বলে। এ ক্ষেত্রে একজন গবেষক দক্ষ এবং সচেতন হলে তার পক্ষে এ সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির পাঁচটি সুবিধা লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খর অনুসন্ধানকে ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি বলে। ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনার গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে নমুনায়নের প্রয়োজন হয় না। গবেষণা একক সম্পর্কে নবতর ধারণা পাওয়া যায়।

অন্যদিকে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ হচ্ছে এমন একটি গবেষণা পদ্ধতি যেখানে গবেষক কোনো বিশেষ সমাজ, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে সেখানে অবস্থান করে তাদের নিত্যকার আচার আচরণ, রুচি-মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনধারা সম্পর্কে নিজ গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এ পদ্ধতিতে গভীর তথ্যানুসন্ধান করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন পদ্ধতিকে সামাজিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র বলা হয়েছে?

(ক) জরিপ পদ্ধতি (খ) গুণাত্মক পদ্ধতি (গ) এফজিডি (ঘ) ঘটনা অনুসন্ধান পদ্ধতি

২। 'প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি'র স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কী?

(ক) এটি সংখ্যাত্মক গবেষণা (খ) স্বল্প সময়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহকরা যায়

(গ) নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে অবস্থান করা (ঘ) নির্দিষ্ট ঘটনার গভীর অনুসন্ধান

পাঠ-২.৫ জরিপ পদ্ধতি এবং পিআরএ
Survey Method and PRA

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জরিপ পদ্ধতি কী তা বলতে পারবেন;
- জরিপ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পিআরএ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	জরিপ পদ্ধতি, পিআরএ।

জরিপ পদ্ধতি (Survey Method)

'জরিপ' শব্দের অর্থ হলো কোন কিছু সরজমিনে পরিমাপ বা নিরূপণ করা। 'সামাজিক জরিপ' অর্থ হলো সামাজিক বিষয়াবলির সরজমিনে তথ্য সংগ্রহ করা। সামাজিক জরিপ বর্ণনামূলক ও তথ্য উদ্‌ঘাটনমূলক প্রক্রিয়া অনসুরণ করে। সমাজবিজ্ঞানে এ পদ্ধতি অনুসিদ্ধান্ত গঠন, তত্ত্ব নির্মাণ এবং সাধারণীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি আর্থ-সামাজিক নানাবিধ বিষয়বস্তুর একটি বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করে। নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সামাজিক জরিপ সমাজের বাস্তব চিত্র উদঘাটন, বর্ণনা ও বিশ্লেষণে সহায়তা করে। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে জরিপ পদ্ধতির সংজ্ঞায়ন করেছেন। যেমন:

Wells তাঁর সংজ্ঞায় বলেন, সামাজিক জরিপ হচ্ছে, বাস্তব ঘটনার অনুসন্ধান যা প্রধানত শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য ও সাম্প্রদায়িক জীবনের প্রকৃতি ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে।

Bailey তাঁর সংজ্ঞায় বলেন, জরিপ হলো তথ্য সংগ্রহের কৌশল যা নমুনায়নের মাধ্যমে উত্তরদাতা নির্বাচন করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর গ্রহণ করা হয়। (Survey is a data collection technique that asks questions of a sample of respondents generally at a single point in time either with a self - administered questionnaire or as interviewer.)

সুতরাং জরিপ পদ্ধতি হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো এলাকার জনগণ বা তাদের প্রতিনিধিত্বশীল (নমুনায়িত) অংশের বৈশিষ্ট্য, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসহ যেকোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া। সঠিক তথ্যের উপরই জরিপের সফলতা ও কার্যকারিতা নির্ভরশীল।

সাধারণভাবে জরিপ হচ্ছে দুই প্রকার। যথা ক) নমুনা জরিপ (Sample survey) এবং খ) পূর্ণ গণনামূলক জরিপ (Complete enumeration survey)। নমুনা জরিপে সমগ্রক থেকে নির্বাচিত বা নমুনায়িত উত্তরদাতাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেমন দুর্নীতির প্রকোপ অনুসন্ধানে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাছাইকৃত সীমিতসংখ্যক সরকারি সেবাগ্রহীতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ। সমগ্রক জরিপ হচ্ছে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। এখানে উত্তরদাতা নির্বাচন বা নমুনায়ন করা হয় না। যেমন আদম শুমারি।

জরিপ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

আধুনিক সমাজ গবেষণায় বিভিন্ন বিষয়ে জরিপ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। জরিপ পদ্ধতি যেকোনো সমস্যা সম্পর্কে সার্বিকভাবে জানতে সহায়তা করে। গবেষণায় তুলনামূলক অনুসন্ধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সহজ হয়। এ পদ্ধতিতে সমস্যা চিহ্নিত করা যায় এবং বহুলাংশে তা নির্দিষ্টকরণ সম্ভব হয়। উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে কম খরচে তথ্য সংগ্রহ ও সমগ্রক সম্পর্কে সাধারণীকরণ সম্ভব হয়।

জরিপ পদ্ধতির বিভিন্ন সুবিধা থাকলেও এর কতিপয় সীমাবদ্ধতাও লক্ষ করা যায়। সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের গভীরতা কম। অনেক সময় জনগণের প্রকৃত মতামতের যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না । উত্তরদাতার সাড়া প্রদানের উপর গবেষকের তেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অনেক সময় অপ্রত্যাশিত জটিলতা তৈরি হতে পারে।

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ নিরূপণ পদ্ধতি (Participatory Rural Appraisal- PRA)

সাম্প্রতিক সামাজিক গবেষণায় পিআরএ একটি বহুলব্যবহৃত পদ্ধতি। পিআরএ- এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Participatory Rural Appraisal (PRA) অংশগ্রহণমূল গ্রামীণ সমীক্ষা/নিরূপণ। এ পদ্ধতির পূর্বতন ভার্সন হল দ্রুত গ্রামীণ সমীক্ষা বা Rapid Rural Appraisal (RRA)। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবহেলিত মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রেরণা থেকে বিখ্যাত গবেষক রবার্ট চেম্বার এ পদ্ধতির উদ্ভব করেন। শহর কিংবা গ্রাম যেকোনো স্থানের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ খুব কম। পিআরএ- এর মাধ্যমে এসব অবহেলিত মানুষকে উন্নয়নের অংশীদার করা হয়। তাদের সাথে আলোচনা, তাদের মতামত গ্রহণ সর্বোপরি তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ ধারণা থেকেই বা অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা নামকরণ করা হয়। মূলত আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উন্নয়ন সহযোগী এবং উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) পিআরএ প্রদ্ধতি প্রয়োগ করে আসছে। তাদের মাধ্যমেই পিআরএ নামটি বহুলপ্রচার লাভ করে। বিদগ্ধজনেরা বিভিন্নভাবে পিআরএ- এর সংজ্ঞায়ন করেছেন। যেমন:

McGracken *et.al* বলেন, PRA as a semi-structured activity carried out in the field, by a multi-disciplinary team and designed to quickly acquire new information on, and new hypothesis about rural life. তবে পিআরএ এর প্রচার ও প্রসারে যাঁর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন Robert Chambers. তাঁর মতে, পিআরএ হলো এমন কতগুলো পদ্ধতির সমষ্টি যা গ্রামের দরিদ্র মানুষকে তাদের নিজেদের জীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা, অপরিচিত ব্যক্তি বা দলের সাথে আত্মবিশ্বাস, মতামত আদান-প্রদান এবং নিজস্ব সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে তাদের পরিকল্পণা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে দক্ষ করে তোলে।

বলা হয়ে থাকে যে, গুণাত্মক গবেষণায় বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে পিআরএ। পিআরএ পদ্ধতিতে অনেকগুলো টুলস্ ব্যবহার করা হয়। এরর মধ্যে পরিভ্রমণ (Transact), সামাজিক মানচিত্রায়ন (Social Mapping), সময়রেখা (Time line), ভেন-ডায়াগ্রাম (Venn Diagram), মৌসুমী দিনপঞ্জি (Seasonal Calendar) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যখন দ্রুত এবং স্বল্প ব্যয়ে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য ও গুণগত তথ্য প্রাপ্তির কার্যকর পদ্ধতির অনুপস্থিতি হয়ে ওঠে এবং প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতিসমূহের সীমাবদ্ধতা দৃষ্টি গোচর হয় তখন পিআরএ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষজ্ঞগণ উপলব্ধি করেন। পিআরএ'র টুলস্সমূহ সহজ প্রকৃতির হওয়ার সাধারণ মানুষ কর্তৃক সহজে বোধগম্য ও ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে।

সমাজ গবেষণায় পিআরএ পদ্ধতিতে কৌশল হিসেবে ফোকাস দল আলোচনা (Focus Group Discussion) যা এফজিডি নামে পরিচিত এবং Key Informant Interview (KII) বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। এফজিডি মূলত একটি দলীয় আলোচনা। ফোকাস দল আলোচনা বলতে সহজ কথায় উপযুক্ত অনুসন্ধান বিষয়ের উপর ক্ষুদ্র দলভূক্ত সচরাচর ৬ জন থেকে ১২ জন সদস্যগণের মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারীর পরিচালনায় আলোচনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমে একজন সঞ্চালক বা মধ্যস্থতাকারী, কয়েকজন অংশগ্রহণকারী, তথ্য লিপিবদ্ধকারী (Note taker) এবং বহিঃসদস্যদের দ্বারা তথ্য প্রদানে বিভ্রান্তি এড়াতে একজন গেট কিপিং-এ দায়িত্ব পালনকারী অংশগ্রহণ করেন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সমাধানে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ার সাধারণ মানুষের মতামতের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। অপর পক্ষে কেআইআই (KII), এর মাধ্যমে গবেষণা বিষয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যারা অধিকতর দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং তথ্য সমৃদ্ধ তাঁদের নিকট থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ কৌশলে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা সংখ্যাত্মক তথ্যের যথার্থতা নির্ণয়ে সুবিধা হয়। তাছাড়া উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে এ ধরণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি বর্গের মতামতের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় যা সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জরিপ পদ্ধতির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

শুরুতে সমাজবিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞান তথা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরল করত। পরবর্তিতে সমাজবিজ্ঞানে নিজস্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন সমাজবিজ্ঞানীগণ। বর্তমানে সমাজ গবেষণায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এগুলোর মধ্যে জরিপ, পিআরএ ও কেআইআই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব পদ্ধতির সাহায্যে সামাজিক ঘটনাসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়ন সম্ভব হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জরিপ পদ্ধতি প্রধানত কয় প্রকার?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার

(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার।

২। 'এফজিডি' এবং 'কে.আই.আই' কোন পদ্ধতির সাথে সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

(ক) এটি সংখ্যাত্মক গবেষণা (খ) পিআরএ পদ্ধতি

(গ) নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে অবস্থান করা (ঘ) পিআরএ পদ্ধতি।

ইউনিট-২ এর উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩ ঃ ১। ক ২। খ ৩। সংখ্যাত্মক পদ্ধতিতে ৪। গুণাত্মক পদ্ধতির

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪ ঃ ১। ঘ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৫ ঃ ১। ক ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। খ ৪। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. Science কোন ধরনের জ্ঞান?
ক. প্রযুক্তিগত জ্ঞান খ. নৈতিক জ্ঞান
গ. বিশেষ জ্ঞান ঘ. সাধারণ জ্ঞান

২. সমাজবিজ্ঞান কার্যকর গবেষণার জন্য কী অনুসরণ করে?
ক. পরীক্ষাগারে প্রমাণ খ. গাণিতিক পদ্ধতি
গ. বৈজ্ঞানিক সূত্র ঘ. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

খ) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩. বিজ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য-
i. সর্বজনীন
ii. ব্যক্তিগত
iii. কারণিক
সঠিক উত্তর কোনটি?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের কার্যকর ক্ষেত্র হচ্ছে–
(i) ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে
(ii) নিরক্ষর এবং দুর্বোধ্য ভাষার জনগোষ্ঠীর মধ্যে
(iii) ল্যাবরেটরিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii ও iii খ. ii ও iii গ. ii ঘ. i, ii, ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

দীপা ও নিপা দুই বান্ধবী। নিপা কয়েক দিন আগে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার একটি গ্রাম ঘুরে যায়। সেখানে একটি উপজাতীয় সমাজ বসবাস করে। তার এই অভিজ্ঞতা দীপাকে বলে। নিপার কথা শুনে দীপার মনে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। প্রশ্নের অনেক উত্তরই নিপার জানা নাই। নিপার ধারণা গ্রামের মানুষের সঙ্গে অবস্থান করে এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। তাই দীপাকে অনুরোধ করে যে, তাকে নিয়েই নিপা উক্ত গ্রামে তথ্যানুসন্ধান করবে। আর তাতেই মিলবে অজানা প্রশ্নের উত্তর।

(ক) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী? ১
(খ) সমাজ গবেষণায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়? ২
(গ) উদ্দীপকে সামাজিক গবেষণার কোন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে? ৩
(ঘ) সমাজ গবেষণায় উক্ত পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা কি? ৪

ইউনিট ৩

সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

Theories and Contribution of Sociologists

সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। আলোচ্য বিষয়, তত্ত্ব, পদ্ধতি, সাধারণীকরণ এবং বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞান আজ সত্যিই অনেক পরিণত। কিন্তু শাস্ত্রটি এ অবস্থায় একদিনে আসেনি। সমাজতাত্ত্বিকদের দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়ে সমাজবিজ্ঞান আজকের এ অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান উদ্ভবের মূলে একটি দীর্ঘ পটভূমি এবং অসংখ্য মনীষীর অবদান রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান বিকাশেও রয়েছে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকের অবিস্মরণীয় অবদান। তাঁদের সমাজচিন্তা, গবেষণা, কালজয়ী তত্ত্ব ও মতবাদ সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের অবদানেই সামাজিক বিজ্ঞানের একটি জনপ্রিয় শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান আজ পরিণত, প্রতিষ্ঠিত। অগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞানের জনক। কিন্তু ইবনে খালদুন, হার্বার্ট স্পেন্সার, কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার, এমিল ডুর্খেইম সমাজবিজ্ঞানের একেকজন স্থপতি। বস্তুত তাঁরাই সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎ। তাদের হাত ধরেই সমাজবিজ্ঞান আজকের এই শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে। এ ইউনিটে সমাজবিজ্ঞানের কয়েকজন প্রথিতযশা সমাজতাত্ত্বিকের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৭ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান
পাঠ-৩.২ : ইবনে খালদুন
পাঠ-৩.৩ : অগাস্ট কোঁৎ
পাঠ-৩.৪ : হার্বার্ট স্পেন্সার
পাঠ-৩.৫ : এমিল ডুর্খেইম
পাঠ-৩.৬ : কার্ল মার্কস
পাঠ-৩.৭ : ম্যাক্স ওয়েবার

পাঠ-৩.১ অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান
Theories and Contribution of the Pioneer Sociologists

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানীদের সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করতে পারবেন এবং
- সমাজবিজ্ঞানীদের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অগ্রপথিক সমাজবিজ্ঞানী, সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ, সমাজতাত্ত্বিক অবদান।

সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা সামাজিক বিষয়ের সাধারণ অথবা বিশেষভাবে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সমাজবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অধ্যয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে সমাজবিজ্ঞানীগণ অবদান রেখেছেন। তাঁদের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা ও দর্শন সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশে যাঁদের অবদান সবেচেয়ে বেশি তাঁদের মধ্যে ইবনে খালদুন, অগাস্ট কোঁৎ, হার্বার্ট স্পেন্সার, এমিল ডুর্খেইম, কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইবনে খালদুন সমাজের সঠিক ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে সমসাময়িক সমাজের সমাজ সংস্কৃতি রীতিনীতি সম্পর্কে জানার প্রয়োজন অনুভব করেন। এ জন্য তিনি সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের প্রতি গুরুত্ব দেন। সমাজ সম্পর্কিত গ্রন্থ না পেয়ে নিজেই সমাজবিজ্ঞান রচনায় মনোযোগী হন যা সংস্কৃতির বিজ্ঞানের রূপ পরিগ্রহ করে। রাষ্ট্রের উত্থান পতনের সাথে সামাজিক সংহতি কিভাবে সম্পর্কিত তা আসাবিয়াহ প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশ করেন। '*আল-মুকাদ্দিমা*' তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন অগাষ্ট কোঁৎ। তিনি সমাজকে নিয়ে নতুন একটি বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যা সমাজবিজ্ঞান বলে পরিচিত। তিনি মানব বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের তিনটি স্তরের কথা বলেন যা দ্বারা সমাজের তিনটি বিবর্তন ধারা প্রকাশ পায়। দৃষ্টবাদে যা কিছু সত্য, বাস্তব, পরীক্ষাযোগ্য তার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। বিজ্ঞানের সোপানক্রমে সমাজবিজ্ঞানকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন কারণ সমাজবিজ্ঞান একটি সমন্বিত বিজ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে পদার্থবিদ্যা এবং জীববিদ্যার সূত্র প্রয়োগের কথা বলেছেন। তাঁর মতে জীব জগতে যেমন বিবর্তন হয় তেমনি সমাজও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সহজ সরল অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে জটিল অবস্থায় উপনীত হয়েছে। জৈবিক সাদৃশ্যবাদে সমাজকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, জীবদেহে যেমন বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্মক্ষম থেকে সচল থাকে তেমনি সমাজের বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা পারস্পরিক কর্মকাণ্ড ও মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকে সচল রেখেছে।

এমিল ডুর্খেইম সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক ঘটনার বিজ্ঞান বলেছেন। সামাজিক ঘটনা বলতে তিনি কোনো জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত চিন্তা-চেতনা, প্রবণতা ও রীতি-নীতি প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন। সামাজিক ঘটনা সমাজের যৌথ প্রতিরূপের মাঝেই নিহিত। আত্মহত্যা বিষয়ক আলোচনায় তিনি মনস্তাত্ত্বিক, ভৌগোলিক প্রভৃতি কারণকে নাকচ করে সামাজিক কারণসমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সামাজিক বন্ধনের মূলসূত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে তিনি সমাজে শ্রমবিভাজনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ডুর্খেইমের মতে, ধর্ম কেবল অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসই নয় বরং এর সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। ধর্ম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং সামাজিক শৃঙ্খলায় ভূমিকা রাখে।

কার্ল মার্কস বস্তুবাদী সমাজচিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত। ঐতিহাসিক বস্তুবাদে তিনি সমাজ তথা ইতিহাসকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেছেন। উৎপাদন পদ্ধতিকে সমাজের মৌল কাঠামোর (Basic Structure) সঙ্গে তুলনা করেছেন যা উপরিকাঠামোকে (Super Structure) প্রভাবিত করে। সমাজের চালিকা শক্তি হিসেবে উৎপাদন পদ্ধতির গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, মানব সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। বিভিন্ন সমাজে শ্রেণি সংঘাত এবং সংগ্রামের

কারণেই নতুন সমাজ সৃষ্টি হয়। শ্রেণি সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি শ্রেণি সংগ্রামের কারণ এবং এর নানাবিধ বিষয় তুলে ধরেছেন। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণি কিভাবে তাদের উৎপাদিত পণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐ সমাজেই বসবাস করে তা তার শ্রমের বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রমিক শ্রেণি তাঁর শ্রমের মাধ্যমে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য কিভাবে পুঁজিপতি শ্রেণি শোষণ করে তা উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বে আলোচনা করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন ম্যাক্স ওয়েবার। তিনি আদর্শ নমুনার মতবাদে বলেছেন, কোনো বিষয়বস্তু একটি মানসিক চিত্র যার মাধ্যমে ঐ বিষয়বস্তুর বাস্তব দিকগুলো মূর্তমান হয়ে ওঠে। আমলাতান্ত্রিক ধারণায় তিনি একটি আদর্শ ধরনের আমলাতন্ত্রের কথা বলেছেন যা সামাজিক উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। তাঁর মতে, ক্ষমতা হলো অন্যের মতামত তথা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা। যখন তার বৈধতা থাকে তখন তাকে কর্তৃত্ব বলে। পুজিঁবাদ সম্পর্কিত আলোচনায় ম্যাক্স ওয়েবার কার্ল মার্কসের বিপরীত ধারণা প্রদান করেন। মার্কস যেখানে বলেছেন, সমাজের মৌল কাঠামো (Basic Structure) উপরি কাঠামোকে (Super Structure) প্রভাবিত করে ম্যাক্স ওয়েবার সেখানে বলেছেন, কেবলমাত্র মৌল কাঠামোই নয় বরং কখনও কখনও উপরিকাঠামোও মৌল কাঠামোকে প্রভাবিত করে। এ ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় নীতিমালা পুজিঁবাদ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানীদের উপর্যুক্ত চিন্তা, অনুসন্ধান, গবেষণা, তত্ত্ব ও মতবাদ সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজবিজ্ঞান উদ্ভব ও বিকাশে যেকোনো তিনজন মনীষীর তাত্ত্বিক অবদান লিখুন। **সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁত ১৮৩৯ সালে সমাজবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু করলেও এর বিকাশে অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মধ্যে ইবনে খালদুন, হার্বার্ট স্পেন্সার, এমিল ডুর্খেইম, কার্ল মার্কস, ম্যাক্স ওয়েবার উল্লেখযোগ্য। সমাজকে নিজস্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা তাঁদের রচনার মধ্য দিয়েই সবেচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয়েছে। ফলে সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন সমাজবিজ্ঞানী সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন?
(ক) ম্যাক্স ওয়েবার (খ) হার্বার্ট স্পেন্সার
(গ) কার্ল মার্কস (ঘ) এমিল ডুর্খেইম

২। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা কে প্রদান করেন?
(ক) ইবনে খালদুন (খ) ম্যাক্স ওয়েবার
(গ) কার্ল মার্কস (ঘ) অগাস্ট কোঁত

৩। আদর্শ নমুনা হলো-
(ক) মানুষের আচরণ (খ) পরিসংখ্যানিক গড়
(গ) সামাজিক সমস্যা (ঘ) একটি মানসিক চিত্র

পাঠ-৩.২ ইবনে খালদুন
Ibn Khaldun

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ইবনে খালদুনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আসাবিয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- সামাজিক ইতিহাস রচনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ইবনে খালদুন, আল-মুকাদ্দিমা, আসাবিয়া, ইতিহাসের দর্শন।

জীবন ও কর্ম

ইবনে খালদুন ১৩৩২ অব্দে উত্তর আফ্রিকার তিউনিস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বংশানুক্রমে দক্ষিণ আরবের প্রসিদ্ধ কিন্দা গোত্রের অধিবাসী। খালদুনের পিতা একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে কোরআন, কোরআন সম্পর্কিত বিজ্ঞান, হাদিস ও ধর্মীয় নিয়ম-কানুন অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হতে তাঁর শাণিত বুদ্ধি ও দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর চিন্তা জগতের বিকাশ ঘটান ইতিহাস, দর্শন, গণিত অধিবিদ্যা, সমাজবিদ্যা প্রভৃতির মাধ্যমে। ১৪০৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে খালদুন রচনাসমগ্র 'কিতাব-আল-ইবর্' গ্রন্থটিকে 'পৃথিবীর ইতিহাস' বলা হয়। 'কিতাব-আল-ইবর্' তিনটি পুস্তকে মোট সাত খন্ডে বিভক্ত। প্রথম পুস্তকের নাম 'মুকাদ্দিমা' বা 'আল-মুকাদ্দিমা' যাকে ইতিহাসের ভূমিকা বলা হয়। দ্বিতীয় পুস্তকে সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেন যা 'আল-উমরান' বলে পরিচিত। তৃতীয় পুস্তকে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকে তার সমসাময়িক সময় পর্যন্ত আরবের ইতিহাস বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

আল-মুকাদ্দিমার গুরুত্ব

ইবনে খালদুন তাঁর মূল্যবান অমর গ্রন্থ 'আল-মুকাদ্দিমার'য় ইতিহাসের দর্শন, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের প্রকারভেদ, রাষ্ট্রের উত্থান-পতন, আসারিয়া বা গোষ্ঠী সংহতি বিষয়ে আলোচনা করেন। ইতিহাসের দর্শন আলোচনায় সঠিক ইতিহাস রচনার গুরুত্ব আলোচনা করেন। এ সময়ে ইতিহাসের ভ্রান্তিসমূহ কিভাবে সঠিক ইতিহাসের অন্তরায়ের রূপ পরিগ্রহ করে তা স্পষ্ট করেন। খালদুন সরকার ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তিন ধরনের রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। তা হলো প্রথমত: সিয়াসা দিনিয়া যা শরিয়া মোতাবেক পরিচালিত, দ্বিতীয়ত: সিয়াসা আকলিয়া যা মানবীয় কারণ দ্বারা পরিচালিত। তৃতীয়থ: সিয়াসা মাদানিয়া যা দার্শনিকদের মতামতের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত। রাষ্ট্রের উত্থান পতন সম্পর্কিত আলোচনায় একটি চক্রাকার তত্ত্ব প্রদান করেছেন যার মাধ্যমে আসাবিয়াহ বা সংহতির গুরুত্ব স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্র কিভাবে একটি শক্তিশালী আসাবিয়ার মধ্যদিয়ে গঠিত হয় এবং তা কিভাবে দুর্বল হয়ে পতন ঘটে তা আলোচনা করেছেন যা সামাজিক বাস্তবতা অনুধাবনে সহায়ক।

আসাবিয়া

সমাজচিন্তায় ইবনে খালদুনের আসাবিয়া (Asabiya) বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আসাবিয়া প্রত্যয়টি সামাজিক সংহতির (Social Solidarity) সমার্থক বিবেচনা করা হয়। আসাবিয়া হচ্ছে একটি গোষ্ঠীগত উন্মাদনা ও সংহতি। এ সংহতির উপর ভিত্তি করে যেকোনো গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের নিজেদের গোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য অন্য গোষ্ঠীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণত এ ধরনের সংহতির মাধ্যমে প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পন্ন ও চরম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে। বিভিন্ন উপায়ে আসাবিয়া তথা সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। যেমন রক্তসম্পর্ক, ধর্ম, ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতি, জ্ঞাতি সম্পর্ক, ভাষা, জাতীয়তা, শ্রমবিভাজন প্রভৃতি।

ইতিহাসের দর্শন

ইবনে খালদুন ইতিহাসকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, কেবলমাত্র ঘটনার বর্ণনা হিসেবে নয়। তিনি সঠিক ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন যা কারণিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাঁর এই ধারণা সামাজিক দর্শনের নতুন শাখা তৈরিতে সাহায্য করে। তাঁর মতে, ইতিহাস লেখার জন্য অসংখ্য মৌলিক উপাদান ও অপরিমিত জ্ঞানের দরকার। আরো দরকার চিন্তা প্রবণতা ও পরিপূর্ণ মানসিকতার। এ দুটি গুণের অধিকারী হলেই ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধানে অগ্রসর হতে পারেন এবং ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়াতে পারেন। ইবনে খালদুনের মতে ইতিহাস হচ্ছে পৃথিবীর সংস্কৃতি, সভ্যতা বিকাশের অমর কাহিনী, মানব সমাজের তথ্যাবলী এবং পৃথিবীর মানুষের যাবতীয় কার্যাবলীর বিবরণ।

ইবনে খালদুন সঠিক ইতিহাস রচনা করার জন্য ইতিহাসবিদকে ঐ সমাজের সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান লাভের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইতিহাসবিদ নিজে ঘটনার কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইবাছাই করে সঠিক ইতিহাস রচনা করবেন।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ইতিহাস চর্চায় ইবনে খালদুনের মতবাদ লিখুন	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ইবনে খালদুন সমাজের সঠিক ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ঐ সমাজের সমাজ সংস্কৃতি রীতিনীতি সম্পর্কে জানার প্রয়োজন অনুভব করেন। এ জন্য তিনি সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের প্রতি গুরুত্ব দেন। সমাজ সম্পর্কিত গ্রন্থ না পেয়ে নিজেই সমাজবিজ্ঞান রচনায় মনোযোগী হন যা সংস্কৃতির বিজ্ঞানের রূপ পরিগ্রহ করে। রাষ্ট্রের উত্থান পতনের সাথে সামাজিক সংহতি কিভাবে সম্পর্কিত তা আসাবিয়াহ প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশ করেন। আল-মুকাদ্দিমা তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইবনে খালদুন কত ধরনের রাষ্টের ধারণা দেন ?

(ক) দুই (খ) তিন

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। 'আসাবিয়াহ' দ্বারা খালদুন কী বুঝিয়েছেন?

(ক) সামাজক নিয়ন্ত্রন (খ) সামাজীকীকরণ

(গ) সামাজিক সংহতি (ঘ) সামাজিক উন্নয়ন

৩। ইবনে খালদুনের মূল গ্রন্থের নাম কি?

(ক) কিতাব-উল-ইবর্ (খ) আল-উমরান

(গ) মুকাদ্দিমা (ঘ) রিপাবলিক

পাঠ-৩.৩ অগাস্ট কোঁৎ
Auguste Comte

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অগাস্ট কোঁৎ- এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- অগাস্ট কোঁৎ- এর ত্রয়স্তরের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের স্তর আলোচনা করতে পারবেন;
- দৃষ্টবাদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বিজ্ঞানের সোপানক্রম বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অগাস্ট কোঁৎ, ত্রয়স্তর সূত্র, দৃষ্টবাদ, বিজ্ঞানের সোপানক্রম।

জীবন ও কর্ম

অগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে পরিচিত। তিনি ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের মন্টপেলিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই কোঁৎ প্রখর স্মরণশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। ১৬ বছর বয়সে ইকলে পলিটেকনিক নামক স্কুলে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি প্যারিসে চলে যান। ১৮৫৭ সালে অগাস্ট কোঁৎ মৃত্যুবরণ করেন।

ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া অগাস্ট কোঁৎ- এর সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা ও তত্ত্বকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। ফরাসী বিপ্লব সামন্তবাদের অবসান ঘটিয়ে শ্রেণিবৈষম্যজনিত সমাজব্যবস্থা কাঠামো ভেঙ্গে দেয়। সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা ও অসংগতি বিরাজ করতে থাকে। অগাস্ট কোঁৎ তৎকালীন ফ্রান্সের বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা পর্যবেক্ষণ করে সমাজ পুর্ণগঠনের চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। কোঁৎ এর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে Positive Philosophy এবং Positive Polity বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৯ সালে তিনি *'Sociology'* প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন। তার প্রধান তত্ত্বগুলোর মধ্যে ত্রয়স্তর সূত্র, দৃষ্টবাদ এবং বিজ্ঞানের ক্রমসোপান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ত্রয়স্তর সূত্র (Law of Three Stages)

কোঁতের ত্রয়স্তর সূত্র প্রধানত মানব জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। সমাজের বিকাশ বলতে তিনি জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশকেই বুঝিয়েছেন। জ্ঞানের স্তরের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কোঁৎ সমাজকে দেখেছেন ক্রমবিকাশ ও প্রগতির প্রক্রিয়া হিসেবে। তাঁর মতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তিনটি স্তরের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক রূপ লাভ করেছে। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের তিনটি স্তর হচ্ছে:

১। ধর্ম সম্বন্ধীয় স্তর (Theological Stage)
২। অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তর (Metaphysical Stage) এবং
৩। দৃষ্টবাদী স্তর (Positive Stage)

১। ধর্ম সম্বন্ধীয় স্তর

মানুষের জ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে ধর্ম সম্বন্ধীয় স্তর। এ স্তরে মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। প্রকৃতিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারেনি। মানুষ মনে করেছে প্রকৃতিতে সবকিছুই অতিপ্রাকৃত শক্তির ইশারায় চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ স্তরে মানুষের মন ধর্মীয় ভাবাবেগে আচ্ছন্ন থাকে। এ স্তরকে আবার তিনটি ধাপে বিভক্ত করা হয়। যথা-

(ক) প্রকৃতি পুজা (Fetishism): এ পর্যায়ে অতিপ্রাকৃত ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটে যা ভক্তি ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয়।
(খ) বহুদেববাদ (Politheism): এ পর্যায়ে বিশ্বাস করা হয় যে, মহাবিশ্ব বহু দেবদেবতা দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
(গ) একেশ্বরবাদ (Monotheism): এ পর্যায়ে বিশ্বাস করা হয় মহাবিশ্ব এক ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।

ধর্ম সম্বন্ধীয় স্তরে প্রাধান্য থাকে পুরোহিত ও যাজক শ্রেণির হাতে এবং ধর্মই এই স্তরে সমাজ গঠন ও সমাজ পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

২। অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তর

অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তরটি চিন্তা ও সমাজ বিবর্তনের মধ্যবর্তী পর্যায়। এ স্তরটির অবস্থান ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তর থেকে দৃষ্টবাদী স্তরে উত্তরণের অর্ন্তবর্তী সময়ে লক্ষ করা যায়। এ স্তরে মানুষের চিন্তাজগতে পরিবর্তন হতে শুরু করে। একেশ্বরবাদের পরবর্তী পর্যায়টিতে অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তরের আর্বিভাব ঘটে। মানুষ বিশ্বাস করে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেবতা দ্বারা পরিচালিত হয় না বরং একটি বিশেষ শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তরে প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার, প্রাকৃতিক আইন ইত্যকার নানাবিধ বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময়ে মানুষের মনে জিজ্ঞাসা এসেছে, উৎসাহ বেড়েছে, সমস্যা প্রতিকারের চিন্তা এসেছে, যুক্তি এসেছে। মানুষ তার অস্তিত্বে কর্মের ফল ও ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হতে থাকে। অগাস্ট কোঁৎ- এর ধারণা অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তর বেশি দিন স্থায়ী ছিল না। কারণ বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সাথে সাথে এ স্তর দ্রুত পরিবর্তিত হয় যার মূখ্য ভূমিকা পালন করে বিজ্ঞানের সূচনা ও বিকাশ।

৩। দৃষ্টবাদী স্তর

দৃষ্টবাদী স্তরে মানুষের যুক্তি ও পর্যবেক্ষণ সম্মিলিতভাবে জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করে। এ স্তরে মানুষ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে প্রকৃত বিষয় ও ঘটনার সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়েই জ্ঞানের উৎস খুঁজে পায়। তাঁর মতে এ স্তরে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবে। তাঁর ধারণা ব্যক্তির প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সামাজিক বিবর্তনের উল্লেখিত স্তরগুলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চলে। অগাস্ট কোঁৎ এই জ্ঞানের ধারা তত্ত্বের মাধ্যমে সমাজের বিবর্তনকে উপলব্ধি করেছেন। সামাজিক বিবর্তন বলতে তিনি সমাজের উন্নতি ও প্রগতিকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে সামাজিক উন্নতি তিনটি ক্রমিক ধাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা- বুদ্ধিগত উন্নতি (Intellectual Development), ভাবগত উন্নতি (Emotional Development) এবং কর্মগত উন্নতি (Activational Development)। অগাস্ট কোঁৎ এর মতে ভাবগত ও কর্মগত উন্নতি বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির উপর নির্ভরশীল। ত্রয়স্তর সম্পর্কিত আলোচনায় জ্ঞান বিকাশের সাথে সাথে সবার মনে স্বতন্ত্র বোধ জাগ্রত হয়েছে যা দ্বারা সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

দৃষ্টবাদ (Positivism)

Positive শব্দ থেকে Positivism প্রত্যয় এসেছে। Positive শব্দের অর্থ হচ্ছে বাস্তব (Real)। বাস্তব বলতে বুঝায় যা কিছু যৌক্তিক, পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই বলা হয় দৃষ্টবাদ বা Positivism হলো অভিজ্ঞতালব্ধ যেকোনো যৌক্তিক বিষয় সম্পর্কিত মতবাদ। সমাজের বিরাজমান বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা দূর করে শান্তিপূর্ণ এবং স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চিন্তায় কোঁৎ সদা তৎপর ছিলেন। তিনি মনে করতেন, দৃষ্টবাদ- এর মাধ্যমেই সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ফরাসী বিপ্লবোত্তরকালে ফ্রান্সের চিন্তাবিদদের মধ্যে দুটো ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি রক্ষণশীল ধারা– যা বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রগতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে। অপরটি প্রগতিশীল বা বৈপ্লবিক ধারা– যা সমাজ ব্যবস্থা ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষে। অগাস্ট কোঁৎ- এর দৃষ্টবাদে তাঁর রক্ষণশীল চিন্তা ও মনোভাবের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোঁৎ মনে করেন, মানব সমাজ পরিবর্তনের অপরিবর্তনীয় সূত্রটি আবিস্কার করে সমাজকে সুসংগঠিত এবং স্থিতিশীল করে প্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব। এটিই ছিল তার দৃষ্টবাদের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি জ্ঞানের নতুন শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান- এর প্রবর্তন করেন।

দৃষ্টবাদ সম্পর্কে কয়েকটি মৌল উপাদান চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হলো ক) কোঁৎ এর দৃষ্টবাদ কাল্পনিক নয় বরং বাস্তব ঘটনা বা প্রপঞ্চের সাথে সম্পর্কযুক্ত, খ) সকল জ্ঞান নয় বরং প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সাথেই এর সম্পর্ক, গ) দৃষ্টবাদ অস্পষ্ট জ্ঞান নয় বরং যথাযথ এবং সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দৃষ্টবাদ ধারণা তিনটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহলো জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ। অগাস্ট কোঁৎ দৃষ্টবাদকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। তা হলো-

(ক) বিজ্ঞানসমূহের দর্শন (Philosophy of Sciences) : মানুষ তার ভাগ্য উন্নয়নে প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল, এটাই হচ্ছে বিজ্ঞানসমূহের দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয়। একে দৃষ্টবাদী দর্শনও (Positive Philosophy) বলা হয়।

(খ) বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র (Scientific Religion and Ethics) **:** এতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উৎকর্ষতার মধ্য দিয়ে অধিকতর মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকার কথা বলা হয়েছে।

(গ) দৃষ্টবাদী রাজনীতি (Positive Politics)**:** যুদ্ধ বর্জন করে শান্তিপূর্ণ অবস্থা তৈরি করার রাজনীতিনই হলো দৃষ্টবাদী রাজনীতির মূল কথা।

দৃষ্টবাদের বক্তব্য হলো, ভালোবাসাই নীতি, শৃঙ্খলাই ভিত্তি এবং প্রগতিই উদ্দেশ্য। দৃষ্টিবাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে "অন্যের জন্য বাঁচো (Live for others)"। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দৃষ্টবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিজ্ঞানের সোপানক্রম (Hierarchy of Sciences)

অগাস্ট কোঁৎ এর বিজ্ঞানের সোপানক্রম তাঁর ত্রয়স্তরের সূত্রের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর মতে, বিভিন্ন বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয় বিভিন্ন রকম। যে বিজ্ঞান যতবেশি সরল ও সুস্পষ্ট সে বিজ্ঞান তত দ্রুত দৃষ্টবাদী স্তরে পৌছায়। প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে একটি ক্রম লক্ষ করা যায়। একটা সরল বিষয় থেকে জটিল বিষয় পর্যন্ত একই ক্রম পরিলক্ষিত হয়।

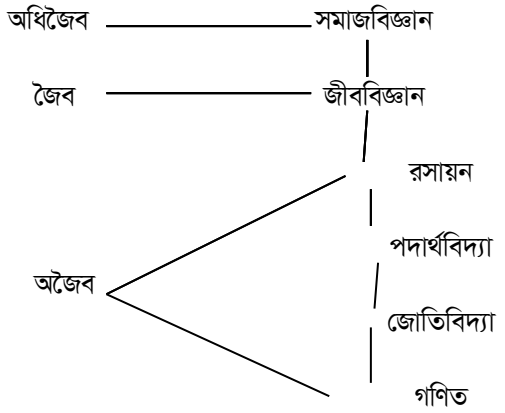

চিত্র ৩.১: বিজ্ঞানের সোপানক্রম

মানুষের মধ্যে প্রথম যে জ্ঞান আসে তা হলো গণিত। সঠিকতা নিরূপণের প্রথম ধাপ গণিত। মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম বিজ্ঞান জোতিবিদ্যা যা বিজ্ঞানের ফলিত দিক নির্দেশ করে। পদার্থবিদ্যায় পদার্থ জগত সম্পর্কে সূত্র আবিষ্কার করে। রসায়ন কোন পদার্থ কোন সূত্রের সাহায্যে একে অপরের সাথে মিলিত হচ্ছে তা নির্ণয় করে। একটি পৃথক শাখা হিসেবে জীববিজ্ঞান জীবনের উদ্ভব, বিকাশ, বিনাসের সূত্র আবিষ্কার করে। সমাজবিজ্ঞানের কাজ হলো সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিবর্তনের সূত্র নির্ণয় করে। অগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের সোপানক্রমে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। কারণ, অজৈব প্রাণহীণ বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করা যত সহজ তার চেয়ে জটিল হলো জৈব বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করা। অধিজৈব (Super organic) বিষয়ে অধ্যয়ন আরো বেশি জটিল। সমাজবিজ্ঞান মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে অধ্যয়ন করে। কোঁতের মতে, মানব সমাজ ও সংস্কৃতি অধিজৈব বিষয় এবং তা সদা পরিবর্তনশীল। ফলে সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করা অত্যন্ত জটিল। একারণে সমাজবিজ্ঞানকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞানকে তিনি সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	অগাস্ট কোঁতের তত্ত্বগুলো নিয়ে একটি ছক তৈরি করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

অগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে পরিচিত। সমাজ নিয়ে পৃথকভাবে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা তিনিই প্রথম অনুভব করেন। তাঁর ত্রয়স্তরের সূত্র যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ধারণা দেয় তেমনি দৃষ্টবাদ বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রদান করে। বিজ্ঞানের সোপানক্রমের মাধ্যমে তিনি সমাজবিজ্ঞানকে যৌক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় স্থান দেবার প্রচেষ্টা নেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তর কয়টি ধাপে বিভক্ত ?

(ক) দুই (খ) তিন

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। দৃষ্টবাদী রাজনীতির মূল লক্ষ্য কী?

(ক) ক্ষমতা দখল করা (খ) যুদ্ধ করা

(গ) যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ অবস্থা তৈরি করা (ঘ) অন্য রাষ্ট্র দখল করা

৩। অধিজৈব বলতে কী বুঝায়?

(ক) বুদ্ধিমান প্রাণি মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি (খ) প্রাণহীন সম্পর্কিত

(গ) প্রাণ আছে এমন সম্পর্কিত (ঘ) উভচর সম্পর্কিত

পাঠ-৩.৪ হার্বার্ট স্পেন্সার
Herbert Spencer

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- হার্বার্ট স্পেন্সারের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- স্পেন্সারের বিবর্তনবাদ আলোচনা করতে পারবেন এবং
- জীবদেহের সঙ্গে সমাজের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	হার্বার্ট স্পেন্সার, বিবর্তনবাদ, সরল সমাজ, জটিল সমাজ, জৈবিক সাদৃশ্যবাদ।

জীবন ও কর্ম

আঠারো শতকের নতুন চিন্তাবিদগণ সমাজ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের উদ্ভব ঘটান। বিবর্তনবাদী মতবাদের অনুসারীরা সমাজকে বিশ্লেষণ করেন জীব বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যার মূল প্রবক্তা হলেন হার্বার্ট স্পেন্সার। তিনি বিজ্ঞানের দুটি ভিন্নতর শাখা যথা জীববিদ্যার ও পদার্থবিদ্যার সূত্র গ্রহণ করে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করেন। সমাজ যে একটি ক্রমবিকাশমান বিষয় তা প্রমাণে সক্ষম হন। সমাজবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ প্রয়োগের বিষয়টিকে আরো মজবুত করেন।

হার্বার্ট স্পেন্সার ১৮২০ সালে ইংল্যান্ডের ডার্বি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। তবে তিনি তাঁর শিক্ষক পিতার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি রেলওয়ের চাকুরী শুরু করেন। ১৮৪১ সাথে নতুন রেলওয়ে স্থাপনের সময় কিছু ফসিলের (জীবদেহের দেহাবশেষ) সন্ধান পান যা তাকে ভূতত্ত্বের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। পরবর্তীতে তিনি মানব জাতির উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে আগ্রহী হন। তিনি সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করেন। স্পেন্সার বিশ্বজনীন বিবর্তনের তত্ত্বের মাধ্যমে (The Theory of Universal Evolution) সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেন।

হার্বার্ট স্পেন্সারের উল্লেযোগ্য রচনাবলি হলো Social Statics, First Principles, Principles of Biology, Princeples of Psychology, The Study of Sociology, Principles of Sociology, Synthetic Philosophy. হার্বার্ট স্পেন্সার ১৯০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

স্পেন্সারের বিবর্তনবাদ (Spencer's Evolutionism)

সাধারণভাবে বিবর্তন হলো সহজসরল অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে জটিল অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া। এখানে কোনো প্রকার শক্তি প্রয়োগ করতে হয় না। প্রকৃতিগতভাবেই এই পরিবর্তন ঘটে। কোসার (Coser) এর মতে, বিবর্তন হচ্ছে তুলনামূলকভাবে অনির্দিষ্ট হতে নির্দিষ্ট, অসংগতিপূর্ণ হতে সংগতিপূর্ণ এবং স্বাদশ্যপূর্ণ হতে বৈসাদৃশ্যে রূপান্তর (Evolution, that is a change from a state of relatively indifiinite, incoherent, homogeneity to a state of relatively definite, coherent, heterogeneity). স্পেন্সার সমাজ আলোচনায় শুধু বৈজ্ঞানিক বা ধর্মীয় চিন্তাধারার আওতায় আবদ্ধ থাকাকে সীমাবদ্ধতা বলেছেন। তাঁর ধারণা বিশ্বব্রহ্মান্ডে এমন অনেক ঘটনা বা বিষয় আছে যা সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ জন্য সমগ্র প্রপঞ্চকে দুই ভাগে ভাগ করেন। তা হলো জ্ঞেয় (Known) এবং অজ্ঞেয় (Unknown)। বিশ্বপ্রভু সম্পর্কিত রহস্যের পাশাপাশি তার মনে বস্তুর উদ্ভব, অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে। সকল প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে তিনি ক্রমেই অজ্ঞেয় দর্শনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। এক সময় তিনি ব্যস্ত হন সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাসের প্রক্রিয়া অনুসন্ধানে। সকল প্রাণি সমসাদৃশ্যমূলক অবস্থা থেকে বৈসাদৃশ্যের দিকে অগ্রসরমান হয়। বায়ারের এই তত্ত্ব স্পেনসারের চিন্তার জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তিনি বায়ারের এই তত্ত্বকে সমাজ বিবর্তনের আলোচনায় নিবিষ্ট হন।

হার্বার্ট স্পেন্সার সামাজিক বিবর্তনতত্ত্ব অতিজৈব (Super Organic) ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করেন। তাঁর মতে সমাজ অজৈব (Inorganic) থেকে অতিজৈব (Super Organic) এ পৌঁছেছে এবং এক একটি স্তরে লক্ষ লক্ষ বছর কেটেছে। অজৈব (Inorganic) স্তর হলো যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব নেই। জৈব (Organic) স্তর হলো যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। আর অধিজৈব (Super Organic) স্তর হল বুদ্ধিমান প্রাণি মানুষের সৃষ্ট সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নত রূপ। হার্বার্ট স্পেন্সার বিশ্বজনীন বিবর্তনের ধারাকে প্রবিষ্ট করেছেন সমাজ বিবর্তনে গতিরেখা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে। তাঁর মতে বিবর্তন প্রক্রিয়া সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট কতকগুলো ধাপ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে, পরিধির বিস্তার (Greater Size), সংঘবদ্ধতা (Coherence), সুনির্দিষ্টতা (Definiteness) এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Interdependence)। হার্বার্ট স্পেন্সার সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে দুইটি পর্যায় লক্ষ করেন। তা হলো (ক) সহজ-সরল সমাজ থেকে মিশ্র সমাজে গমন এবং (খ) যোদ্ধা সমাজ (Militant Society) থেকে শিল্পসমাজে (Industrial Society) পবির্তন। সরল সমাজ থেকে মিশ্র সমাজে গমন (The Movement from simple to compound) অনুধাবনের জন্য তিনি চার ধরনের সমাজের কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, কীভাবে সমাজ সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। সমাজগুলো হলো:

(১) সরল সমাজ (Simple society),
(২) জটিল বা মিশ্র সমাজ (Compound society),
(৩) দ্বিগুণ জটিল সমাজ (Double Compound society) এবং
(৪) ত্রিগুণ জটিল সমাজ (Treble Compound Society)।

(১) **সরল সমাজ:** এ ধরনের সমাজ ক্ষুদ্র, যাযাবর এবং এখানে স্থায়ী সম্পর্কের অভাব বিদ্যমান। তাদের মধ্যে খুব সামান্য ভিন্নতা, বিশেষীকরণ এবং পূর্ণতা ছিল। এস্কিমো, ফুজিয়ান, পাপুয়ানিউগিনির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এধরনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।
(২) **মিশ্র সমাজ:** এ ধরনের সমাজ কৃষি নির্ভর এবং মোটামুটি স্থায়ী। অধিকাংশই পশুচারণের উপর নির্ভরশীল। এখানে বিভিন্ন শ্রেণি দেখা যায় তবে তা পুরোহিত প্রধান, শিল্পকাঠামোর বিকাশ ঘটে যা উন্নত শ্রমবিভাজন নির্দেশ করে। উদাহরণ হিসেবে পঞ্চম শতকের টিউটনিক জনগণ (The Teutonic Peoples), হোমারিক গ্রিক জনগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য।
(৩) **দ্বিগুণ মিশ্রসমাজ:** এ ধরনের সমাজ সম্পূর্ণরূপে স্থায়ী। বৃহৎ ও পরিপূর্ণ এ সমাজে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাঠামো, কমবেশি জাতি-প্রথা, জটিল শ্রমবিভাজন এবং সর্বোপরি জ্ঞান ও শিল্পের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসেবে ত্রয়োদশ শতকের ফ্রান্স, একাদশ শতকের ইংল্যান্ড- এর সমাজ এরূপ বৈশিষ্ট ধারণ করে।
(৪) **ত্রিগুণ মিশ্র সমাজ:** এ ধরনের সমাজ আধুনিক সভ্য জাতির পরিচায়ক যেখানে অতিমাত্রায় বিশেষীকরণ (Specialization) শ্রমবিভাজন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়।

হার্বার্ট স্পেন্সার উল্লিখিত সমাজগুলোর মধ্য দিয়ে সমাজের পরিধির বিস্তার, জটিলতা, জটিল শ্রমবিভাজন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, সংস্কৃতি এবং সাধারণ সাংস্কৃতিক জটিলতার বিষয়কেই স্পষ্ট করেছেন যার দ্বারা বিবর্তন প্রক্রিয়ার সহজ সরল সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে জটিল সমাজের রূপ পরিগ্রহ করে।

স্পেন্সার যোদ্ধা সমাজ (Militant Society) থেকে শিল্প সমাজে (Industrial Society) পরিবর্তনে উভয় সমাজের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। যোদ্ধা সমাজে প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধ ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে যুদ্ধ হয় গোষ্ঠী বা সমাজের বিরুদ্ধে। খাদ্য ও আবাস্থলের প্রয়োজনীয়তা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা সংগ্রামকে অনিবার্য করে তুলেছিল। তাই বলা হয়, সমাজ বিকাশের প্রথম পর্যায় ছিল মূলত যোদ্ধা সমাজ। সরল এ যোদ্ধা সমাজ থেকেই ক্রমান্বয়ে শিল্প সমাজের উদ্ভব হয়। মূলত সরল সমাজ হতে জটিল সমাজে উত্তরণ হচ্ছে সমসত্ত্ব থেকে অসমসত্ত্বে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া। হার্বার্ট স্পেন্সার মনে করেন, সামাজিক বিবর্তনে বস্তু, গতি ও শক্তি এই তিনটি সূত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট অনুসিদ্ধান্তসমূহের উপস্থিতি রয়েছে।

জৈবিক সাদৃশ্যবাদ (Organic Solidarity)

হার্বার্ট স্পেন্সার সমাজের বিবর্তনকে জীব জগতের বিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি মানব সমাজকে একটি সচেতন সত্ত্বা রূপে বিবেচনা করছেন। তাঁর মতে উদ্ভব, বিকাশ, পরিপূর্ণতা এবং কর্মপদ্ধতি সকল ক্ষেত্রেই জীবদেহের সঙ্গে সমাজের মিল রয়েছে। জীবদেহ ও সমাজের মধ্যকার সাদৃশ্য বিশ্লেষণই হলো তাঁর 'জৈবিক সাদৃশ্যবাদ'। স্পেনসারের মতে জীবজগতের উন্মেষ ঘটে এককোষী অ্যামিবা হতে। বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে এসে তা রূপ নেয় বহুকোষী জীব হিসেবে। অনুরূপভাবে উদ্ভরের সময় সমাজ ছিল সরল ও অনির্দিষ্ট। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সরল যোদ্ধা সমাজ জটিল শিল্প সমাজে পরিণত হয়েছে। স্পেন্সার জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে যে সব সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন সেগুলো হচ্ছে:

(১) **অজৈব সত্ত্বা থেকে পৃথক:** জীবদেহ ও সমাজ উভয়ই অজৈব সত্ত্বা হতে পৃথক;
(২) **কাঠামোগত জটিলতা:** সমাজ ও জীবদেহের আকারগত সম্প্রসারণের সাথে সাথে তাদের কাঠামোগত জটিলতার বৃদ্ধি পায়;
(৩) **কাঠামোগত পৃথকীকরণ:** সমাজ ও জীবদেহের ক্ষেত্রে কাঠামোগত পৃথকীকরণ তাদের ক্রিয়াগত পার্থক্য তৈরি করে;
(৪) **ধ্বংস ও টিকে থাকা:** সমাজ ও জীবদেহ উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য, কিন্তু তাদের এককসমূহ টিকে থাকে।
হার্বার্ট স্পেনসারের মতে জীবদেহ ও সমাজ উভয়ই একটি বিশেষ ব্যবস্থায় (System) পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থায় সমাজ এবং জীবদেহের নিজস্ব কিছু উপাদান সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিষয়টিকে নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল:

ব্যবস্থা	জীবদেহ	সমাজ
নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা	মস্তিষ্ক	আইন, ধর্ম, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রভৃতি
পরিপোষণ ও পুষ্টিসাধনমূলক ব্যবস্থা	হরমোন, পৌষ্টিকনালী, পৌষ্টিক গ্রন্থি	উৎপাদন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি
বিতরণমূলক ব্যবস্থা	হৃদপিন্ড	অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, শ্রমবিভাগ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্পেন্সারের বিবর্তনমূলক সমাজের ধাপগুলো লিখুন	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

হার্বার্ট স্পেন্সার জীববিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করে সমাজ বিবর্তনবাদ তত্ত্বের ধারণা দেন। সমাজকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। জৈবিক সাদৃশ্যবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে কাঠামোগত ক্রিয়াবাদের ধারণা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। তিনি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সমাজবন্ধন ও ঐক্যের মূল সূত্র বলে উল্লেখ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Survival of the fittest' ধারণাটি কে প্রদান করেন ?
(ক) স্পেন্সার (খ) ডারউইন
(গ) ওয়েবার (ঘ) নিউটন

২। বিবর্তন বলতে কী বুঝায়?
(ক) সহজ-সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় রূপান্তর
(খ) জটিল অবস্থা থেকে সহজ-সরল অবস্থায় রূপান্তর
(গ) ধীর গতি থেকে দ্রুত গতি
(ঘ) দ্রুত গতি থেকে ধীর গতি

পাঠ-৩.৫ এমিল ডুর্খেইম
Emile Durkheim

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- এমিল ডুর্খেইমের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সামাজিক ঘটনার তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন
- ডুর্খেইমের আত্মহত্যা তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- সমাজে শ্রমবিভাজনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- ডুর্খেইমের ধর্ম বিষয়ক তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	এমিল ডুর্খেইম, সামাজিক ঘটনা, আত্মহত্যা, শ্রমবিভাজন, ধর্ম।

জীবন ও কর্ম

সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় সমাজবিজ্ঞানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলো এমিল ডুর্খেইম। তিনিই প্রথম সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা, পর্যালোচনা ও আলোচনার সূত্রপাত ঘটান যার মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে পঠন-পাঠনে অগ্রহী হন। হার্বার্ট স্পেন্সার ব্যক্তিকে সমাজ বিশ্লেষণের একক হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু ডুর্খেইম সমাজ-সংগঠনকেই একক ধরে সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজ গঠিত হলেও সমাজই ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে।

ডুর্খেইম ১৮৫৮ সালে ফ্রান্সের লোরিন প্রদেশে এক ধর্মযাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিসের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দর্শন, সাহিত্যে শিক্ষা লাভের পর তিনি সমাজবিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাঁর সমাজ সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা বিভিন্ন গ্রন্থে মাধ্যমে প্রকাশ করেন। ডুর্খেইম রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে *The Division of Labor in Society, The Rules of Sociological Method, Suicide, Sociology and Philosophy, The Elementary forms of Religious life* উল্লেখযোগ্য। ১৯০২ সালে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সামাজিক ঘটনা, আত্মহত্যা, শ্রমবিভাজন, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করেছেন। ১৯১৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সামাজিক ঘটনা (Social Fact)

ডুর্খেইমের সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো সামাজিক ঘটনা। তাঁর মতে 'সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক ঘটনাসমূহের বিজ্ঞান'। সমাজবিজ্ঞানের কাজ হলো সামাজিক ঘটনাসমূহ অধ্যয়ন করা। সামাজিক ঘটনা বলতে কোনো জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, প্রবণতা, রীতিনীতি প্রভৃতিকে বুঝায়। তবে সমাজে যা কিছু আছে তার সবই সামাজিক ঘটনা নয়। এ জন্য তিনি দুটি বিষয় গুরুতপূর্ণ। প্রথমত: যাকে সামাজিক ঘটনা বলা হবে তা ব্যক্তির উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারবে। দ্বিতীয়ত: যাকে ঘটনা বলা হবে তা সমাজ বা গোষ্ঠীতে বিস্তার লাভ করতে পারবে। সামাজিক ঘটনা সম্পর্ক ধনাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (Negative) ধারণা আছে। তবে ঋণাত্মক ধারণা সামাজিক ঘটনা নয়। যেমন কারও ব্যক্তিগত ঘটনা সামাজিক ঘটনা নয়। কারণ, তা অন্যের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে না এবং সমাজই এর বিস্তৃতিও ঘটে না। আবার অনুকরণ বা ফ্যাশন সামাজিক ঘটনা নয়। কারণ এগুলোর জন্য অন্যকে বাধ্য করা যায় না। তবে তিনি বলেছেন ধনাত্মক ধারণা সামাজিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামাজিক ঘটনা বলেছেন। যেমন- পরীক্ষার হল, শ্রেণিকক্ষ এগুলোর নিয়ম কানুন না পালন করলে তাকে শাস্তি পেতে হয় যা অন্যের উপর চাপ প্রয়োগ করে। তদুপরি এগুলো পালন করা প্রয়োজন তা সমাজের অপরাপর সবাই জানতে ও পালন করতে আগ্রহী হয় যা বিস্তৃতি ঘটায়। ডুর্খেইমের মতে সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ব্যক্তি থেকে নয় গোষ্ঠী থেকে শুরু করতে হবে। কারণ গোষ্ঠী ব্যক্তির আগে। ব্যক্তি যে ব্যক্তি তা গোষ্ঠীরই সৃষ্টি যা শুরু করতে হবে পরিবার থেকেই। তিনি বলেন সামাজিক ঘটনা অবশ্যই বাহির থেকে অধ্যয়ন করতে

হবে। তিনি সামাজিক ঘটনাকে প্রকৃত বস্তু হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বস্তু হিসেবে দেখতে হবে। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কোনো অস্পষ্ট বিষয় সমাজবিজ্ঞানে অধ্যয়ন করা যাবে না। বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণযোগ্য হতে হবে। এজন্যই সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনায় তাঁর অবদান অনেকের চেয়ে বেশি।

আত্মহত্যা (Suicide)

এমিল ডুর্খেইমের মতে আত্মহত্যা একটি সামাজিক ঘটনা। তিনি সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক সচেতনতার সাথে আত্মহত্যা সম্পর্ক নিরূপণ করেছেন। অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি আত্মহত্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তাঁর Suicide গ্রন্থে আত্মহত্যার জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক কারণসমূহকে যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে সামাজিক কারণসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন। তিনি আত্মহত্যাকে সামাজিক সংহতির সাথে সম্পর্কিত করেন। তিনি মূলত: অন্যের যুক্তি খন্ডন করেন তারপর আলোচ্য বিষয়ে নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আত্মহত্যাকে শ্রমবিভাজনের নেতিবাচক দিক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন যা সামাজিক সংহতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আত্মহত্যা প্রসঙ্গে এ্যারোন বলেন, আত্মহত্যা হলো আত্মহত্যাকারী কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচ ঘটনা যা মৃত্যু ঘটায়। (Suicide is every case of death resultiry directly or indirectly from a positive or negative act performed by the victim himself and which strives to produce this result)। তাই বলা যায় আত্মহনন করা তথা নিজের জীবন নিজের দ্বারা নিঃশেষ হওয়া হলো আত্মহত্যা। আত্মহত্যা প্রসঙ্গে ডুর্খেইম বলেন, যারা সমাজের সাথে অতিমাত্রায় সম্পৃক্ত তারা আত্মহত্যা করে। আবার যারা সমাজ থেকে অতিমাত্রায় বিচ্ছিন্ন তারাও আত্মহত্যা করে। একারণে বিভিন্ন ধরনের আত্মহত্যার ধারণা তিনি দেন। তিনি প্রধানত তিন ধরনের আত্মহত্যার উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল:

(১) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (Egoistic Suicide),
(২) পরার্থপর আত্মহত্যা (Altruistic Suicide) এবং
(৩) নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা (Anomic Suicide)।

(১) **আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা:** সমাজ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংহতির অভাব দেখা দিলে এ ধরণের আত্মহত্যা ঘটে। সমাজ থেকে ব্যক্তি যখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে তখন এ ধরনের আত্মহত্যা ঘটে। সচরাচর যে সকল সমাজে সামাজিক সংহতি কম থাকে সে সকল সমাজে আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি হয়। ডুর্খেইম পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখান যে, বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিতদের মধ্যে, মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে, গ্রামবাসীদের চেয়ে নগরবাসীদের মধ্যে এ ধরনের আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি।

(২) **পরার্থপর আত্মহত্যা:** আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার বিপরীত ধারণা হলো পরার্থপর আত্মহত্যা। কারণ ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের অতিমাত্রায় সংহতির কারণে এ ধরণের আত্মহত্যা দেখা যায়। এ ধরনের আত্মহত্যায় ব্যক্তি নিজের জীবনকে প্রয়োজনের কাছে তুচ্ছ মনে করে। ফলে সমাজ তথা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে মৃত্যু জেনেও কাজ করতে গিয়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। সাধারণত যেকোনো দেশের স্বাধীনতা বা স্বাধীকার আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করে। আবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকগণ জীবন দান করেন, যা ঐ সমাজের সঙ্গে অতিমাত্রায় সংহতিকেই প্রকাশ করে।

(৩) **নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা:** যখন সমাজে ব্যক্তির উপর মূল্যবোধের প্রভাব হারিয়ে ফেলে তখন তাকে নৈরাজ্যমূলক অবস্থা বলে। এ ধরনের পরিস্থিতি হলে ব্যক্তি তার নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণ করে যা সামাজিকভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে বা কারণে অনেকে আত্মহত্যা করে। এ রকম পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা করাকেই নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা বলে। সাধারণত যেকোনো বিপ্লব বা দুর্যোগের পর এ ধরণের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যেমন ফরাসী বিপ্লব পরবর্তী সময়ের ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থা, যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর এ ধরনের অবস্থা তৈরি হতে পারে।

এ ছাড়া তিনি আরো এক ধরনের আত্মহত্যার কথা বলেন, তা হলো নিয়তিবাদী আত্মহত্যা (Fatalistic Suicide)। এ ধরনের আত্মহত্যর ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুনের অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ হয়ে থাকে। নিয়ম-কানুনের অতি কড়াকড়িতে মানুষের জীবন যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং নিজের জীবন হনন করে তখন তাকে নিয়তবাদী আত্মহত্যা বলে। যেমন দাস সমাজে দাসগণ অতিরিক্ত অত্যাচার নিপীড়নে আত্মহত্যা করে। অতিরিক্ত শাসনে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে।

ডুর্খেইমের আত্মহত্যা সম্পর্কিত আলোচনায় সংহতি (Integration) এবং নিয়ন্ত্রণের (Regulation) বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এর মাধ্যমে আত্মহত্যার শ্রেণিকরণ নির্ধারিত হয়। বিষয়টি নিম্নের সারণিতে তুলে ধরা হল:

বন্ধনের ধরন	মাত্রা	আত্মহত্যার ধরন
সংহতি	নিম্ন	আত্মকেন্দ্রিক
	উচ্চ	পরার্থপর
নিয়ন্ত্রণ	নিম্ন	নৈরাজ্যমূলক
	উচ্চ	নিয়তবাদী

শ্রমবিভাজন (The Division of Labor)

শ্রমবিভাজন একটি প্রাচীন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এটা প্রথম ব্যবহার করেন এ্যাডাম স্মিথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Inquary into the Nature and Causes of the Wealth of Nation এ। তিনি অর্থনীতিতে প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন কর্ম-প্রক্রিয়া (Work Process) হিসেবে। এমিল ডুর্খেইম তাঁর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অত্যন্ত সফলভাবে শ্রমবিভাজন প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন। শ্রমবিভাজনকে তিনি দেখেছেন সামাজিক ঘটনা হিসেবে। তিনি তাঁর *The Division of Labor in Society* গ্রন্থে শ্রমবিভাজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে সমাজের সংহতি (Solidarity) নির্ধারিত হয়। শ্রমবিভাজনের দিক থেকে সামাজিক সংহতিকে তিনি দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

(১) যান্ত্রিক সংহতি (Mechanical Solidarity) এবং

(২) জৈবিক সংহতি (Organic Solidarity)।

(১) যান্ত্রিক সংহতি: আদিম সমাজের মানুষের মধ্যে বয়স, লৈঙ্গিক পার্থক্য থাকলেও কাজের পার্থক্য খুব বেশি ছিল না। তাদের মধ্যে চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধে সাদৃশ্য ছিল। এ সমাজকে ডুর্খেইম যন্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন। এ সমাজে শ্রমবিভাজন না থাকায় পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিল। একটি ইঞ্জিন যেমন বিভিন্ন যন্ত্রের সমন্বয় ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি এ সমাজের সদস্যরাও বিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারত না। ডুর্খেইমের মতে আদিম সমাজের মানুষ দুটো কারণে ঐক্যবদ্ধ হতো। তা হলো যৌথ প্রতিরূপ (Collective Conscience) এবং দমনমূলক আইন (Repressive Law)। এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় যান্ত্রিক সংহতি লক্ষ করা যায়।

(২) জৈবিক সংহতি: জৈবিক সংহতি হলো বৈসাদৃশ্যের ঐক্যমত। এখানে সদস্যের মধ্যে চিন্তায়, আচরণে এবং মূল্যবোধে তেমন সাদৃশ্য থাকে না। এ ধরনের সমাজব্যবস্থা জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কারণ জীদেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে যার কোনো একটি বিকল হলেও জীব সচল থাকে, অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে। জৈবিক সংহতিমূলক সমাজব্যবস্থায় কোনো একটি অংশ বা প্রতিষ্ঠান দুর্বল বা অকার্যকর হলেও সমাজ পুরোপুরি থেমে থাকে না। পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই শক্তির মূল উৎস। জৈবিক সংহতি সম্পন্ন সমাজ বলতে ডুর্খেইম শিল্পায়িত আধুনিক সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন। যেখানে অধিক মাত্রায় বিশেষীকরণ পরিলক্ষিত হয়। জৈবিক সংহতিতে যে ধরনের আইন মেনে চলা হয় তা হলো প্রতিরোধমূলক আইন (Restitutive Law). যান্ত্রিক সংহতি হতে জৈবিক সংহতিতে উত্তরণের পিছনে যেসব উপাদান দায়ী বলে ডুর্খেইম মনে করেছেন তা হলো জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নৈতিকতার উন্নতি, জ্ঞানের বিস্তার বা উন্নয়ন, নগরের বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশেষীকরণ প্রভৃতি।

ডুর্খেইমের ধর্ম বিষয়ক মতবাদ (Durkheim's Religious theory)

ডুর্খেইমের অন্যতম রচনা হলো *The Elementary forms of Religious Life*। তিনি ধর্মকে একটি সামাজিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার আচরণ প্রথমত সমাজ বা গোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়। সমাজ সংগঠনই ধর্মীয় উদ্ভবের মূল উৎস। ডুর্খেইম ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্বে তথা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে আদিম সমাজ সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার অরুনটা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস পরীক্ষা করেন। তিনি ই.বি. টেইলরের সর্বপ্রাণবাদ (animism) এবং ম্যাক্স মুলারের প্রকৃতিবাদ (naturalism) সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করে তা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন। তাঁর মতে, এগুলো ধর্মের পবিত্র ও অলংঘনীয় (sacred) এবং পার্থিব তথা সমালোচনামূলক আদর্শ (profance) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম নয়। বস্তুর ধারণা, বিশ্বাস এবং আচার আচরণের সমন্বয়ে পবিত্র ও অলংঘনীয় (sacred) গঠিত। এ ধরনের বিশ্বাস, আচার আচরণের সম্পর্ক ধর্মের উদ্ভব ঘটায়। অন্যদিকে সকল ধর্মের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো পার্থিব জগতকে নগণ্য মনে করা।

ডুর্খেইমের মতে ধর্মের কাজ যদি শুধু আচার পালন করা হতো তবে পৃথিবীতে এতদিন ধর্ম টিকে থাকতে পারত না। ধর্মের আরো কিছু মর্মকথা আছে। ধর্মের মর্মকথা বুঝতে হলে আদিম সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস পর্যালোচনা করতে হবে। তিনি ধর্মের

উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে টোটেমবাদের কথা বলেছেন। টোটেম বলতে বুঝায় এক ধরনের বিশ্বাস কিংবা প্রথা ও আচার অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে কোনো কোনো বিশেষ প্রাণি বা গাছ পালার সঙ্গে একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে। তিনি টোটেমবাদ পর্যালোচনা করে বলেন, দলবদ্ধ জীবনই ধর্মের উৎপত্তির যথার্থ কারণ। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান ঐ জীবনেরই প্রতীক মাত্র। ধর্মের আসল কাজ হলো সমাজে সংহতি সৃষ্টি এবং তা রক্ষা করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক সংহতির সাথে আত্মহত্যার সম্পর্ক চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সার-সংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা হচ্ছেন এমিল ডুর্খেইম। তাঁর বহুমুখী তত্ত্ব ও গবেষণাকে কেবল সমাজবিজ্ঞানকেই সমৃদ্ধ করেনি, সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সামাজিকক ঘটনা, শ্রমবিভাজন, সামাজিক সংহতি, আত্মহত্যা এবং ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এ মনীষীকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা দান করেছে। সামাজিক ঘটনা বলতে কোনো জনগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনা, প্রবণতা, রীতিনীতি প্রভৃতিকে বুঝায়। তাঁর মতে সমাজের সংহতি (Solidarity) কী ধরনের হবে তা নির্ধারিত হয় শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে। আবার আত্মহত্যার সাথেও তিনি সামাজিক সংহতির সম্পর্ক দেখিয়েছেন। ডুর্খেইমের মতে ধর্মের কাজ শুধু আচার-আচরণ পালন করা নয়, ধর্মের আরো কিছু মর্মকথা আছে। ধর্মের উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে তিন টোটেমবাদের কথা বলেছেন। তাছাড়া পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ধারণার মাধ্যমেও তিনি ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি এমিল ডুর্খেইম রচিত গ্রন্থ?

(ক) Positive Philosophy (খ) Suicide

(গ) Economy and Society (ঘ) Principles of Sociology

২। সামাজিক সংহতির অভাব হলে কোন ধরনের আত্মহত্যা হয়?

(ক) আত্মকেন্দ্রিক (খ) পরার্থপর

(গ) নৈরাজ্যমূলক (ঘ) নিয়তবাদী

৩। এমিল ডুর্খেইমের ধর্ম সম্পর্কীয় আলোচনায় কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে?

(ক) পাপুয়া নিউগিনি (খ) টোডা

(গ) অরুনটা (ঘ) এস্কিমো

পাঠ-৩.৬ কার্ল মার্কস
Karl Marx

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কার্ল মার্কসের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- উৎপাদন পদ্ধতি ও শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- শ্রমের বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কার্ল মার্কস, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রেণি সংগ্রাম, উদ্বৃত্ত মূল্য, বিচ্ছিন্নতাবোধ।

কার্ল মাকর্সের জীবন ও কর্ম

কার্ল মার্কস ১৮১৮ সালে জার্মানীর ট্রায়ার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৮৪১ সালে জেনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত প্যারিসে তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদগণের সাথে পরিচিত হন। কার্ল মার্কস তাঁর প্রিয় বন্ধু এঙ্গেলস্ এর সাথে দীর্ঘ ৪০ বছরকাল অতিবাহিত করেন। ১৮৮৩ সালে তিনি মারা যান। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলি হলো The German Ideology, The Communist Manifesto, A Contribution to the Critique of Political Economy, Das Capital প্রভৃতি। কার্ল মার্কস হেগেলের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করলেও ভাববাদের পরিবর্তে বস্তুবাদের চর্চা করেন। মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রেণি সংগ্রাম, বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রভৃতি তত্ত্ব প্রদানের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

কার্ল মার্কসের গুরু ছিলেন হেগেল। হেগেল ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক (Idealistic Philosopher)। ভাববাদে বিশ্বাস করা হয় যে, বস্তু মূখ্য নয় বরং তার সম্পর্কে যে ভাবধারা সৃষ্টি হয় সেটাই মুখ্য। হেগেলের সঙ্গে মার্কসের এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। কারণ মার্কস ছিলেন বস্তুবাদী। তাঁর কাছে বস্তুই মুখ্য। তিনি মনে করেন বস্তুই প্রথম, বস্তুকে কেন্দ্র করেই ভাবের সৃষ্টি। বিংশ শতাব্দীতে সমাজ ভাবনা মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনা দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাধ্যমে সমাজ বিশ্লেষণের নতুন দিগন্ত তৈরি হয়।

কার্ল মার্কস সমাজকে বস্তু হিসেবে গণ্য করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) বলে। অন্যদিকে সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিক বিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তিনি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। মার্কসের সমাজ বিশ্লেষণের এ মতবাদকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) বলে অভিহিত করা হয়। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে দুই পক্ষের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সবসময় দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। এ দ্বন্দ্ব দুই প্রকারের হতে পারে। যথা: (ক) ইতিবাচক (Positive) দ্বন্দ্ব এবং (খ) নেতিবাচক (Negative) দ্বন্দ্ব। ইতিবাচক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে জগৎ সত্ত্বার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করা হয়। আর নেতিবাচক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মতবাদ খন্ডন করা হয়।

কার্ল মার্কস হেগেলের নিকট থেকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি তা গ্রহণ করেন। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপরীতমুখী দু'টি শক্তি থাকে। এর একটি ইতিবাচক (Thesis) এবং অন্যটি নেতিবাচক (Anti-thesis) শক্তি। উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়ে একসময় নতুন শক্তি বা ব্যবস্থার (Synthesis) উদ্ভব ঘটে। এটা থেমে থাকে না বরং অব্যাহত থাকে। এভাবেই নতুন নতুন সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:

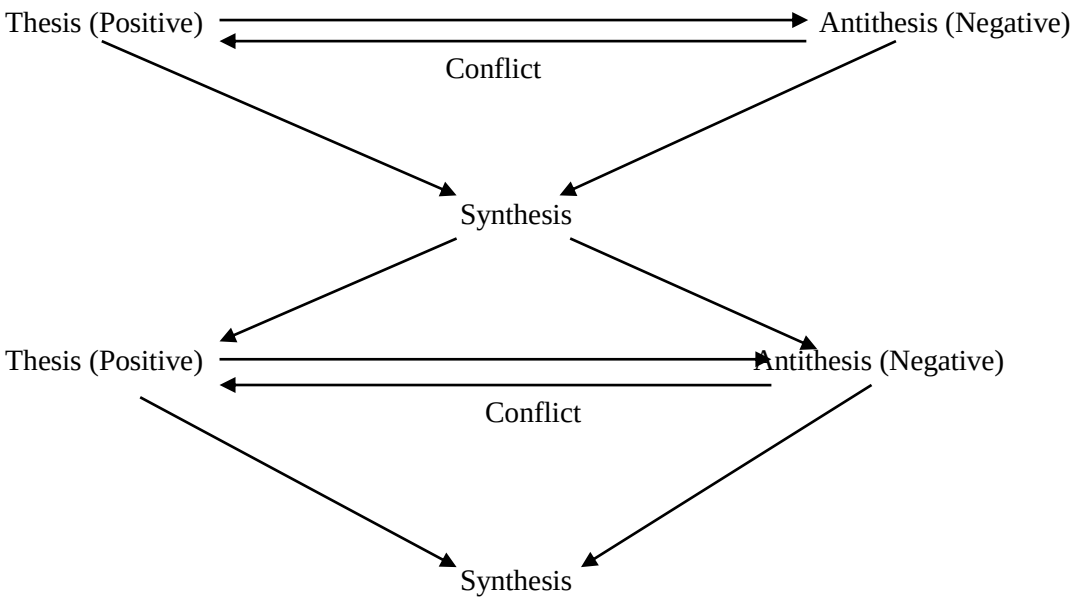

চিত্র ৩.২: শ্রেণি-দ্বন্দ্ব ও নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা

কার্ল মার্কসের মতে, সমাজ একটি বস্তু। বস্তুর মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলেই বস্তু বিকশিত হয়। তেমনি সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রেও বস্তুবাদী দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল। সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পরিবর্তন, বিবর্তন এসবের পেছনে কোন কারণ বা সূত্র কাজ করে তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদে জানা সম্ভব। তাই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সমাজ বিকাশের সূত্র আবিষ্কারের প্রক্রিয়াকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) বলে। বস্তুর কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সমাজ বিকাশেও লক্ষ করা যায়। যেমন:

প্রথমত : বস্তু কখনো স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করতে পারে না, এরা পরস্পর নির্ভরশীল;
দ্বিতীয়ত : সব বস্তুই গতিশীল, কোনটা দেখা যায়, কোনটা দেখা যায় না;
তৃতীয়ত : সব বস্তুই উর্ধ্বমুখী এবং ক্রমান্বয়ে বিকাশমান;
চতুর্থত : পরস্পর বিরোধী দ্বিবিধ শক্তি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই রয়েছে, এ জন্য বস্তু পরিবর্তিত হয়;
পঞ্চমত : বস্তু প্রতিনিয়ত উৎকর্ষের দিকে এবং পরিমাণগত থেকে গুণগত দিকে পরিবর্তিত হয়;
ষষ্ঠত : বস্তুর অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভরশীল নয় বরং মনের অস্তিত্ব বস্তুর উপর নির্ভরশীল।

বস্তুর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ সমাজের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, সামাজিক পরিবর্তন বা রাজনৈতিক বিপ্লব কখনো মানুষের ধীশক্তিপ্রসুত দর্শন দ্বারা সংঘটিত হয় না। সামাজিক পরিবর্তনের মূলে রয়েছে উৎপাদন পদ্ধতি এবং এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এ শক্তি দ্বারাই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, চিন্তা জগৎ সবকিছু নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়।

উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production)

সাধারণভাবে উৎপাদন পদ্ধতি হচ্ছে উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদন শক্তিসমূহের সন্ধিযুক্ত (articulated) সম্মিলন, যার মধ্যে উৎপাদন সম্পর্ক প্রধান। উৎপাদন সম্পর্ক হচ্ছে উদ্বৃত্ত শ্রম সুনির্দিষ্টভাবে উপযোজনের এবং তার সাথে সঙ্গতি রেখে উৎপাদনের যে সুনির্দিষ্ট বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার পতিফলন। মার্কসের মতে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সংঘাতের ফলে বিপ্লবের সৃষ্টি হয় এবং সমাজ পরিবর্তিত হয়। উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে প্রথম দিকে যে ভারসাম্যতা দেখা যায় পরবর্তীতে তা বজায় থাকে না। ফলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। উৎপাদন পদ্ধতি হলো সমাজের মৌল কাঠামো (Basic Structure) যা সমাজের উপরি কাঠামোকে (Super Structure) প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি পাঁচ ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির ধারণা প্রদান করেন:

(১) আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production of Primitive Communism)
(২) দাস উৎপাদন পদ্ধতি (The Slave Mode of Production)

(৩) সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (The Feudal Mode of Production)
(৪) পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (The Capitalist Mode of Production)
(৫) সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি (The Socialistic Mode of Production)

(১) **আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন পদ্ধতি :** আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার উৎপাদন শক্তি তথা উৎপাদনের উপকরণ ধীর গতিসম্পন্ন হলেও ক্রমান্বয়ে তার অগ্রগতি সাধিত হয়। হাতিয়ারের উন্নতি সাধিত হয়। উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে কাঠ, পাথরের অস্ত্র, তীর-ধনুক উল্লেখযোগ্য। আর উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সমতাভিত্তিক ভারসাম্যের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কারণ সে সময় জটিল শ্রমবিভাজন ছিল না। সবাই সবাইকে সহযোগিতা করত। পরবর্তীতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কৃষির বিকাশ, সমাজে স্তরভেদ তৈরির মাধ্যমে শোষণ প্রক্রিয়া শুরু হতে থাকে। উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়ে নতুন ব্যবস্থার তথা শ্রেণি শোষণমূলক ব্যবস্থা তথা দাস ও দাসমালিকের উদ্ভব হয়।

(২) **দাস উৎপাদন পদ্ধতি :** আদিম সমাজের তুলনায় দাস সমাজ ব্যাবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ আরো বেশি উন্নত হয়। উৎপাদন শক্তির উন্নতির ফলে উৎপাদনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এ সময়ে উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে কাঠের লাঙ্গল ব্যবহারে দাসদের দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। অপর পক্ষে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে ছিল দাস আর দাসমালিক। দাসভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতিতে দাসদের কোনো অধিকার ছিল না। তাদের জীবন ধারণের জন্য নূন্যতম যা প্রয়োজন কেবলমাত্র তাই পেত। দাসরা অন্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হতো। তারা শোষণ নির্যাতনের শিকার হতো। অধিকার বঞ্চিত ও শোষণ নির্যাতনের কারণে উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। পরবর্তীতে দাস বিদ্রোহের মাধ্যমে দাস উৎপাদন ব্যবস্থার পতন হয়; যার ফলে গড়ে ওঠে সামন্ততন্ত্র ব্যবস্থা।

(৩) **সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতি :** সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদনের উপকরণ ছিল ভূমি, মানব শ্রম, গরু ঘোড়ার লাঙ্গল প্রভৃতি। উৎপাদন সম্পর্ক ছিল সামন্ত প্রভু এবং ভূমিদাস। ভূমিদাসগণ দাসদের চেয়ে কিছুটা বেশি অধিকার ভোগ করত। তারা ভূমির সঙ্গে বাধা ছিল। তবে দাস সমাজের মতো সামন্তসমাজও ছিল প্রভুত্ব ও নির্মম শোষণের যুগ। পরবর্তীতে শোষণ বঞ্চণার হাত থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় এক নতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে মুক্ত শ্রম (Free Labour) লক্ষ করা যায়।

(৪) **পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি:** পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন হয় ব্যক্তিগত মালিকানায় এবং অধিক মুনাফা লাভের আশায়। এখানে ভূমির পরিবর্তে কল-কারখানায় অধিক উৎপাদন হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদনের উপায় হলো শিল্প কলকারখানা, শ্রম প্রযুক্তি, মানবদক্ষতা প্রভৃতি। উৎপাদন সম্পর্ক হলো শিল্প মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে। কার্ল মার্কস পুঁজিবাদী সমাজে দু'টি শ্রেণির কথা বলেছেন। তা হলো বুর্জোয়া (Bourgeois) এবং সর্বহারা (Proletariate)। মার্কসের ধারণা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা তথা উৎপাদন পদ্ধতিতে পুঁজিপতি এবং শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে পুঁজিবাদের পতন হবে এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্ম হবে যেখানে কোন শ্রেণি শোষণ ও বৈষম্য থাকবে না।

(৫) **সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি :** এ ধরনের সমাজব্যবস্থা শ্রেণি শোষণ ও বৈষম্যহীন। ফলে কোন রূপ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। রাষ্ট্র সকল কিছুর দেখভাল করে। ব্যক্তি তার সাধ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করে এবং সে অনুযায়ী মূল্য রাষ্ট্র থেকে লাভ করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ থাকে কলকারখানা, ভূমি, রেলওয়ে প্রভৃতি। উৎপাদনের উপকরণের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ সম্ভবপর হয়। তাছাড়া উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক এর তাৎপর্য অনুধাবন সম্ভব যা সমাজবিকাশের পর্যায় সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সহায়ক।

শ্রেণি সংগ্রাম (Class Struggle)

মার্কসীয় তত্ত্বের অন্যতম বিষয় হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রাম। ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রেণিগত অবস্থান ও দ্বন্দ্ব তৈরি হয় যার প্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তিত হয়। শ্রেণি সম্পর্কে মার্কস সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা প্রদান করেননি। তবে তিনি যে ধারণা দিয়েছেন তা হলো শ্রেণি বলতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যারা একই ধরনের কাজে নিয়োজিত তাদের প্রত্যেকেই শ্রেণির সদস্য। অন্যদিকে সংগ্রাম বলতে অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন করে যাওয়াকে বোঝানো হয়। তাই বলা হয়, শ্রেণি সচেতন মানুষ তাদের শোষণ নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত যখন আন্দেলন করতে থাকে তখন তাকে শ্রেণি সংগ্রাম বলে। শ্রেণিসংগ্রাম সম্পর্কে মার্কস বলেন, মানব সমাজের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতহাস (The history of all hitherto existing society is the history of class struggles)। তাঁর মতে প্রতিটি

সমাজেই উৎপাদন যন্ত্রের উপর ভিত্তি করে পরস্পর বিরোধী দুটি শ্রেণি থাকে যারা সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি শিল্প বিপ্লবের পর থেকে আধুনিক সমাজ পর্যন্ত স্পষ্টত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত বলে জানিয়েছেন। তা হলো (ক) বুর্জোয়া (Bourgeois) এবং (খ) সর্বহারা (Proletariate)। সহজভাবে বলা হয় যারা উৎপাদনের উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করে তারা বুর্জোয়া আর যাদের কায়িক শ্রম ছাড়া আর কিছুই নাই তারা সর্বহারা। সমাজের যে পরিবর্তন তথা বিকাশ ঘটেছে তা শ্রেণি সংগ্রামেরই ফল।

কার্ল মার্কস শ্রেণিসংগ্রাম সম্পর্কিত আলোচনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ের কথা বলেছেন। তা হলো বাস্তব শ্রেণি (Class in itself) এবং সচেতন শ্রেণি (Class for itself). যখন কেবল উৎপাদন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যে শ্রেণি গড়ে ওঠে তা হচ্ছে বাস্তব শ্রেণি। এদের মধ্যে কম সচেতনতা লক্ষ করা যায়। অপর পক্ষে সচেতন শ্রেণি হলো অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেতনতা থাকে, প্রয়োজনে আন্দোলন করে। মার্কসের মতে, শ্রমিকরা শোষণের শিকার হলে দাবি আদায়ে সোচ্চার হয়। তখনই দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়ে। এভাবেই মার্কস তার শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্ব দিয়ে মানব সমাজের বিকাশ ধারাকে বিশ্লেষণ করেছেন।

বিচ্ছিন্নতাবোধ (Theory of Alienation)

বিচ্ছিন্নতাবোধ সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। প্রাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিকই বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রত্যয়টি হেগেল এবং মার্কসের মাধ্যমে দর্শন হতে সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। ইতিপূর্বে প্রত্যয়টিকে মানসিক ধারণা হিসেবে গ্রহণ করা হতো। মার্কস বিচ্ছিন্নতাবোধকে মনস্তত্ত্বের পরিবর্তে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। তাঁর মতে, বিচ্ছিন্নতাবোধ কোনো মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নয়। এটা সামাজিক বিষয়। মার্কস মনে করেন, পুঁজিবাদী সমাজে বিচ্ছিন্নতাবোধ দেখা যায়। পুঁজিবাদ বিকাশের সাথে সাথেই বিচ্ছিন্নতাবোধ বাড়তে থাকে। সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণি এই বিচ্ছিন্তাবোধ দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে শ্রমিক তথা শ্রমের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় বলে মার্কস এ তত্ত্বের নাম দেন শ্রমের বিচ্ছিন্নতাবাধের তত্ত্ব (Theory of Alienated Labour)। মূলত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই বিচ্ছিন্নতাবোধ এর সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সমাজ থেকে নিজেকে আলাদা ভাবতে শুরু করে যা বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দেয়।

বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্নতাবোধ হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক তার নিজের শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না। কারণ উৎপাদন উপকরণসমূহের মধ্যে একমাত্র শ্রম ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। তাছাড়া জটিল শ্রমবিভাজন এ বিচ্ছিন্নতাবোধকে আরো প্রকট করছে। শ্রমিক শ্রেণি কর্মহীনতার কারণেও বিচ্ছিন্নতাবোধ করে । শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতাহীনতার কারণেও বিচ্ছিন্নতাবোধ করে। ফলে তিনটি স্থানে বিচ্ছিন্নতাবোধ করে। প্রথমত: শ্রমিক তার উৎপাদিত পণ্য হতে বিচ্ছিন্নতাবোধ করে, দ্বিতীয়ত: শ্রমিক তার উৎপাদনের উপকরণ হতে বিচ্ছিন্নতাবোধ করে এবং তৃতীয়ত: শ্রমিক তার দল বা সমাজ হতে বিচ্ছিন্নতাবোধ করে। ফলস্বরূপ সে তার সমষ্টিবদ্ধতা (Collectivity) হারিয়ে ফেলে। শ্রমের বিচ্ছিন্নতাবোধ তত্ত্ব দ্বারা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ দিকসমূহ অনুধাবনে সহায়ক।

উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value)

কার্ল মার্কস তার উদ্বৃত্ত মূল্য ধারণার সাহায্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষণের প্রকৃতি তুলে ধরেছেন। উৎপাদনে অবদানের মাধ্যমে শ্রমিক নির্দিষ্ট মজুরির অতিরিক্ত যে মূল্য সৃষ্টি করে তাকে উদ্বৃক্ত মূল্য বলা হয়। একজন শ্রমিকের কাজের সময় দুইভাগে ভাগ করা হয়। আবশ্যকীয় শ্রম সময় (Required Labour Hours) এবং উদ্বৃক্ত শ্রম সময় (Surplus Labour Hours)। শ্রম শক্তির মূল্য আবশ্যিক শ্রম সময়ে উৎপাদিত মূল্য নির্দেশ করে। তাই মোট শ্রম সময় থেকে আবশ্যক শ্রম সময় বাদ দিলে উদ্বৃক্ত শ্রম সময় পাওয়া যায়। এই উদ্বৃক্ত শ্রম সময়ে একজন শ্রমিক যে মূল্য সৃষ্টি করে তাই হলো উদ্বৃক্ত মূল্য। অর্থাৎ শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত মূল্য এবং তার মজুরীর যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাকে মার্কস উদ্বৃক্ত মূল্য (Surplus Value) বলেছেন। অনেকে পুঁজিপতির এ মুনাফাকেই উদ্বৃক্ত মূল্য হিসেবে বিবেচনা করেন। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। ধরা যাক একজন শ্রমিক একদিনে মোট ০৮ ঘন্টা কাজ করে। শ্রমিক ০৮ ঘন্টা কাজ করে যে পণ্য উৎপাদন করে তার মূল্য যদি ধরা যাক ১২০০ (এক হাজার দুইশত) টাকা। এই ১২০০ টাকার পণ্য-মূল্যে শ্রমিকের শ্রম ছাড়াও ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য, যন্ত্রপাতি বাবদ ব্যয় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। মনে করি, ১২০০ টাকার পণ্য উৎপাদনে শ্রমিকের শ্রম ব্যতীত আরো ৪০০ টাকা খরচ (বিনিয়োগ) করা হয়। সুতরাং ১২০০ টাকার পণ্য উৎপাদনে

শ্রমিকের অবদান (১২০০-৪০০) = ৮০০ টাকা। এখন দৈনিক ০৮ ঘন্টা পরিশ্রম করে পুঁজিপতি যদি শ্রমিককে ৪০০ টাকা প্রদান করেন, তবে এ ক্ষেত্রে পুঁজিপতির মুনাফা দাড়ায় (৮০০-৪০০) = ৪০০ টাকা। পুঁজিপতিদের এই মুনাফাই হলো উদ্বৃক্ত মূল্য; যা মূলত শ্রমিকের শ্রম থেকে অর্জিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	কার্ল মার্কসের শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।	**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

কার্ল মার্কস কেবল যুগ-শ্রেষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক নয়, প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ এবং দার্শনিক। তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্ব, উৎপাদন পদ্ধতি, উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রভৃতি তাঁর কালোত্তীর্ণ মতবাদ। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তিনি সমাজকে বস্তুর আলোকে অধ্যয়ন করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদে। তাঁর মতে উৎপাদন পদ্ধতি সমাজের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। শ্রেণি সচেনতা সম্পর্কিত ধারণা শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বে পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্নতাবোধের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির বঞ্চিত হওয়ার পরও সমাজে অবস্থানের ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতে পুঁজিপতি শ্রেণি শ্রমিকের উদ্বৃত্তমূল্য শোষণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদন সম্পর্ক কেমন?

(ক) ভূমিদাস-ভূস্বামী (খ) দাস-দাস মালিক

(গ) মালিক-শ্রমিক (ঘ) বুর্জোয়া-প্রলিতারিয়েত

২। বিচ্ছিন্নতাবোধের ফলে শ্রমিকের অবস্থা কী হয়?

(ক) আত্মীয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয় (খ) উৎপাদিত পন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়

(গ) বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন হয় (ঘ) রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়

পাঠ-৩.৭ ম্যাক্স ওয়েবার
Max Weber

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ম্যাক্স ওয়েবারের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আদর্শ নুমুনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- পুঁজিবাদ বিকাশে প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিমালার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ম্যাক্স ওয়েবার, আদর্শ নমুনা, আমলাতন্ত্র, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, পুঁজিবাদ, প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিমালা।

ম্যাক্স ওয়েবারের জীবন ও কর্ম

ম্যাক্স ওয়েবার ১৮৬৪ সালে জার্মানীর ইরফুর্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকালের অধিকাংশ সময় কাটে বার্লিনে। তিনি আইন ও অর্থনীতি বিষয়ে লেখা পড়া করেন। তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল ইতিহাস, অর্থনীতি, এবং সমাজবিজ্ঞান। চিন্তাধারায় সূক্ষ্মতা ও বিশ্লেষণাত্বক বাস্তবতার জন্য অপরাপর চিন্তাবিদদের তুলনায় তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। ওয়েবারের সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সামাজিক ক্রিয়া (Social Action)। ম্যাক্স ওয়েবারের রচনাবলির মধ্যে General Economic History, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism এবং Economy and Society উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পদ্ধতিতত্ত্ব (Methodology)

ম্যাক্স ওয়েবার সমাজবিজ্ঞানের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় ব্যবহার করলে তা বহুলাংশে ব্যর্থ হবার সম্ভবনা রয়েছে। তাই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার সফলতার জন্য সমাজকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। ওয়েবার সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে ব্যাখ্যামূলক (interpretive) এবং সর্বাত্মক (comprehensive) পদ্ধতিকে অধিকতর কার্যকর বলে মনে করতেন। ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। আর সর্বাত্মক পদ্ধতির সাহায্যে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা যেকোনো সামাজিক ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা হয়।

আদর্শ নমুনা (Ideal Type)

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় আদর্শ নমুনা ওয়েবারের আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। আদর্শ নমুনা হলো কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি মানসিক চিত্র যার মাধ্যমে ঐ বিষয়বস্তুর বাস্তব দিকগুলো মূর্তমান হয়ে ওঠে। তিনি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আদর্শ নমুনার প্রয়োগ করেছেন। আদর্শ নমুনা প্রসঙ্গে Timasheff বলেন, আদর্শ নমুনা হলো একটি মানসিক চিত্র যা বাস্তবতার নিরিখে পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রলক্ষণসমূহকে সুস্পষ্ট করে। Coser এর মতে, আদর্শ নমুনা মূর্ত ঘটনাবলির সাদৃশ্য বা বিচ্যুতি অনুসন্ধানের জন্য বিশ্লেষণধর্মী পরিমাপক হিসেবে অনুসন্ধানকারীকে সাহায্য করে। (An ideal type is an analytical construct that serves the investigator as a meausing rod to ascertain similarities as well as deviations in concreate cases)।

আদর্শ নমুনার কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন- ক) আদর্শ নমুনা হলো একটি মানসিক চিত্র, খ) আদর্শ নমুনা কোনো অনুসিদ্ধান্ত নয়, গ) আদর্শ নমুনা নৈতিক আদর্শ বিষয়ে আলোচনা করে না, ঘ) এটি পরিসংখ্যানিক গড় নয়, ঙ) এটি বাস্তবতা অনুসন্ধানে তাত্ত্বিক টুলস্ হিসেবে কাজ করে, চ) এটি স্থির বা নিশ্চল নয় বরং পরিবর্তিত হয় এবং ঝ) এটি তুলনামূলক বিশ্লেষণে সাহায্য করে।

আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)

আমলাতন্ত্র একটি সার্বজনীন ধারণা। বিশ্বের সকল স্থানে আমলাতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। সরকারি, বেসরকারি, এমনকি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানেও আমলাতন্ত্র বিদ্যমান। আমলাতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম রয়েছে যা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পূর্ণতা পায় নিয়োগ প্রাপ্তি এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। ম্যাক্স ওয়েবার 'আমলাতন্ত্র' (Bureaucracy) প্রত্যয়টির প্রবর্তন করেন।

আমলাতন্ত্র সম্পর্কে Coser বলেন, আমলাতন্ত্র যৌক্তিক নীতি দ্বারা পরিচালিত অফিসসমূহ পদ সোপানক্রম দ্বারা নির্দিষ্ট এবং তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় নৈর্ব্যক্তিক নীতির ভিত্তিতে। (Bureaucracies are organized according to rational principles. Offices are ranked in a hierarchical order and their operations are characterized by impersonal rules)।

Aron এর মতে, ওয়েবারের দৃষ্টিতে আমলাতন্ত্র হলো বিভিন্ন কাঠামোগত প্রলক্ষণ। এটি একটি স্থায়ী সংগঠন যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির সহযোগিতায় গড়ে ওঠে যা বিশেষ ক্রিয়া সম্পাদন করে। (Bureaucracy in the weberian sense is defined by several structural traits. It is a permanent organization involving cooperation among many individuals each of whom performs specialized functions)।

ওয়েবারের মতে আমলাতন্ত্র কেবলমাত্র আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেই নয় বরং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থাতেও এ সংগঠনের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। যেসব কারণে আমলাতন্ত্রের বিকাশ ঘটে তার মধ্যে মুদ্রাভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রচলন, প্রযুক্তিগত বিপ্লব, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সুশাসন ব্যবস্থার বিস্তার উল্লেখযোগ্য। ওয়েবার তাঁর আদর্শ নমুনার আলোকে আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন। এগুলো হচ্ছে:

১। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে অফিসিয়াল কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত;
২। অফিসের প্রত্যেকের ক্ষমতা ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়;
৩। এ ধরনের সংগঠনে পদসোপানক্রম থাকে যেখানে নিচের পদের ব্যক্তি উপরের পদের নিকট জবাবদিহি থাকে;
৪। দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পায় এবং স্বাধীনভাবে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে;
৫। অধীনস্থ কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করার সার্বিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা উর্ধতন কর্মচারীদের হাতে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা আছে;
৬। কর্মজীবনে ব্যক্তি কতটুকু সফল তার উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি হবে;
৭। অফিসের যাবতীয় কর্মকান্ডের লিখিতভাবে রেকর্ড থাকবে এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ম্যাক্স ওয়েবারের আদর্শ ধরনের আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব। তাছাড়া যেকোনো সমাজব্যবস্থার আমলাতন্ত্র অনুধাবনের জন্য ওয়েবার প্রদত্ত আমলাতন্ত্র মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব (Power and Authority)

ম্যাক্স ওয়েবার সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি উপাদান হিসেবে ক্ষমতার উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, সমাজে একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর তাঁর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে তখন তাকে ক্ষমতা বলে। ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে তিনি সম্পত্তি, শিক্ষা, রাজনৈতিক অবস্থান, প্রভাবশালীদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন।

সাধারণভাবে কর্তৃত্ব হলো ক্ষমতা ব্যবহার বা প্রয়োগ করার বৈধ অধিকার। ক্ষমতা ছাড়া কর্তৃত্বের ধারণা অর্থহীন। অর্থাৎ ক্ষমতা যখন বৈধ উপায়ে অর্জন করা হয় এবং বৈধ উপায়ে প্রয়োগ করা হয় তখন তা কর্তৃত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। কর্তৃত্ব হতে হলে তার বৈধতা প্রয়োজন। কর্তৃত্বের সংজ্ঞায় Mitchell বলেন, কতৃত্ব হচ্ছে ক্ষমতার সেই ধরন যা অন্যের উপর বৈধভাবে প্রভাব বিস্তার করে। (Authority is that form of power which orders or articulates the actions of other actors through commands which are effective because those who are commanded regard the commands as legitimate)।

কর্তৃত্বের প্রকারভেদ: ম্যাক্স ওয়েবার তিন ধরনের কর্তৃত্বের ধারণা দেন। তা হলো-
(ক) যৌক্তিক কর্তৃত্ব (Rational Authority)
(খ) ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্ব (Charismatic Authority) এবং
(গ) ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব (Traditional Authority)।

(ক) যৌক্তিক কর্তৃত্ব : যৌক্তিক কর্তৃত্বের ভিত্তি হলো আইন-কানুন। এখানে কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য বলতে উচ্চ পদাধিকার ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য বুঝায় না বরং আইনের প্রতি আনুগত্য বুঝায়। দেশের নির্বাহী কোনো ব্যক্তি যখন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তখন তা যৌক্তিক কর্তৃত্ব বলে পরিচিত। আধুনিক এবং শিল্পায়িত সমাজে এ ধরনের কর্তৃত্ব লক্ষ করা যায়।

(খ) ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্ব : ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্ব ব্যক্তির অসাধারণ ব্যক্তিগত গুণাবলী, আবেগ আপ্লুত মনোভঙ্গি, বীরত্ব ও স্বরণীয় চারিত্রিক বলিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ধরনের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের নেতা ভুল করতে পারে না এ ধরনের কর্তৃত্ব সব সমাজেই কম-বেশি লক্ষ করা যায়। এ ধরনের নেতৃত্বের গুণাবলী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নেপোলিয়ন, মাওসেতুং, আব্রাহাম লিংকন, মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ নেতার মধ্যে লক্ষ করা যায়।

(গ) ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব : ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব বছরের পর বছর ধরে যে বিশ্বাস চলে আসে তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এ ধরনের কর্তৃত্বের উৎস হলো সনাতনী নিয়ম, রীতিনীতির প্রতি চিরায়ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। কোনো ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর নেতা, সমাজপতি, গ্রামীণ জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কেউ এ ধরনের নেতৃত্বের উদাহরণ হতে পারেন।

পুঁজিবাদ ও প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিমালা (Capitalism and Protestrant Ethics)

ম্যাক্স ওয়েবারের চিন্তা শুরু হয়েছিল অর্থনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে। তাঁর অধ্যয়ন অর্থনীতি বিষয়ে শুরু হলেও শেষ করার আগেই ভিন্ন বিষয়ে মনোযোগী হন। তিনি মূলত জার্মান সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মার্কস এর বিপরীতে একটি নতুন ধারণা প্রদান করেন। মার্কস যেখানে বলেন সমাজের মৌল কাঠামো (অর্থ ব্যবস্থা) উপরিকাঠামোকে প্রভাবিত করে সেখানে ওয়েবার বলেন যে, সমাজের উপরিকাঠামোর উপাদানও মৌল কাঠামোকে প্রভাবিত করতে পারে। তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে দেখান যে, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের নীতিবোধ এবং বিধিবিধান কিভাবে পুঁজিবাদ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। আধুনিক ইউরোপীয় পুঁজিবাদ বিকাশে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় নীতিমালার প্রভাব প্রমাণ করাই ১৯০৪ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* এর মূল কথা। খ্রিস্টধর্মের দুটি অংশ ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট। এর মধ্যে প্রোস্ট্যেন্টদের নীতিমালাসমূহ পুঁজিবাদ বিকাশে অনুকুল ছিল।

পুঁজিবাদ বলতে বুঝায় এমন এক বিশেষ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনকারীর উদ্দেশ্য থাকে অধিক মুনাফা অর্জন করা উৎপাদনের বেশিরভাগ ভোগের জন্য ব্যয় না করে আরো বেশি উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হয়। ওয়েবার একারণে পুঁজিবাদকে যৌক্তিক বলেছেন। তিনি পুঁজিবাদকে আদর্শ নমুনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। পুঁজিবাদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তা হলো- উৎপাদন হয় ব্যক্তিগত মালিকানায়, মূল লক্ষ্য থাকে মুনাফা অর্জন, উৎপাদন হয় অর্থ লাভ ও বাজারজাতকরণের জন্য। পুঁজিবাদ একটি যৌক্তিক সংগঠন, পুঁজিবাদে মুক্ত শ্রম পরিলক্ষিত হয়। হিসাব করা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাই বলা হয় পুঁজিবাদী সংগঠন এমন এক সংগঠন যার অর্থ অধিক মুনাফা অর্জন করা। যৌক্তিক কাজের এবং উৎপাদনের একটি ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ষোড়শ শতকে মার্টিন লুথার কিং এবং জন ক্যালভিন যে সংস্কারের ধারণা দেন তা খ্রিস্টধর্মের প্রোটেস্ট্যান্ট অনুসারীগণের মধ্যে লক্ষ করা যায় এবং পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায়। প্রোটেস্ট্যান্ট অনুসারীগণের কিছু নীতিমালা পুঁজিবাদ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তা হলো সময়ই অর্থ (Time is Money), কর্মই ঈশ্বর (Work is God), সহজ সরল জীবন যাপন করা (Live an ascetic life) এবং নতুন বিনিয়োগই অর্থ (Credit is money)। যারা এ সকল নীতিমালায় বিশ্বাস করবে তারা ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করবে। এসব নীতিমালায় পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছিল বলে ওয়েবার মনে করেন।

মার্টিন লুথার কিং এবং জন ক্যালভিন প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিমালার উল্লিখিত সংস্কার সাধন করেন। এসব নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে প্রোটেস্ট্যান্ট অনুসারীগণ পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায় বলে ওয়েবার মনে করেন। কিং ও ক্যালভিনের সংস্কারসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ক) কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পদ লাভ করা সম্ভব, খ) মানুষকে আত্মত্যাগী হতে হবে, গ) উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করতে হবে, ঘ) সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে হবে, ঙ) সময়কে পবিত্র জ্ঞান করতে হবে, চ) মানুষকে কাজে নিষ্ঠাবান, সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হতে হবে, ছ) পুঁজি সঞ্চয় করতে হবে এবং জ) প্রত্যেক ব্যক্তি তার ইচ্ছেমত কাজ করবে এবং তার কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। ওয়েবারের মতে, এসব সংস্কারকে ধর্মীয় নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করায় প্রোটেস্ট্যান্টদের দ্বারা পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছিল।

	শিক্ষার্থীর কাজ	ওয়েবারের আমলাতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।	**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজতত্ত্বের অন্যতম পুরোধা হচ্ছেন ম্যাক্স ওয়েবার। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির অনুশীলন, গবেষণা, অনুসন্ধান ও রচনাবলি সমাজবিজ্ঞান বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে মার্কসের অর্থনৈতিক ধারণা বা মৌল কাঠামোর (Basic structure) বিপরীতে ওয়েবার উপরি কাঠামো যেমন সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির প্রভাব ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে। মার্কস বলেছেন, মৌল কাঠামোই উপরি কাঠামোর নিয়ন্ত্রক। কিন্তু ওয়েবার দেখিয়েছেন, উপরি কাঠামো কিভাবে মৌল কাঠামোক প্রভাবিত করে। এ প্রসঙ্গে তিনি পুঁজিবাদ বিকাশে প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিমালার অবদানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ওয়েবারের আদর্শ নমুনা, আমলাতন্ত্র এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের এক অমূল্য সম্পদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ম্যাক্স ওয়েবারের সমাজতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় কী?

(ক) সামাজিক প্রগতি (খ) সামাজিক উন্নয়ন

(গ) আদর্শ নমুনা (ঘ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

২। কোথায় পদসোপানক্রম থাকে?

(ক) পুঁজিবাদে (খ) আমলাতন্ত্রে

(গ) আদর্শ নমুনায় (ঘ) সামাজিক সমস্যায়

৩। যৌক্তিক কর্তৃত্ব কী দ্বারা পরিচালিত?

(ক) আইন (খ) আবেগ

(গ) রীতিনীতি (ঘ) ব্যক্তিগত গুণ

ইউনিট-৩ এর উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪ ঃ ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬ ঃ ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৭ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম বিজ্ঞান কোনটি?

ক) জ্যোতির্বিদ্যা খ) গণিত
গ) পদার্থবিদ্যা ঘ) সমাজবিজ্ঞান

২. যোদ্ধা সমাজের ধারণা কে প্রদান করেছেন?

ক) অগাস্ট কোঁৎ খ) হার্বার্ট স্পেন্সার
গ) এমিল ডুর্খেইম ঘ) কার্ল মার্কস

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্ভাচনী প্রশ্ন

৩. সমাজবিজ্ঞানী নন-

i. অগাস্ট কোঁত
ii. আইনস্টাইন
iii. স্টিফেন হকিন্স

সঠিক উত্তর কোনটি?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. ডুর্খেইমের সমাজতাত্ত্বিক অবদান হচ্ছে–

(i) শ্রমবিভাজন
(ii) সামাজিক ঘটনা
(iii) যৌথ প্রতিরূপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i I ii খ. i I iii গ. i, ii, I iii ঘ. ii I iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

শীলা খুলনা থেকে ঢাকায় তার মামার বাসায় বেড়াতে এসেছে। সে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভর্তির প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে মামা একদিন তাকে নিয়ে বসলেন। মামা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, শীলা উচ্চ মাধ্যমিকে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছে এবং এটি তার একটি পছন্দের বিষয়। অতঃপর মামা তাকে প্রশ্ন করলেন; ক) কে কত সালে সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রবর্তন করেছেন? খ) প্রখ্যাত একজন মুসলিম সমাজচিন্তাবিদের নাম কী? গ) কোন্ সমাজতাত্ত্বিক সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন? ঘ) কোন সমাজবিজ্ঞানী আত্মহত্যা এবং সামাজিক সংহতি বিষয়ে তত্ত্ব প্রদান করেছেন? ঙ) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক কে? চ) কোন সমাজবিজ্ঞানীকে আমলাতন্ত্রের জনক বলা হয়? ইত্যাদি। শীলা অধিকাংশ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পেরেছিল। অতঃপর মামা তাকে সুযোগ পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তির পরামর্শ প্রদান করেন।

(ক) ইবনে খালদুন কবে কোথায় জন্মগ্রহণ এবং মৃত্যুবরণ করেন? ১
(খ) ত্রয়স্তর সূত্রের প্রধান স্তরগুলো কী কী? ২
(গ) পুঁজিবাদী সমাজে কীভাবে শ্রেণি সংগ্রাম হয়? ৩
(ঘ) ওয়েবারের আদর্শ নমুনার ভিত্তিতে আমলাতন্ত্র ব্যাখ্যা করুন। ৪

সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক প্রত্যয়
Basic Concepts of Sociology

ইউনিট ৪

প্রতিটি শাস্ত্রেরই নিজস্ব কিছু মৌলিক প্রত্যয় রয়েছে। এসব প্রত্যয়কে কেন্দ্র করেই শাস্ত্রটি আবর্তিত হয়। অর্থনীতির মৌলিক প্রত্যয় হচ্ছে সম্পদ, উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, মালিকানা, বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌলিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে রাষ্ট্র, রাজনীতি, সরকার, নেতৃত্ব ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একইভাবে শাস্ত্র হিসেবে সমাজবিজ্ঞানেরও কিছু মৌলিক প্রত্যয় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে সমাজ, সম্প্রদায়, দল বা গোষ্ঠী, সংঘ, প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি। এসব প্রত্যয়কে ঘিরেই সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা আবর্তিত হয়। এ ইউনিটে সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক প্রত্যয়সমূহ আলোচনা করা হল।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১: সমাজ ও সম্প্রদায়
পাঠ-৪.২: দল
পাঠ-৪.৩: প্রতিষ্ঠান ও সংঘ
পাঠ-৪.৪ : সংস্কৃতি ও সভ্যতা
পাঠ-৪.৫ : সম াজকাঠামো
পাঠ-৪.৬ : প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতি

পাঠ-৪.১ সমাজ
Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	সমাজ, সামাজিক সম্পর্ক, সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা।

সমাজ (Society)

সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 'সমাজ'। তাই সমাজ বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে গিয়ে সমাজ সৃষ্টি করেছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনেই সমাজের সৃষ্টি করেছে। সেজন্য সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে সামাজিক নিয়ম-কানুন রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। যখন কোনো মানুষ সমাজের আইন-কানুন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস মেনে চলেনা তখন সে সমাজের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়। বিভিন্ন দেশে সমাজের মূল্যবোধগত পার্থক্য থাকতে পারে। তবে প্রতিটি সমাজে কতগুলো সাধারণ নিয়ম-কানুন রয়েছে, যা সবাইকে মেনে চলতে হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।
সাধারণত সমাজ বলতে পারস্পরিক সম্পর্কে বাঝায়।

সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সমাজ। শিশু জন্ম থেকে আমৃত্যু সমাজেই বাস করে, সমাজই শিশুকে সামাজিকতা শিক্ষা দেয়। সমাজের সৃষ্টিও মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য হয়েছে। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের মাঝেই মানুষ তার কর্মদক্ষতাকে প্রকাশ করে এবং প্রয়োজনাদি মিটিয়ে থাকে। আবার প্রয়োজনে সমাজকে নিয়ন্ত্রণও করে। কেননা নিয়ন্ত্রণহীন সমাজ মানুষের কাম্য নয়।

সমাজের সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সমাজকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।
সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ তাদের 'Society' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Society is a system of social relationships in and through which we live." অর্থাৎ সমাজ হচ্ছে এমন সব সমাজিক সম্পর্কের একটি ব্যবস্থা যার মধ্যে আমরা জীবন যাপন করি। তিনি সমাজ বলতে সামাজিক সম্পর্কের জটিল জালকে বুঝিয়েছেন।

গিডিংস (Giddings) বলেন, "সমাজ হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত একটি সচেতন মানবগোষ্ঠী যেখানে তাদের পারস্পরিক সচেতন আলোচনা একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্কে পর্যবসিত হয় এবং কালক্রমে তা একটি স্থায়ী ও জটিল সংগঠনে দৃঢ়বদ্ধ হয়।"

জিসবার্ট বলেন: "Society, in general, consists in the complicated network of social relationship by which every human being is interconneted with his fellowmen." অর্থাৎ "সাধারণভাবে সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের এমন একটি জটিল জাল যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ।"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য, আবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহের প্রয়োজনে, জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এবং শিক্ষা ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যে সংগঠনের উপর নির্ভরশীল তা হচ্ছে সমাজ। বস্তুত মানুষ বেঁচে থাকার জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। আর এই নির্ভরশীলতা থেকেই সৃষ্টি হয় মিথষ্ক্রিয়া। মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় সামাজিক সম্পর্ক এবং পরিশেষে গড়ে উঠে সমাজ।

সমাজের গঠন প্রক্রিয়াকে নিম্নরূপভাবে দেখানো যায়:

নির্ভরশীলতা → মিথষ্ক্রিয়া → সামাজিক সম্পর্ক → সমাজ

সমাজের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Society)

সমাজ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পাই:

১। সমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংঘবদ্ধতা;
২। সমাজ বলতে সমাজে বসবাসরত মানুষের পারস্পরিক কার্যাবলিকে বুঝায়;
৩। সামাজিক বন্ধন ও সামাজিক সংহতি সমাজের মূল কথা;
৪। সমাজ শব্দটি এমন একটি বিমূর্ত ধারণা প্রকাশ করে যাকে অনুভব করা যায়;
৫। সমাজ হচ্ছে সহযোগিতার সর্বোত্তম ক্ষেত্র;
৬। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই সমাজ গড়ে ওঠে;
৭। সমাজ অনুভূতিক্ষম সমজাতীয় বুদ্ধিমানপ্রাণির সমষ্টি;
৮। সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক সর্বদা পরিবর্তনশীল।
৯। সমাজে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিরোধ পরিলক্ষিত হয়;
১০। সমাজে সামাজিক অসমতা, স্তরবিন্যাস ও শ্রেণি সম্পর্ক রয়েছে;
১১। সমাজ ব্যাপক অর্থে (বাঙালি সমাজ) এবং সীমিত অর্থে (নারীসমাজ, লেখক সমাজ) বিরাজমান;
১২। সমাজে বসবাসরত মানুষের একটি অতীত ঐতিহ্য থাকে;
১৩। সমাজ মানুষের সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল।
১৪। সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি, ধর্ম এবং জীবন প্রণালী ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু একত্রে বাস করার ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	**সময়: ০৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে সমাজ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ হচ্ছে এমন একটি সংগঠন যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং যার ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্ক। অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কের এক জটিল জালে আবদ্ধ জনগোষ্ঠীকেই সমাজ বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'সমাজ' সৃষ্টির প্রক্রিয়া কোনটি?
(ক) সামাজিক সম্পর্ক - নির্ভরশীলতা- মিথষ্ক্রিয়া - সমাজ।
(খ) মিথষ্ক্রিয়া - নির্ভরশীলতা-সামাজিক সম্পর্ক-সমাজ।
(গ) নির্ভরশীলতা - মিথষ্ক্রিয়া-সামাজিক সম্পর্ক-সমাজ।
(ঘ) সমাজ-সামাজিক সম্পর্ক - নির্ভরশীলতা মিথষ্ক্রিয়া।

২। সমাজ সৃষ্টি হয় -
(ক) মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে
(খ) মানুষের নিজের জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে
(গ) বন্যজন্তুর আক্রমণের আশংকা থেকে দলবদ্ধ হয়ে
(ঘ) প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে

পাঠ-৪.২ সম্প্রদায়
Community

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন;
- গ্রামীণ ও শহুরে সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সম্প্রদায়।

সম্প্রদায় (Community)

সমাজবিজ্ঞানে সমাজের পরেই যে প্রাথমিক প্রত্যয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয় তা হলো 'সম্প্রদায়'। 'সম্প্রদায়' হচ্ছে অভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি পালনে অভ্যস্ত জনসমষ্টি যেখানে জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয়। মানুষ তার প্রয়োজনেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে শিখেছে। সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। তাই সম্প্রদায় বলতে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী জনসমষ্টিকে বুঝায়, যারা অভিন্ন রীতিনীতি অনুসরণের মাধ্যমে জীবনযাপন করে।

সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সুনির্দিষ্ট আচরণের ভিত্তিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে সমাজের একটি বৃহত্তর গোষ্ঠী কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস এবং অভিন্ন মানসিকতা ধারণ করে। সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন সম্ভব। সম্প্রদায়ের সদস্যরা সুস্পষ্ট সামাজিক সংহতি অনুভব করে এবং অভিন্ন জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত।

সম্প্রদায়ের সংজ্ঞায় সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, "Whenever the members of any group, small or large, live together in such a way that they share, not this or that particular interest but the basic conditions of common life called that group a community." যখনই কোনো ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর লোকেরা এমনভাবে একত্রে বসবাস করে তারা বিশেষ কোনো স্বার্থের অনুসারী না হয়ে বরং অভিন্ন জীবনের অংশীদার হয়ে বসবাস করে আমরা তখনই ঐ জনগোষ্ঠীকে একটি সম্প্রদায় বলি।

সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস সম্প্রদায়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন "সম্পদ্রায় হল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা স্থানের জনগোষ্ঠী যারা সকলেই একই সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলে"।

সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ণ ও নিমকফ সম্প্রদায় বলতে এক বা একাধিক গোষ্ঠীর সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন- যারা একই এলাকায় বাস করে (Community is a group or a collection of groups that inhabits a locality)। অগবার্ণ ও নিমকফের মতে, অভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী জনসমষ্টি অন্য এলাকার একটি জনসমষ্টি থেকে পৃথক। তদুপরি সম্প্রদায়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, অভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সংগঠিত জীবন প্রণালী।

সমাজবিজ্ঞানী পার্ক ও বার্জেস বলেন "সম্প্রদায় বলতে এমন একটি আঞ্চলিক জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, ভাবধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এক ও অভিন্ন"।

অতএব, সম্প্রদায় বলতে এমন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা কোনো বিশেষ স্বার্থের জন্য কাজ না করে বরং একটি অভিন্ন জীবনযাত্রার অংশীদার হয়ে একত্রে বসবাস করে। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা অভিন্ন সংস্কৃতি ও সুনির্দিষ্ট আচার আচরণের ভিত্তিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Community)

সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর সদস্যদের অভিন্ন জীবন-যাপন প্রণালী ও মানসিকতা। একজন মানুষের সমগ্র জীবন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোষ্ঠীর সদস্যরা যেখানেই বসবাস করুক না কেনো একত্রে বসবাস করতে গিয়ে তারা জীবনের মৌলিক এবং সাধারণ স্বার্থগুলো একইসাথে ভোগ করে। এভাবেই গড়ে ওঠে সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে একজন ব্যক্তির পরিপূর্ণ সামাজিক জীবন প্রতিফলিত হয়। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে সম্প্রদায়ের ভিত্তি হল দুটি। যথা ঃ-

১। বসবাসের অঞ্চল (Locality)

২। সম্প্রদায়গত চেতনা (Community sentiment)

১। **বসবাসের অঞ্চল:** যেকোনো সম্প্রদায় সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে থাকে। সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। ভৌগোলিক পরিবেশের ক্ষেত্রে তারতম্যের জন্য মানুষের জীবনযাত্রায়ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় দীর্ঘকাল বসবাসকালে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আচার-আচরণ, রীতিনীতি ইত্যাদিতে একটা সামঞ্জস্য গড়ে ওঠে। এই সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যেমন - এস্কিমো সম্প্রদায়, গ্রাম সম্প্রদায়, পাহাড়ী সম্প্রদায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত।

২।**সম্প্রদায়গত চেতনা:** একটি সম্প্রদায়ভুক্ত সকল সদস্যের একসাথে বসবাস করার মানসিকতা থাকতে হবে। একই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সংহতিবোধ খুবই প্রবল এবং তারা সবাই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সচেতন। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সম্প্রদায়গত অনুভূতিই একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সচেতনতার পরিচায়ক। বস্তুত, একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভাবগত, আচরণগত এবং রীতিনীতিগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়াও সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সাদৃশ্য, ঐতিহ্য, নৈকট্য ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রদায়ের ধরন (Types of Community)

সম্প্রদায় ছোট হতে পারে, আবার বড়ও হতে পারে। উভয় ধরনের সম্প্রদায়ই মানুষের প্রয়োজন। তবে বৃহত্তর সম্প্রদায় ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে কখনো কখনো বিলীন করে দিতে পারে। ব্যাপক অর্থে সম্প্রদায়ের দু'টি ধরন রয়েছে। যথা:

১। গ্রামীণ সম্প্রদায়

২। শহুরে সম্প্রদায়

গ্রামীণ সম্প্রদায়: গ্রামীণ সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। আদিম কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থা থেকেই গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠেছে। যেসব এলাকায় গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠেছে সেসব এলাকার সুনির্দিষ্ট নাম ও সীমারেখা রয়েছে। তবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আচার–আচরণ ও জীবনব্যবস্থা নগরের জনগোষ্ঠীর আচার আচরণ ও জীবনধারা থেকে ভিন্ন। নিম্নে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হল-

১। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সকলের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে।

২। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা সাধারণত কৃষি। এছাড়া পশুপালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা সনাতন পেশাও পরিলক্ষিত হয়।

৩। সাধারণত গ্রামীণ সম্প্রদায়ের লোকজন রক্ষণশীল থাকে এবং ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের প্রতি অধিকার শ্রদ্ধাশীল।

৪। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ভেতর সামাজিক গতিশীলতা কম। এখানে সামাজিক পদমর্যাদার গুরুত্ব বেশি।

৫। গ্রামীণ সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রকায়। কারণ গ্রামগুলোর ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলো ক্ষুদ্র হয়।

৬। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের লোকজন সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির প্রতি গভীর আস্থাশীল এবং মেনে চলে ।

৭। গ্রামীণ সম্প্রদায়ে অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে কঠোর।

শহুরে সম্প্রদায়: জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে এবং আর্থ-সামাজিক কারণে গ্রামের মানুষ শহরে বসতি স্থাপন করে। শহর জীবনে রয়েছে বৈচিত্র্য। এখানে সাধারণত কৃষিবহির্ভুত পেশার আধিক্য রয়েছে। সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, সংস্কৃতি ও বিনোদন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে ওঠে। শহুরে সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

১। শহুরে শিক্ষার সুযোগ বেশি। এখানে বিচিত্র সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হয়।

২। শহুরে সম্প্রদায়ের সামাজিক পরিবেশ উন্নত এবং আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতির সাথে তাদের জীবন ধারা সম্পৃক্ত।
৩। শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে একক পরিবারের আধিক্য লক্ষ করা যায়।
৪। শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা বেশি।
৫। শহুরে সম্প্রদায় শিল্পোৎপাদন এবং বৃত্তিমূলক পেশায় বেশি নিয়োজিত।
৬। শহুরে সম্প্রদায়ের লোকজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী এবং তারা অনেকটা কুসংস্কার মুক্ত।
৭। শহুরে সম্প্রদায় অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বেশি গতিশীল, চিন্তা-চেতনায় অধিকতর প্রগতিশীল হয়।

সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য

নিম্নে সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যসূচক কতকগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল:

১। **উদ্দেশ্য:** সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করা, যেমন- ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানার্জন। পক্ষান্তরে সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বিভিন্ন পেশা ও জীবন যাত্রার অধিকারী, যেমন- একটি গ্রামে বিভিন্ন পেশা ও জীবন যাত্রার লোক থাকতে পারে। তবু তারা একটি সম্প্রদায়।

২। **আদর্শ:** সমাজস্থ মানুষ বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী হতে পারে। যেমন - শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে কেউ ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে পারে, আবার কেউ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে, সম্প্রদায়গত জীবন ধারনের আদর্শ ও রীতিনীতি এক ও অভিন্ন।

৩। **অঞ্চল:** 'সমাজ' এর জন্য জনসমষ্টির একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের প্রয়োজন নাই। যেমন- ছাত্র সমাজ, কিন্তু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে জনসমষ্টিকে অবশ্যই নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের বাসিন্দা হতে হবে। যেমন- একটি গ্রামীণ সম্প্রদায়, শহুরে সম্প্রদায়, উপজাতীয় সম্প্রদায়, পাহাড়ী সম্প্রদায় ইত্যাদি।

৪। **সম্প্রদায়গত মনোভাব:** সমাজের জন্য সম্প্রদায়গত মনোভাব কিংবা ঐক্য অপরিহার্য নয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি অপরিহার্য দিক।

৫। **গঠন প্রকৃতি:** সমাজ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা গড়ে উঠে। আর সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠে।

৬। **পারস্পরিক সম্পর্ক:** সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্পর্ক অপরিহার্য। সমাজে প্রত্যেকেই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, সম্প্রদায় হচ্ছে জীবন যাপনের একটি বৃত্ত বিশেষ। এখানে সকল সদস্যকে অভিন্ন রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। এখানে সুষ্ঠু জীবন যাত্রার সব কিছুই সমষ্টির উপর নির্ভরশীল।

৭। **অধিকার:** একটি সমাজে সব ধরনের মানুষ বসবাস করতে পারে। কিন্তু একটি সম্প্রদায়ে সব ধরনের মানুষ সাধারণত বাস করতে পারে না। কারণ সমাজের চেয়ে সম্প্রদায়ের অভ্যন্ড়রে কঠোর রীতিনীতি ও প্রথা–পদ্ধতি বিদ্যমান থাকে।

৮। **অংশীদারীত্ব:** একটি সমাজে দুই বা ততোধিক সম্প্রদায় থাকতে পারে, কিন্তু একটি সম্প্রদায়ে দুই বা ততোধিক সমাজ থাকতে পারে না।

৯। **নির্ভরশীলতা:** সমাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপনের কোন সংস্থা নয়। কিন্তু সম্প্রদায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। যেমন, প্রাক–ব্রিটিশ যুগের ভারতীয় গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র বলে গণ্য করা হত।

১০। **রীতিনীতি:** সমাজ হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট কতকগুলো রীতিনীতি দ্বারা গড়ে উঠা একটি ব্যবস্থা - যার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষ পারস্পরিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। আর সম্প্রদায় হচ্ছে অভিন্ন রীতিনীতি সমন্বিত একটি জনসমষ্টি, যারা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সম্প্রদায়ের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	**সময়: ০৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

যখন কোনো ছোট বা বড় জনসমষ্টি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে অভিন্ন স্বার্থ ও অনুভূতি, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি অনুসরণ করে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে তখন তাকে সম্প্রদায় বলা হয়। সম্প্রদায়গত মনোভাবের গভীরতার ভিত্তিতে সম্প্রদায় ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হতে পারে। এলাকা ও উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের কারণে সম্প্রদায় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তার মধ্যে গ্রামীণ সম্প্রদায়, শহুরে সম্প্রদায়, উপজাতীয় সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন সম্প্রদায়ের মানুষ তুলনামূলকভাবে বেশি প্রগতিশীল?

(ক) শহুরে সম্প্রদায় (খ) গ্রামীণ সম্প্রদায়

(গ) ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবি সম্প্রদায় (ঘ) উপজাতীয় সম্প্রদায়

২। সম্প্রদায়ের মৌলিক দুটি ভিত্তি কি কি?

(ক) সুনির্দিষ্ট এলাকা ও জনগোষ্ঠী (খ) মানুষ ও সমাজ

(গ) অভিন্ন সংস্কৃতি ও অঞ্চল (ঘ) বসবাসের এলাকা ও সম্প্রদায়গত চেতনা

পাঠ-৪.৩ দল
Group

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- দল বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- দলের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন;
- দলের ধরনগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দল/গোষ্ঠী।

সাধারণ অর্থে দল বলতে বোঝায় যখন কিছু মানুষ নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং তাদের মধ্যে একটি সম্পর্কে তৈরি হয়। দল গঠনের মূলে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্যবিহীন কোনো জনগোষ্ঠীকে দল বলা যায় না। দলের সদস্যদের মধ্যে থাকবে পারস্পরিক নির্ভরতা ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা। সংগঠিত জীবনযাপন করতে হলে প্রয়োজন দলগত জীবন বা গোষ্ঠী জীবন। পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান, আবেগ ও সংবেদনশীলতা রয়েছে এমন কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টিকে গোষ্ঠী বলা হয়। দল হচ্ছে একাধিক ব্যক্তির সমষ্টি যারা একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে। যথা - পরিবার, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গোষ্ঠীর সংজ্ঞা প্রদান করছেন। যেমন:

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার এবং পেজ বলেন, দল বলতে যেকোনো পরস্পর সম্পর্কিত মানবগোষ্ঠীকে বুঝায়।

সমাজ মনোবিজ্ঞানী শেরিফ (Sherif) এর মতে, দল হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট মর্যাদা ও ভূমিকা সম্পন্ন এমন কিছু লোকের সমষ্টি যাদের আচরণ ও বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করার মত অভিন্ন মূল্যবোধ ও রীতিনীতি রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট বলেন, সামাজিক গোষ্ঠী হলো পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়াশীল এবং একটি স্বীকৃত কাঠামোর আওতায় জনসমষ্টি।

সমাজবিজ্ঞানী স্মল দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "দল হচ্ছে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটি জনসমষ্টি যার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এমন একটি সম্পর্ক, যা দলের সদস্যদেরকে একই সূত্রে গ্রোথিত করে।"

সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট মার্টনের মতে, দল হচ্ছে এমন কিছু লোকের সমষ্টি যারা একে অপরের সঙ্গে স্বীকৃত ও নির্দিষ্ট ধারায় মিথষ্ক্রিয়ায় রত হয়; যারা মনে করে, তারা একটি দলের অন্তর্ভুক্ত এবং যাদেরকে অন্যরা ভিন্ন দল মনে করে।

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা যায়, দল হল দুই বা তার অধিক ব্যক্তির সমষ্টি যারা দলে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে অভিন্ন ধারণা পোষণ করে এবং তাদের সামাজিক ভূমিকা পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যাক্তিবর্গের আপন দল সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং যখন কতকগুলি অভিন্ন স্বার্থ তাদেরকে পরিচালিত করবে তখনই তাকে দল বলা যাবে।

দলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Group)

নিম্নে দলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর হলো-

১। দল হলো সমাজ জীবনের ভিত্তি।

২। দলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সদস্যের মনেই নিজেকে ও অপরকে আপন দলের একজন সদস্য বলে গণ্য করার মনোভাব থাকবে।।

৩। ব্যক্তিবর্গের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেই দল গঠিত হয়। উদ্দেশ্যহীন জনসমষ্টিকে দল বলা যায় না।

৪। দল এমন কিছু মানুষের সমষ্টি যাদের মধ্যে সমাজ স্বীকৃত পন্থায় মিথষ্ক্রিয়া থাকবে।

৫। দলের সদস্যদের মধ্যে আমরা মনোভাব (we feeling) এর অস্তিত্ব অপরিহার্য।
৬। দল মোটামুটি স্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন।
৭। দলের সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা থাকবে।
৮। দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে আদর্শগত মিল, আচরণ ও কর্মকান্ডে অভিন্নতা উহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৯। দলের সদস্যগণের মধ্যে নিজ দলের অখণ্ডতা সম্পর্কে সামগ্রিক চেতনার সৃষ্টি করে
১০। দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানব জীবনের আদিম পর্যায় থেকেই মানুষ তার সমমনাদের সঙ্গে দল গঠন করে যৌথ জীবন যাপান আরম্ভ করে।

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনুধাবন করে বলা যায় যে, দল হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এমন কিছু ব্যক্তিসমষ্টি যারা অভিন্ন উদ্দেশ্যে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং যারা বিধিবদ্ধ নিয়ম শৃংখলা দ্বারা পরিচালিত।

দলের ধরন (Types of Group)

উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দলের শ্রেণিকরণ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী সামনার তাঁর *Folkways* নামক গ্রন্থে দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

১। অন্তঃদল (In-group)
২। বহিঃদল (Out-group)

উক্ত দু'ধরনের দলকে 'আমাদের দল' (We group) এবং 'অন্য দল' (Other group) ও বলা হয়ে থাকে। যেমন- যারা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তারা নিজেদেরকে অন্তঃদলের সদস্য এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে বহিঃদলের সদস্য বিবেচনা করতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানী কুলী তাঁর *Social Organization* নামক গ্রন্থে দলকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-

১। মুখ্য দল (Primary group) ও
২। গৌণ দল (Secondary group)

১। মুখ্য দল: মুখ্য দলের সদস্যদের মাঝে থাকবে গভীর সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। মুখ্য দলের সদস্যরা নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। এটাকেই সমাজবিজ্ঞানী কুলী বলেছেন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক (face to face relation)। তিনি কেবল পরিবারকেই মুখ্য দল বলে অভিহিত করেছেন। আর অন্যান্য সকল দলকে তিনি বলেছেন গৌণ দল। তাঁর মতে, রাষ্ট্র একটি গৌণ দল। মুখ্য দলের সদস্যদের মনের মধ্যে 'আমরা মনোভাব' (we feeling) বিদ্যমান থাকে। মুখ্য দল সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র বিন্দু। এই দলের মধ্যেই মানুষ সবচেয়ে বেশী ব্যক্তিগত জীবন যাপন করে থাকে এবং এক্ষেত্রে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

২। গৌণ দল: গৌণ দল হল বৃহত্তর সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত একটি জনসমষ্টি যেখানে একে অপরের সাথে পরোক্ষভাবে সংযোগ রক্ষা করে চলে। এখানে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গৌণ দল কতকগুলো রীতিনীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয়, যেমন- ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষক সমিতি ও ছাত্র সংগঠন ইত্যাদি। গৌণদলে অধিকার ও কর্তব্যবোধ থাকে নির্দিষ্ট। এই দলের সদস্যদের দল সম্বন্ধে সচেতনতা ও ঐক্যবোধ থাকলেও এখানে সবকিছু প্রত্যক্ষ কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। এধরনের দলে আনুষ্ঠানিক তথা সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য থাকে।

মুখ্য দল ও গৌণ দলের মধ্যে পার্থক্য

নিম্নে মুখ্য দল এবং গৌণ দলের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো-

ক্রম	মুখ্য দল	গৌণ দল
১.	মুখ্য দলের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ।	গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক পরোক্ষ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ।
২.	আকার-আয়তনের দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকার।	আকার-আয়তনের দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার।
৩.	মুখ্য দলের সদস্যরা তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন।	গৌণ দলের সদস্যরা তাদেরঅস্তিত্ব সম্পর্কে তত সচেতন নয়।
৪.	মুখ্য দলের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ এবং বিস্তারিত কোন বিধিবিধান পরিলক্ষিত হয় না।	গৌণ দলের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিধিবিধান পরিলক্ষিত হয়।
৫.	মুখ্য দলের জন্ম হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ।	সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গৌণ দল জন্ম লাভ করে।
৬.	ব্যক্তির সামাজিকীকরণে মুখ্য দলের ভূমিকা বেশি।	. সামাজিকীকরণে গৌণ দলের ভূমিকা কম।

৭.	মুখ্য দলের সদস্যদের সম্পর্ককে অধিকতর মানবিক ও সামাজিক বলা যায়।	গৌণ দলের সদস্যদের সম্পর্ক যতটা না মানবিক তার চেয়ে এখানে চুক্তিই বড় কথা।
৮.	মুখ্য দল সার্বজনীন।	গৌণ দল সার্বজনীন নয়।
৯.	মুখ্য দলের সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা প্রবল।	গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা দুর্বল।
১০.	মুখ্য দলের সদস্যরা পরস্পরকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করতে পারে।	গৌণ দলের সদস্যরা পরস্পরকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করতে পারে না।
১১.	মুখ্য দল আকারে ছোট।	গৌণ দল আকারে বড়।
১২.	রক্তের সম্পর্ক কিংবা স্নেহ ভালবাসার ভিত্তিতে মুখ্য দল গড়ে উঠে।	গৌণ দল সাধারণত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে উঠে।
১৩.	মুখ্য দলের সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অভিন্নতা থাকে।	গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বিদ্যমান।
১৪.	মুখ্য দলের সদস্যদের ভেতর দৈহিক নৈকট্য বিদ্যমান।	গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে দৈহিক দুরত্ব বেশি।
১৫.	মুখ্য দলের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হলেও এর সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক সহজে নষ্ট হয় না।	গৌণ দল কখনও স্থায়িত্ব লাভ করলেও এর সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক খুব বেশি ঘনিষ্ট হয় না।
১৬.	মুখ্য দলের সদস্যদের মধ্যে 'আমরা মনোভাব' প্রবল	গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে 'আমরা মনোভাব' কম।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি সারণিতে মুখ্যদল ও গৌণদলের পার্থক্য লিখুন।	সময়: ১০ মিনিট

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের প্রত্যয়সমূহের মধ্যে দল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। মানুষ সামাজিক জীব। তাই সে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে চায়। এ জন্যই মানুষ বিভিন্ন দল গঠন করে। দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দলের প্রকারভেদ করতে গিয়ে এক একজন সমাজবিজ্ঞানী এক একটি বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়ায় দলের শ্রেণিকরণ সবসময় সমরূপ নাই। এজন্য দল বলতে আমরা বুঝি একাধিক ব্যক্তির সমষ্টি যারা একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে। যথা - পরিবার, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, সঙ্গী দল ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মুখ্য দলের সদস্যদের সচেতনতা কেমন?

(ক) পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অসচেতন (খ) পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন

(গ) সমাজের সকল স্তরের মানুষ সম্পর্কে সচেতন (ঘ) রাজনৈতিকভাবে সচেতন

২। ম্যাকাইভার দল বলতে কী বুঝিয়েছেন?

(ক) জনসমষ্টির পারস্পরিক পারিবারিক সম্পর্ক (খ) জনসমষ্টির পারস্পরিক আর্থ সামাজিক সম্পর্ক

(গ) জনসমষ্টির পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক (ঘ) জনসমষ্টির পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক

৩। মুখ্য দলের সদস্য বা একে অন্যের সাথে কী ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখেন ?

(ক) ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ। (খ) পরোক্ষ সম্পর্ক

(গ) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (ঘ) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সম্পর্ক

৪। "মুখ্য দল" বলে সমাজবিজ্ঞানী কুলী কোনটিকে চিহ্নিত করেছেন ?

(ক) রাষ্ট্র (খ) জনতা (গ) জাতিবণ (ঘ) পরিবার

পাঠ-৪.৪ প্রতিষ্ঠান ও সংঘ
Institution and Association

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রতিষ্ঠান ও সংঘ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- প্রতিষ্ঠান ও সংঘের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- প্রতিষ্ঠানের ধরনগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- সংঘের সাথে প্রতিষ্ঠান ও সমস্প্রদায়ের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রতিষ্ঠান, সংঘ।

প্রতিষ্ঠান (Institution)

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। সমাজ জীবনের নানাবিধ কর্মকাণ্ড ও জটিলতা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্যই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। তবে প্রতিষ্ঠান শুধু মানুষের প্রয়োজনই পূরণ করে না, মানুষের ক্রিয়াকর্মকেও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত প্রথাপদ্ধতি, যা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত, কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালীকে বুঝায়। সমাজে যদি প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালী, রীতি-নীতি না থাকত, তাহলে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে সমাজে বাস করতে পারত না। কাজেই সমাজে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করতে পারে। তাই বলা যায় প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক কাঠামোর এমন উপাদান যার মাধ্যমে মানুষ প্রয়োজন মিটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সংগঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও বাস্তবায়ন করে।

সুসংবদ্ধ সমাজ জীবন মানুষের কাম্য। মানুষ তার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য সমাজে কতগুলো নিয়ম-কানুনের সৃষ্টি করে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতিকে প্রতিষ্ঠান বলে। কেননা প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতি ভিন্ন সমাজ জীবন কখনো সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হতে পারে না। যেমন ঃ 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই 'পরিবার' গড়ে ওঠে। যদি বিবাহের মাধ্যমে পরিবারের সৃষ্টি না হত তাহলে নারী-পুরুষের সমন্বয়ে সুশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রিত সমাজ গড়ে উঠত না। ফলে সমাজে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

ম্যাকাইভার ও পেজ তাঁদের '*Society*' নামক গ্রন্থে প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, "প্রতিষ্ঠান হলো সে সব প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যাবলীর বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।"
সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট প্রতিষ্ঠান বলতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলো স্থায়ী ও স্বীকৃত কর্মপদ্ধতিকে বুঝিয়েছেন।

সুতরাং প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রচলিত বিধি-বিধান ও কর্মপন্থা, যা দীর্ঘকাল যাবৎ সমাজে প্রচলিত।

প্রতিষ্ঠানের ধরনসমূহ (Types of Institution)

সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন:

১। **পারিবারিক প্রতিষ্ঠান:** পরিবার সমাজ জীবনের আদি ও সর্বজন স্বীকৃত একটি সামাজিক দল। বিবাহ ও ব্যক্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রী, পিতা–মাতা, ভাই–বোন, সন্তান-সন্ততিসহ মানুষ যেখানে একত্রে বসবাস করে তাকেই পরিবার বলে। পরিবারের পূর্বশর্ত হলো বিবাহ। পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, কোর্টশিপ উল্লেখযোগ্য।

২। **অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান:** ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, যেসব মৌলিক ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন পণ্য উৎপাদান, ভোগ ও বন্টন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকে - তাকেই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে। মানুষ আদিম যুগ থেকেই অর্থনৈতিক জীবন আরম্ভ করেছে। মানব সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো পরিবর্তন ঘটেছে। সম্পত্তি

হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। তবে আধুনিক কালে ব্যাংক, বীমা, সমবায় ও ঋণদান সংস্থা ইত্যাদিকেও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ, সমাজস্থ মানুষের সম্পত্তি ও সম্পদ এসব সংগঠনের মাধ্যমেই সুরক্ষিত ও প্রসার লাভ করে।

৩। **রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান:** রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদন করে। সমাজের সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড অধিকাংশই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। রাষ্ট্র তার বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে সমাজের আইন-শৃংখলা রক্ষা, শাসন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ, আইন-প্রণয়ন, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণসহ অনেক দায়িত্ব পালন করে। আধুনিক কালের মতো প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়নি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হচ্ছে, সংসদ, ভোট, নির্বাচন প্রভৃতি।

৪। **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান:** ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্ম হল সর্বজনীন ও প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নানাভাবে ধর্মের সংগে সম্পর্কযুক্ত। সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, কতকগুলো সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। মধ্যযুগে সমাজ ও রাষ্ট্র ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ধর্মীয় রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান এখনো মানুষের সমাজ জীবনকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, নামাজ, রোজা, উপাসনা, পূজা অর্চনা উল্লেখযোগ্য।

৫। **শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান:** শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত বুদ্ধি, মেধা ও নৈতিক ক্ষমতাগুলোকে বিকশিত করে তার ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলা। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র চরিত্র গঠন করে। যৌক্তিকতা এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যোগ্য করে তোলে। স্কুল, মাদ্রাস, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাস, পরীক্ষা, প্রভৃতি হলো শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

৬। **সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান:** সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও প্রকাশ ঘটে। সমাজ প্রবাহের সঙ্গে মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির সৃষ্টি হয় তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেরও উদ্ভব হয়েছে এবং এসব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মানুষের সৃজনশীল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। সাহিত্য সংঘ, সঙ্গীত পর্ষদ ও নাট্য সংঘ হল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের এক একটি দৃষ্টান্ত।

সংঘ (Association)

কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন কিছু লোক ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে সংঘ বলে। সাধারণ অর্থে সংঘ বলতে বুঝায় এমন একটি জনসমষ্টি যারা কোনো বিশেষ কাজ সম্পাদন করার জন্য তৎপর হয়। সমাজে বিভিন্ন ধরনের সংঘ রয়েছে। একাধিক সংঘ একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো গোষ্ঠী যখন একত্রিত হয় তখন তাকে সংঘ বলে। তাঁরা আরো বলেন, সংঘ হচ্ছে এমন একটি গোষ্ঠী যা অভিন্ন গোষ্ঠী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য গঠিত হয়। এ অর্থে আমরা রাষ্ট্রকে সংঘ বলতে পারি।

জিসবার্টের মতে "সংঘ হলো একটি মুখ্য গোষ্ঠী যা কোন বিশেষ বা কতক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত হয়।" পরিবার ও রাষ্ট্রকে সংঘ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। সংঘকে কোনো কর্ম সম্পাদনের বাহনও (agency) বলা যায়। সেক্ষেত্রে সংঘ একটি করপোরেশন সমতুল্য। সমাজ জীবনে মানুষের চাহিদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিচিত্র ধরনের। একক প্রচেষ্টায় মানুষের পক্ষে তার সব চাহিদা ও লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই মানুষ সমবেতভাবে এবং সহজে সমাজ জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষগুলোকে বাস্তবায়ন করতে চায়।

সংঘ গঠনের পেছনে দু'টি উপাদান ক্রিয়াশীল, যথা - অভিন্ন উদ্দেশ্য এবং সংগঠিত হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা। যেমন, ফুটবল ক্লাব, শিক্ষক সমিতি, বণিক সমিতি ইত্যাদি। সংঘ গঠনের জন্য কতকগুলো মানবীয় উপাদান যুক্ত হয় তা হলো: (ক) একটি বিশেষ উদ্দেশ্য, (খ) সংঘের নাম ও প্রতীক, (গ) কর্তৃপক্ষ, (ঘ) সংঘের আচরণবিধি, (ঙ) সংঘের পদমর্যাদা, (চ) সংঘের সদস্যপদ এবং সংঘের সম্পত্তি।

সংঘের বৈশিষ্ট্য: নিম্নে সংঘের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো:

১। সংঘের সদস্যদের উদ্দেশ্য অভিন্ন হতে হয়;

২। সংঘের সদস্য হলে তাকে ঐ সংঘের বিধি বিধান মেনে চলতে হয়;

৩। সংঘ গঠনের উদ্দেশ্য এক বা একাধিক হতে পারে;
৪। সংঘের একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকে;
৫। সদস্যদেরকে সংঘের গঠনতন্ত্র ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়;
৬। কোনো সদস্য সংঘের নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এমনকি বহিষ্কার পর্যন্ত করা হয়;
৭। সংঘের সদস্য হওয়া বাধ্যতামুলক নয়;
৮। সংঘের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণের বাস্তব প্রয়াস চালানো হয়;
৯। সংঘের সদস্যদের মধ্যে স্বজাত্যবোধ থাকার প্রয়োজনীয়তা নেই;
১০। বিভিন্ন সংঘ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে (সমাজ কল্যাণ, বিনোদন, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি) গঠিত হয়;
১১। সংঘের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একটি কর্মনির্বাহী পর্ষদ ও গঠনতন্ত্র থাকে;
১২। সংঘ ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, আবার দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে ।

সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য : সংঘ এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

১। মানুষ সংঘের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা ভোগ করে; কিন্তু প্রতিষ্ঠানে সে জন্মগ্রহণ করে।
২। সংঘের সাথে সদস্যপদের প্রশ্ন জড়িত, কিন্তু প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক আচরণের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি।
৩। সংঘ গঠন করতে হয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠান সমাজ জীবনে ক্রমবিকশিত হয়।
৪। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি আপন আগ্রহে সংঘের সদস্য হয়। কিন্তু ব্যক্তি সহজাতপ্রবৃত্তির গুণেই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়।
৫। সংঘ সংগঠিত দল, আর প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের রূপ বিশেষ।
৬। মানুষ সংঘের সদস্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সদস্য নয়।
৭। সংঘ বিভিন্ন সদস্যের নির্দেশক, আর প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্যপ্রণালীর নির্দেশক।
৮। সংঘ প্রতিষ্ঠান ছাড়া অপর পক্ষে প্রতিষ্ঠান সংঘ ছাড়া সৃষ্টি হয় না।
৯। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘ গড়ে উঠে কিন্তু প্রতিষ্ঠান অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদেই স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে।

সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য: আমরা জানি যে, সংঘ হচ্ছে একটি ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি যা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তৎপর এবং কয়েকটি মানবীয় উপাদান থাকে। আর সম্প্রদায় হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমষ্টি যারা তাদের অভিন্ন জীবন ধারার অংশীদার হয়ে একত্রে বসবাস করে। নিচে সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো:

১। সংঘ কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে গঠিত হয়, যেমন - ক্রীড়াসংঘ
আর সম্প্রদায় হলো এমন একটি জনগোষ্ঠী যার সদস্যরা বিশেষ কোনো স্বার্থের অনুসারী না হয়ে অভিন্ন জীবনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য একই এলাকায় বসবাস করে।

২। সংঘ কোনো সম্প্রদায় নয়, বরং সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠন মাত্র। যেমন, একটি গ্রাম বা শহরে অনেকগুলো সংঘ গড়ে উঠতে পারে। তাই বলা হয় সম্প্রদায় ব্যাপক আর সংঘ সীমিত সংগঠন।

৩। যেকোনো ব্যাক্তির সংঘের সদস্য হওয়া স্বেচ্ছামূলক, কিন্তু জন্মগতভাবে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেকোনো ব্যাক্তি সম্প্রদায়ের সদস্য বলে বিবেচিত। একজন ব্যক্তি সংঘের সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সদস্যপদ স্থায়ী।

৪। সম্প্রদায় হচ্ছে একটি স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী যার উদ্দেশ্য একাধিক বা সামগ্রিক হতে পারে। সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে।
কিন্তু সংঘ ক্ষণস্থায়ী, তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থের বাস্তবায়ন না হলে তা নাও টিকতে পারে।

৫। সংঘের সদস্যরা এর নীতি, আদর্শ ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা তাদের অভিন্ন স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে মনে রেখে সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য ও রীতিনীতির মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৬। সংঘের আইনগত অবস্থান রয়েছে। প্রয়োজনে সংঘের সদস্য বা সদস্যরা সংঘের কার্যক্রম বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

৭। সংঘের কোনো আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করতেই হবে।

৮। একজন ব্যক্তি যুগপৎ অনেকগুলো সংঘের সদস্য হতে পারে, কিন্তু একজন ব্যক্তি একটিমাত্র সম্প্রদায়ভুক্ত।

৯। সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত চেতনা থাকে কিন্তু সংঘের থাকতেও পারে আবার নাও পারে।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে লক্ষ করা যায় যে, সংঘের কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রদায়ের তুলনায় সীমিত। সমাজের আংশিক কার্য সম্পাদনে সংঘ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। অপরপক্ষে, সম্প্রদায় সুনির্দিষ্ট এলাকার জনসমষ্টির অভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট যা সংশ্লিষ্ট সমাজকাঠামো ও সামাজ ব্যবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি সারণিতে সংঘ, প্রতিষ্ঠান ও সসম্প্রদায়ের পার্থক্য লিখুন।	**সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। মানুষ তার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে সমাজে কতকগুলো রীতিনীতি সৃষ্টি করে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি বা কার্যপ্রণালীকে প্রতিষ্ঠান বলে। প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের সার্বিক কর্ম-নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে এবং সমাজের মানুষকে সর্বদা ক্রিয়াশীল রাখে। সমাজবিজ্ঞানে সংঘও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। একদল লোক যখন এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে মানবীয় উপাদানযোগে সংঘবদ্ধ হয় তখন তাকে সংঘ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য কি কি?

(ক) মেধা ও নৈতিক ক্ষমতার বিকাশ

(খ) সাহিত্য শিল্প কলার চর্চা করা ও এর উৎপত্তি সাধন করা

(গ) জীবনযাপনের নিয়ম কানুন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা

(ঘ) ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন করে

২। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

(ক) সম্পত্তি (খ) রাষ্ট্র

(গ) পরিবার (ঘ) ধর্ম

৩। কিভাবে সংঘের সদস্য হওয়া যায়?

(ক) অপরের ইচ্ছায়। (খ) আপন ইচ্ছায়।

(গ) জনগণের ইচ্ছায়। (ঘ) প্রচার মাধ্যমের প্রভাবে।

৪। সংঘের কী ধরনের ভিত্তি থাকা উচিত?

(ক) নীতিগত (খ) প্রথাগত

(গ) সম্প্রদায়গত (ঘ) আইনগত

পাঠ-৪.৫ সংস্কৃতি ও সভ্যতা
Culture and Civilization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সংস্কৃতি ও সভ্যতা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবেন;
- সংস্কৃতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংস্কতি, সভ্যতা।

সংস্কৃতি (Culture)

আধুনিককালের সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি প্রত্যয় হল সংস্কৃতি। সংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। প্রচলিত অর্থে সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায় সমাজবিজ্ঞানে তা একইরূপে বোঝানো হয় না। প্রচলিত অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে গান-বাজনা, নাটক, নৃত্য, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি। নৃ-বিজ্ঞানে জীবনধারণের সকল বিষয়ই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে আলোচনা করা হয়। তবে সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানব সৃষ্ট যাবতীয় বিষয় যা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে মানব সমাজে বর্তায়। সংস্কৃতির সংজ্ঞা বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। যেমন:

জিসবার্ট বলেন, মানুষের জীবনে সকল বস্তু ও বস্তুগত আচরণের উপায় এবং পার্থিব ও অপার্থিব স্বার্থ ও সশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের জটিল সমষ্টিকে সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়।

রস বলেন, " সংস্কৃতি হচ্ছে অর্জিত আচরণের সমষ্টিগত ধরন যা অনুকরণ কিংবা শিক্ষার মাধ্যমে হয়ে থাকে।"

সংস্কৃতির সংজ্ঞায় ই.বি টাইলর বলেন, "জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইনকানুন এবং অনুশীলন ও অভ্যাস যা কোনো এক সমাজের পরিবেশে মানুষ আয়ত্ব করে তাই সে সমাজের সংস্কৃতি।"

তাই বলা যায় যে, মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডই সংস্কৃতি যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। সংস্কৃতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তা হলো-

(ক) সংস্কৃতি শিক্ষণের মাধ্যমে হয় (Culture is learned),
(খ) সংস্কৃতি অংশগ্রহণের মাধ্যমে হয় (Culture is shared) এবং
(গ) সংস্কৃতি স্থানান্তরিত হয় (Culture is transmissive)।

সংস্কৃতির দুটি উপাদান রয়েছে। একটি বস্তুগত সংস্কৃতি (Material Culture) এবং অন্যটি অবস্তুগত সংস্কৃতি (Non-Material Culture)। মানুষ প্রতিনিয়ত জীবনযাপনের জন্য যা কিছু ব্যবহার ও তৈরি করে তাই বস্তুগত সংস্কৃতি। ঘরবাড়ি, পোষাক পরিচ্ছদ, গাড়ি, আসবাবপত্র তৈজসপত্র প্রভৃতি হলো বস্তুগত সংস্কৃতি । অন্যদিকে মানুষের ভাবনা, কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, ধর্ম, নীতিবোধ প্রভৃতি হচ্ছে তার অবস্তুগত সংস্কৃতি।

সভ্যতা (Civilization)

সাধারণ অর্থে সভ্যতা হলো উন্নত জীবনধারা। এ প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার এবং পেজ এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তারা বলেন, আমরা যা তা হলো সংস্কৃতি এবং আমরা যা ব্যবহার করি তা হলো সভ্যতা।

জেরি এবং জেরি বলেন, "সভ্যতা হচ্ছে সংস্কৃতির উন্নত ধরন যেমন- কেন্দ্রীয় সরকার, শিল্পকলা ও শিক্ষণের উন্নয়ন, নীতি-নৈতিকতার সমন্বিত রূপ যা নগরের সাথে সম্পর্কিত এবং বৃহত্তর সমাজ যার মধ্যে নির্দিষ্ট।"

স্কট বলেন, "সভ্যতা হচ্ছে একটি উচ্চতর জটিল বিষয় যা সংস্কৃতির সাথে আপেক্ষিকতার আলোকে তুলনা করা হয়।"

বটোমোর বলেন, "সভ্যতা হলো কতকগুলো নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর অভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সমন্বয়"।

সব মিলিয়ে বলা যায়, সভ্যতা হলো সংস্কৃতির অধিকতর অগ্রসর ও জটিল বিষয় যা বিভিন্ন সমাজে স্পষ্টতই দৃশ্যমান।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ। যথা-

সংস্কৃতি	সভ্যতা
১। সংস্কৃতি হলো মানুষ যা কিছু করে।	১। সভ্যতা হলো মানুষ যা ব্যবহার করে।
২। সংস্কৃতি মানুষের ভেতরের রূপ।	২। সভ্যতা হলো মানুষের বাহ্যিক আচরণ
৩। সংস্কৃতি পরিমাপের মানদন্ড নাই।	৩। সভ্যতা পরিমাপের মানদন্ড রয়েছে।
৪। সংস্কৃতি ধীর গতিতে এগিয়ে চলে।	৪। সভ্যতা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে।
৫। সংস্কৃতির চাহিদা এবং আবেদন তুলনামুলকভাবে কম।	৫। সভ্যতার চাহিদা এবং আবেদন বেশি।
৬। সংস্কৃতি ধ্বংস হয় না।	৬। সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
৭। সংস্কৃতি মানুষের জীবন প্রণালী।	৭। সংস্কৃতির প্রতিফলনই হলো সভ্যতা।
৮। সংস্কৃতির মাপকাঠিতে অগ্রসর বিবেচিত হতে হলে দেখতে হবে মানুষের মনের উৎকর্ষ।	৮। সভ্যতার মাপকাঠিতে মানুষ অগ্রসর বিবেচিত হতে পারে।
৯। জীবনযাপনের সকল পদ্ধতি বা কলাকৌশলই সংস্কৃতি।	৯। উন্নত কলা-কৌশল বা প্রযুক্তি কেবল সভ্যতা।
১০। সংস্কৃতি মানুষের নৈতিক, পারমাঙ্গিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় বোঝায়।	১০। সভ্যতা প্রযুক্তিবিদ্যা, বস্তুগত সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমষ্টিকে বোঝায়।
১১। সংস্কৃতির গুণমান ও উপযোগিতা যাচাই করা যায় না।	১১। সভ্যতার গুণমান ও উপযোগিতা যাচাই করা যায়।
১২। সংস্কৃতি হলো অন্তঃস্থ ও আঙ্গিক	১২। সভ্যতা হলো বাহ্যিক ও যান্ত্রিক।

সংস্কৃতির গুরুত্ব

ব্যক্তি তথা সমাজজীবনে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মানব সমাজে সংস্কৃতির গুরুত্ব দুটি দিক থেকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত: ব্যক্তি-জীবনে, দ্বিতীয়ত: গোষ্ঠী জীবনে।

ব্যক্তির সামাজিক জীবনে সংস্কৃতির গুরুত্ব রয়েছে। সে কারণে ব্যক্তিগত জীবনে সংস্কৃতির মূল্য অপরিসীম। প্রতিটি সমাজেরই নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। সে অনুযায়ী সমাজ প্রত্যাশিত আচরণ প্রতিটি ব্যক্তিকেই করতে হয়। তাছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিল অবস্থার সমাধান সংস্কৃতির মাধ্যমে পাওয়া যায়। সমাজ জীবনে ব্যক্তিকে কোথায়, কী অবস্থায়, কখন, কী করতে হবে বা কী করতে হবে না তা ব্যক্তি জানতে পারে সংস্কৃতির মাধ্যমে। এসবের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করতে পারে। সংস্কৃতি মানুষকে সামাজিক জীবে পরিণত করে। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করার গুণাবলী সংস্কৃতি থেকেই শিক্ষালাভ করে সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় গোষ্ঠীগত জীবনেও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসিম। গোষ্ঠীর সদস্যদের সবার মধ্যে 'আমরা বোধ' সৃষ্টি করে। সংস্কৃতির মাধ্যমে গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়। সংস্কৃতির প্রভাবেই মানুষের মনে এমন ধারণার জন্ম হয়। সংস্কৃতি সামাজিক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সংস্কৃতির মাধ্যমে গোষ্ঠী জীবনের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। গোষ্ঠী জীবনে ব্যক্তির আচার আচরণকে সংস্কৃতি যুক্তি সঙ্গত ও দাযিত্বশীল করে তোলে। তাই বলা যায় সংস্কৃতি ছাড়া গোষ্ঠী জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব। কারণ সংস্কৃতি সমাজকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি সংস্কৃতিকে যুগ যুগ ধরে বাচিয়ে রাখে সমাজ।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি তুলনামূলক সারণি অঙ্কন করুন।	**সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। মানুষ যা কিছু করে তাই তার সংস্কৃতি যা বংশপরম্পরায় পালন করে। সমাজবিজ্ঞানে মানুষের সংস্কৃতি গুরুত্বসহকারে অধ্যয়ন করা হয়। সংস্কৃতি শিখণের ফল। সংস্কৃতির দুইটি উপাদানের মাধ্যমে সমাজের বস্তুগত এবং অবস্তুগত যাবতীয় বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়। সভ্যতা হলো উন্নত জীবনধারা তথা সংস্কৃতির উন্নত ধরন। সভ্যতা প্রযুক্তিবিদ্যা, বস্তুগত সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমষ্টিকে বোঝায়। সভ্যতা হচ্ছে সংস্কৃতির অধিকতর অগ্রসর ও জটিল বিষয় যা বিভিন্ন সমাজে প্রবাহিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংস্কৃতির দুইটি উপাদান কি কি?

(ক) মেধা ও নৈতিক (খ) শিল্প কলা ও সংঙ্গীত

(গ) বস্তুগত ও অবস্তুগত (ঘ) উন্নয়ন ও প্রগতি

২। সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?

(ক) সংস্কৃতি শিক্ষণের মাধ্যমে হয় (খ) সংস্কৃতি প্রচার করে

(গ) সংস্কৃতি অপার্থিব (ঘ) সংস্কৃতি অবাস্তব

৩। সভ্যতা কী?

(ক) গ্রামীণ জীবন (খ) উন্নত জীবনধারা

(গ) লোক-রীতি। (ঘ) গান-বাজনা

পাঠ-৪.৬ সমাজ কাঠামো
Social Structure

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজ কাঠামো বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- সমাজ কাঠামোর উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজ কাঠামো, সমাজ কাঠামোর উপাদান।

সমাজ কাঠামো (Social Structure)

সমাজ কাঠামোকে সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বলা হয়। মানব সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় সমাজ কাঠামো প্রত্যয়টির ব্যবহার শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। সমাজকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে তার কাঠামোগত দিক থেকেই জানা সম্ভব। সে কারণেই সমাজ কাঠামোর তাৎপর্য রয়েছে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন:

র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন বলেন, "মানুষের সাথে মানুষের সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক হলো সমাজ কাঠামো।"
এস.এফ.ন্যাডেল বলেন, "সমাজে বসবাসরত মানুষ, ব্যক্তি হিসেবে যে ভূমিকা পালন করে তা এক ধরন তথা ব্যবস্থার অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং এর মাধ্যমে আচরণের যে ধরন বা ব্যবস্থা লক্ষ করা যায় তাই হলো সমাজ কাঠামো।
কার্ল মার্কস এর মতে, সমাজ কাঠামো হলো মৌল কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর একীভূত রূপ। তিনি মৌল কাঠামো বলতে অর্থব্যবস্থা তথা উৎপাদন পদ্ধতিকে বুঝিয়েছেন। অপরপক্ষে উপরিকাঠামো বলতে সংস্কৃতিকে বুঝিয়েছেন। নিচে ছক-চিত্রের সাহায্যে মার্কসীয় সমাজ কাঠামোর ধারণা তুলে ধরা হলো:

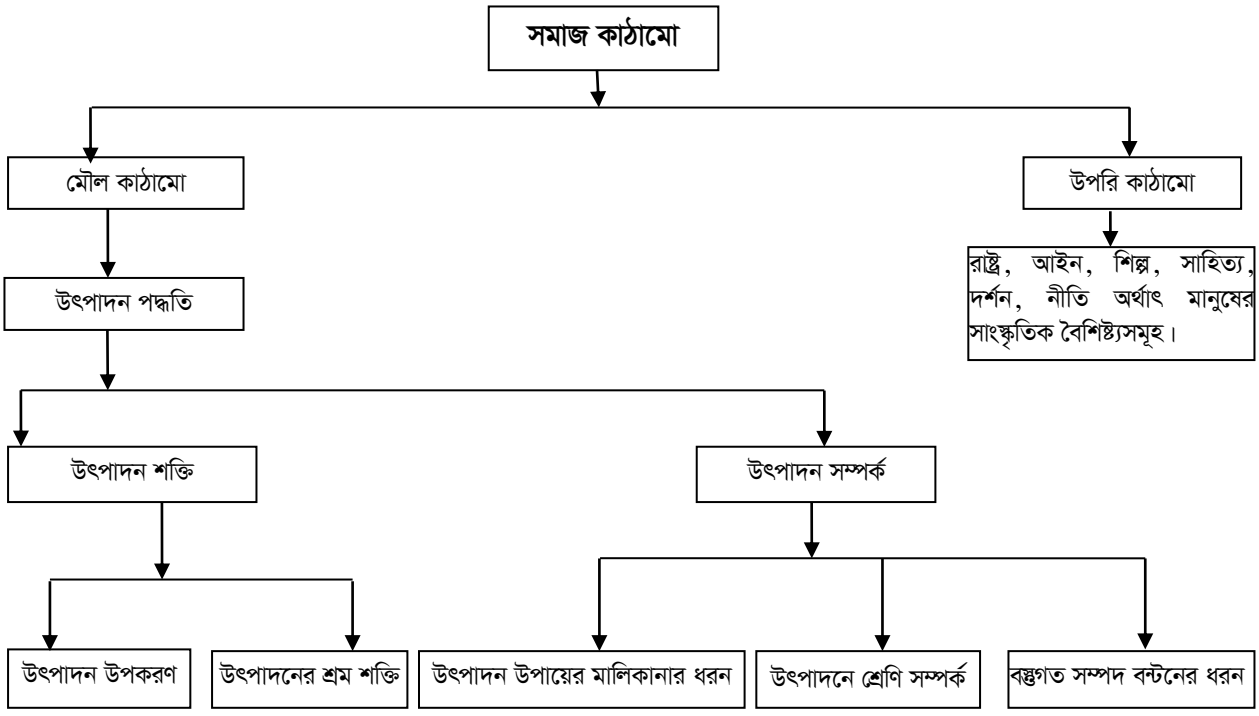

চিত্র ৪.১: সমাজ কাঠামো

সমাজবিজ্ঞানী মরিস জিনসবার্গ বলেছেন, সমাজ কাঠামো হচ্ছে সমাজের প্রধান প্রধান দল এবং প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়। সমাজবিজ্ঞানী বটোমোরও সমাজ কাঠামোকে সমাজের প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত রূপ বলে অভিহিত করেছেন। এসব দল ও প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করতে তিনি সমাজের কতগুলো পূর্বশর্তের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল:

(ক) ভাব আদান প্রদানের জন্য সমাজের সদস্যদের মধ্যে একটি যোগাযোগ মাধ্যম,
(খ) একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা পণ্য উৎপাদন ও বন্টন নিশ্চিত করে,
(গ) নতুন বংশধরদের জন্য পরিবার ও অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজীকীকরণ ব্যবস্থা,
(ঘ) একটি কর্তৃত্ব ব্যবস্থা ও ক্ষমতার বিন্যাস এবং
(ঙ) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া যা সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করে।

প্রতিটি সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সমস্ত প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে যার মাধ্যমে সমাজকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সমাজকাঠামোর প্রকৃত চিত্র পাবার জন্য কার্ল মার্কসের মৌল কাঠামো ও উপরি কাঠামোর ধারণাকে যুক্ত করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় যে, যেকোনো সমাজকে যথাযথ ভাবে অনুধাবণের জন্য সেই সমাজের সমাজকাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। কারণ সমাজের সঠিক ও সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে সমাজ কাঠামোর মাধ্যমেই।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজ কাঠামোর উপাদানগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো সমাজ কাঠামো। সমাজ কাঠামোর মাধ্যমে সমাজের সার্বিক আবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়েই সমাজ কাঠামো তৈরি হয়। সমাজের চালিকা শক্তি হিসেবে মৌল কাঠামো তথা উৎপাদন পদ্ধতি কিভাবে উপরি কাঠামো তথা সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করতে সমাজ কাঠামোর অধ্যয়ন অত্যন্ত কার্যকর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "সমাজ কাঠামো হলো প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়"- কে বলেছেন?
(ক) জিনস্‌বার্গ (খ) বটোমোর
(গ) মার্কস্‌ (ঘ) কুলি

২। কার্ল মার্কস সমাজ কাঠামোর কোন ধারণা দেন?
(ক) সমাজ ও সম্প্রদায় (খ) বস্তুগত ও অবস্তুগত
(গ) মৌল ও উপরি কাঠামো (ঘ) সভ্যতা ও সংস্কৃতি

৩। সমাজ কাঠামো সমাজবিজ্ঞানের কোন প্রত্যয়?
(ক) মাধ্যমিক প্রত্যয় (খ) গৌণ প্রত্যয়
(গ) গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় (ঘ) কেন্দ্রীয় প্রত্যয়

পাঠ-৪.৭ প্রথা, লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতি

Custom, Folkways and Mores

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রথা, লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতি বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতির বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন;
- লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রথা, লোকাচার, অবশ্য পালনীয় লোকরীতি।

প্রথা (Custom)

মানব সমাজে প্রথার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু ও সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা লাভ করা যায় না। অনেকের অভিমত, সমাজে কোন কাজ পবিত্র তাই তা করণীয় কিংবা কোন কাজ অপবিত্র তাই নিষিদ্ধ, মানুষের এই উপলব্ধি থেকেই প্রথার সৃষ্টি। যখন সমাজ সহজ-সরল এবং জটিলতামুক্ত ছিল তখন সামাজিক প্রথার মাধ্যমে সমাজ শাসিত হতো। বংশ পরম্পরায় চলে আসা অনুশাসনের মাধ্যমেই সমাজ পরিচালিত হত। সামাজিক প্রথা ঐতিহ্যবাহী হওয়ায় সাধারণ মানুষের নিকট এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সামাজিক অনুষ্ঠানাদি কিভাবে সম্পন্ন হবে তা প্রথা দিয়েই নির্ধারিত হত। সমাজ সহজ সরল ও জটিলতা মুক্ত হওয়ার প্রত্যক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান করা হতো সামাজিক প্রথার মাধ্যমে। তাই বলা হয় সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সমাজ অনুশাসনই হলো প্রথা। প্রথার সংজ্ঞা বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন-

অগবার্ন ও নিমকফ বলেন, "প্রথা হলো সেই সকল সামাজিক কার্যাবলি যা সমাজ অনুমোদিত এবং যার পৌনঃপুনিকতা আছে। "

ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, "প্রথা হলো মানুষের আচরণবিধি বা রীতিনীতির জটিল সমষ্টি।"
জিসবার্ট প্রথার প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হলো- (ক) আচরণের ধারাবাহিকতা, (খ) সামাজিক প্রকৃতি এবং (গ) আদর্শগত মূল্যমান।

তাই বলা যায় যে, সমাজস্থ মানুষ প্রতিনিয়ত কতকগুলো নির্দিষ্ট রীতিনীতি বা বিধিবিধান মোতাবেক যেসব আচরণ করে যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। এসব রীতিনীতি বা বিধি বিধানই হলো প্রথা।

প্রথার সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ প্রথার একটি ঐতিহ্য রয়েছে এবং তা চিরায়ত রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া সব সমাজেই প্রথা কম-বেশি বর্তমান। প্রথার সঙ্গে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ জড়িত এবং প্রথা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে। প্রথা মানব সমাজের সাংগঠনিক কাঠামোকে অটুট রাখে। প্রথা কেবল মানুষের বাহ্যিক আচরণের উপর নয়, মনোজগতেও প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল সম্প্রদায়ে প্রথার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। অনেক দেশ রয়েছে যেখানে প্রচলিত সামাজিক প্রথাগুলিকে অমান্য করার বিষয়ে ঐ দেশের মানুষ ভাবতেও পারে না। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনেও প্রথার ভূমিকা রয়েছে।

লোকাচার (Folkways)

সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় একটি বহুলব্যবহৃত এবং প্রচলিত ধারণা হলো লোকাচার। সমাজবিজ্ঞানী সামনারের মাধ্যমে 'লোকাচার' শব্দটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন- খাদ্য গ্রহণ, বাসস্থান, বিবাহ, পোশাক-পরিচ্ছেদ প্রভৃতি যা নানামুখী আচারণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এ অভ্যাস এবং আচরণ বংশানুক্রমে চলতে থাকে। আর এভাবেই গড়ে ওঠে একটি সমাজের লোকাচার। তাই বলা হয় লোকাচার হলো সমাজস্থ মানুষের আচরণের জন্য স্বীকৃত ও গৃহীত প্রন্থা যা পালন না করলে শস্তির কোন বিধান নাই তবে তাদের প্রতি নিন্দা বা ঘৃণা প্রকাশ

করা হয়। যেকোনো সমাজের ঐতিহ্য, চালচলন, পোশাক পরিচ্ছেদ, আদব-কায়দা, রীতিনীতি কেউ পালন না করলে শাস্তি দেওয়া হয় না তবে তাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করা হয়। লোকাচারের সংজ্ঞা বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। যেমন:

ম্যাকাইভার এবং পেজ বলেন, "সমাজে সৃষ্ট ও স্বীকৃত এবং গৃহীত পন্থাই হলো লোকাচার।"
সামনারের মতে, "লোকাচার হচ্ছে গণভিত্তিক ঘটনা, সাদৃশ্যের প্রবাহ, তাদের সংগঠন ও পারস্পরিক অবদান।"
অগবার্ন ও নিমকফ এর মতে " আদিম সমাজের কতিপয় নির্দিষ্ট অপ্রধান বা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রথাকে লোকাচার বলে।"
জিসবার্ট বলেন, "লোকাচার স্বতঃস্ফুর্ত। প্রতিষ্ঠান বা প্রথা অপেক্ষা লোকাচারের অর্থ বিস্তৃত। বর্তমান সমাজে বৈজ্ঞানিক ধারণার বাহিরে যাবতীয় স্বতঃস্ফুর্ত আচরণ ও ব্যবহারবিধি সবই লোকাচারের অন্তর্গত।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, লোকাচার হলো সমাজস্বীকৃত আচরণ যা পালনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দৃঢ় হয় এবং পালনে ব্যর্থ হলে কাউকে শাস্তি পেতে হয় না। তবে এমন আচরণ সমাজ প্রত্যাশাও করে না।

লোকাচারের বৈশিষ্ট্য: লোকাচারের কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন:
(ক) লোকাচার সামাজিক নিন্ত্রণের বাহন হিসেবে কাজ করে ।
(খ) লোকাচার পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সমাজের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়।
(গ) লোকাচারে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হতে হয়।
(ঘ) সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে স্বত:স্ফুর্তভাবে লোকাচার সৃষ্টি হয়।
(ঙ) সমাজস্থ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোকাচারের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য লক্ষ করা যায়।
(চ) লোকাচার মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়।
(ছ) সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে লোকাচার রীতিতেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তবে তা দ্রুত পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় ধীর গতিতে।

লোকাচারের গুরুত্ব : লোকাচার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উল্লেখযোগ্য বাহন হিসেবে কাজ করে। লোকাচারের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল, স্থিতিশীল, আনন্দঘন জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। লোকাচারের মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচার-আচরণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ এলাকায় লোকাচারের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামীণ জীবন সহজ-সরল হওয়ায় বংশ পরম্পরায় লোকাচার পালন হয়ে আসছে। লোকাচার একটি শক্তিশালী সামাজিক মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। তাছাড়া যেকোনো সমাজের লোকাচার ঐ সমাজের সামাজিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে কাজ করে।

অবশ্য পালনীয় লোকরীতি (Mores)

অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হলো সামাজিক আদর্শ বা মানসম্পন্ন আচরণ যা সমাজের সদস্যদের জন্য পালন করা বাধ্যতামূলক। এধরনের আদর্শ আচরণনীতি কেউ পালন না করলে শাস্তির বিধান রয়েছে এবং শাস্তি পেতে হয়। আদিম সমাজে যেমন অলিখিত বিধিবিধান ছিল তেমনি আধুনিক সমাজে বিভিন্ন আইন কানুন রয়েছে যা আবশ্যিক পালনীয় লোকরীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জিসবার্টের মতে, " অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হলো ব্যবহারবিধি নিয়ন্ত্রণকারী লোকাচার।"
ম্যাকাইভার এবং পেজের মতে, " অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হলো ব্যবহার নিয়ন্ত্রক।"
সামনার বলেন, "অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হচ্ছে আবশ্যিক পালনীয় লোকাচার।"
মিশেল বলেন, "অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হলো মানুষের আচরণের ধরন যা কেবল স্বীকৃত ও ঐতিহ্যবাহী নয় তা নির্ধারিতও বটে।"

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হলো সমাজস্থ মানুষের আবশ্যক পালনীয় আচরণ যা পালনে ব্যার্থ হলে শাস্তি পেতে হয়।

অবশ্য পালনীয় লোকরীতির বৈশিষ্ট্য: অবশ্য পালনীয় লোকরীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তা হলো:
(ক) অবশ্য পালনীয় লোকরীতি সমাজের কিছু বিধি-বিধান যা লোকাচারের তুলনায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়;
(খ) কেউ এ বিধি-বিধান পালন না করলে সমাজ চাপ সৃষ্টি করে;
(গ) লোকরীতি পালনে সমাজ চাপ সৃষ্টি করে ব্যর্থ হলে শাস্তি প্রদান করে;

(ঘ) অবশ্য পালনীয় লোকরীতির আচরণ সমাজের ভালো-মন্দ বা কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত;
(ঙ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা অবশ্য পালনীয় লোকরীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে;
(চ) দেশ কাল ভেদে অবশ্য পালনীয় লোকরীতির তারতম্য লক্ষ করা যায়।

অবশ্য পালনীয় লোকরীতির গুরুত্ব: মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ মানুষের দলগত জীবনে অবশ্য পালনীয় লোকরীতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ জীবনে অবশ্য পালনীয় লোকরীতি নানাভাবে ভূমিকা পালন করে। সমাজের মানুষের আচার আচরণ এবং কাজ কর্ম অবশ্য পালনীয় লোকরীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়। সমাজের সংহতি রক্ষা করে এবং নানাবিধ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি সামাজিক নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা পালন করে। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি পালনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সামাজিক একাত্মবোধ সৃষ্টি হয়।

লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতির মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো-

লোকাচার	অবশ্য পালনীয় লোকরীতি
১। লোকাচারের সঙ্গে সমাজের ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দ ধারণা যুক্ত নয়।	১। অবশ্য পালনীয় লোকরীতির সঙ্গে সমাজের ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের ধারণা যুক্ত।
২। অতীতের লোকরীতি বর্তমানের লোকাচারে পরিণত হয়।	২। অবশ্য পালনীয় লোকরীতির ক্ষেত্রে এমন ধারণা কম লক্ষ করা যায়।
৩। লোকাচার অধিক ব্যাপক ও সাধারণ প্রকৃতির।	৩। অবশ্য পালনীয় লোকরীতির পরিধি লোকাচারের ন্যায় বিস্তৃত নয়।
৪। লোকাচার অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী প্রকৃতির।	৪। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রকৃতির।
৫। লোকাচার পালনে চাপ প্রয়োগ করা হয় না।	৫। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি পালনে চাপ প্রয়োগ করা হয়।
৬। লোকাচার পালনে ব্যর্থ হলে শাস্তি পেতে হয় না।	৬। লোকরীতি পালনে ব্যর্থ হলে শাস্তি পেতে হয়।
৭। লোকাচার লঙ্ঘিত হলে তাকে সামাজিক সমস্যা বিবেচনা করা হয় না।	৭। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি লঙ্ঘিত হলে তাকে সামাজিক সমস্যা বিবেচনা করা হয়।
৮। লোকাচার আবশ্যিক পালনীয় নয়।	৮। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি আবশ্যিক পালনীয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজে লোকচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতির গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করুন। সময়: ৫ মিনিট

সারসংক্ষেপ

মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সামাজিক অনুশাসনই হলো প্রথা। অর্থাৎ সমাজস্থ মানুষ প্রতিনিয়ত কতকগুলো নির্দিষ্ট রীতিনীতি বা বিধিবিধান মেনে তার আচরণ করে থাকে যা সমাজকর্তৃক স্বীকৃত এবং বংশ পরমপরায় পালন করে আসছে। এসব রীতিনীতি বা বিধি বিধানই হলো প্রথা। প্রথার সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ প্রথার একটি ঐতিহ্য রয়েছে এবং তা চিরায়ত রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত। লোকাচার হলো সমাজস্বীকৃত আচরণ যা পালনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দৃঢ় হয় এবং পালনে ব্যর্থ হলে কাউকে শাস্তি পেতে হয় না। তবে এমন আচরণ সমাজ প্রত্যাশাও করে না। লোকাচারের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল, স্থিতিশীল, আনন্দঘন জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হলো সমাজস্থ মানুষের আবশ্যকীয়ভাবে পালনীয় আচরণ যা পালনে ব্যার্থ হলে শাস্তি পেতে হয়। সমাজের মানুষের আচার আচরণ এবং কাজ-কর্ম অবশ্য পালনীয় লোকরীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রথা কী?

(ক) নৈতিক ক্ষমতার বিকাশ (খ) প্রথা হলো মানুষের আচরণবিধি

(গ) জীবনযাপনের নিয়ম (ঘ) মানুষের মানসিক বিকাশ সাধন

২। লোকাচার পালন না করলে কী হয়?

(ক) শাস্তি পেতে হয় (খ) শাস্তি পেতে হয় না

(গ) উৎসাহিত করা হয় (ঘ) শাস্তি পেতে হয় না তবে নিন্দিত হতে হয়

৩। লোকরীতি হলো-

(ক) ব্যবহার নিয়ন্ত্রক (খ) ব্যক্তিত্ব বিকাশ

(গ) শিক্ষার বিকাশ (ঘ) সংস্কৃতির উন্নয়ন

ইউনিট-৪ এর উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.১	ঃ	১। গ	২। খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.২	ঃ	১। ক	২। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.৩	ঃ	১। খ	২। গ	৩। ক	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.৪	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। খ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.৫	ঃ	১। গ	২। ক	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.৬	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.৭	ঃ	১। খ	২। ঘ	৩। ক	
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। ঘ	২। ক	৩। ঘ	৪। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মূল বৈশিষ্ট্য কী?

ক. কৃষিভিত্তিক পেশা খ. নিবিড় জ্ঞাতি সম্পর্ক

গ. দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘ. 'ক' এবং 'খ' উভয়

২. সমাজের উপরি কাঠামোর উপাদান হচ্ছে–

ক. আইন, রাষ্ট্র, প্রথা, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন খ. উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ও মালিকানা

গ. 'ক' এবং 'খ' উভয় ঘ. কোনোটি নয়

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩. সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত-

i. নির্ভরশীলতা

ii. মিথষ্ক্রিয়া

iii. সামাজিক সম্পর্ক

সঠিক উত্তর কোনটি?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. অবশ্য পালনীয় লোকরীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?

i. লোকরীতি পালনে সমাজ চাপ সৃষ্টি করে ব্যর্থ হলে শাস্তি প্রদান করে

ii. সমাজের ভালো-মন্দের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই

iii. দেশ-কাল ভেদে অবশ্য পালনীয় লোকরীতির তারতম্য লক্ষ করা যায়

সঠিক উত্তর কোনটি?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

আরিফ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পড়ে। সে তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার বিলসা গ্রামে বেড়াতে যায়। গ্রামটি চলনবিলের মধ্যে অবস্থিত। আরিফ তার বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে গিয়ে লক্ষ করে, একটি পাড়ায় কেউ জাল বুনছে, কেউ নৌকা পরিষ্কার করছে, কেউবা আবার মাছ রাখার পাত্র নৌকায় তুলছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিন্ন জীবনধারার ধারণা পায় আরিফ। তবে সমাজের অপরাপর মানুষের সঙ্গেও তারা সুসম্পর্ক বজায় রেখে বংশ পরম্পরায় মাছ শিকার করে আসছে।

(ক) সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় কোনটি? ১

(খ) সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ২

(গ) গ্রামীণ ও নগর সম্প্রদায়ের তুলনামূলক আলোচনা করুন। ৩

(ঘ) সমাজ ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য নিরুপন করুন? ৪

সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
Social Institutions

ইউনিট ৫

সমাজ এবং প্রতিষ্ঠান একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে কল্পনা করা যায় না। সামাজিক কাঠামোতে অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজ পরিচালনায় প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের সমাজে নানা রকম সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- সামাজিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিবাহ, পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক অন্যতম। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের মাধ্যমে পরিবারের সৃষ্টি। সমাজ গঠনে বিবাহ ও পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিবাহ হলো এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সাধারণত একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা একত্রে বসবাস করার বৈধ স্বীকৃতি অর্জন করে। অন্যদিকে, পরিবার হলো এমন একটি সামাজিক একক যেখানে সাধারণত একজন পুরুষ এবং মহিলা বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে জন্মকৃত সন্তান-সন্ততিসহ বা সন্তান-সন্ততি ছাড়া একত্রে বসবাস করে। এগুলোর বাইরে আরেক ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা সামাজিক সম্পর্ক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে, যা জ্ঞাতিসম্পর্ক নামে পরিচিত। এ অধ্যায়ে আমরা বিবাহ, পরিবার এবং জ্ঞাতি সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : বিবাহ: ধারণা, ধরন ও পরিবর্তন
পাঠ-৫.২ : পরিবার: ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৫.৩ : পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত
পাঠ-৫.৪ : পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলি
পাঠ-৫.৫ : পরিবারের সাম্প্রতিক প্রবণতা
পাঠ-৫.৬ : জ্ঞাতিসম্পর্ক

পাঠ-৫.১ বিবাহ : ধারণা ও ধরন
Marriage: Concept and Types

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিবাহের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- বিবাহের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিবাহ, একক বিবাহ, বহুস্বামী বিবাহ, বহুস্ত্রী বিবাহ, কাজিন বিবাহ, দলগত বিবাহ ইত্যাদি।

বিবাহের সংজ্ঞা

বিবাহের মাধ্যমে একজন মহিলা ও একজন পুরুষ পারিবারিক জীবন শুরু করার প্রথম সোপানে পা দেয়। শুধু তাই নয় এই সম্পর্কের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সমাজস্বীকৃতভাবে সন্তান জন্মদানের অধিকার লাভ করে। সামাজিক নৃবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক এর মতে বিবাহ নারী-পুরুষের মধ্যকার কম বেশি স্থায়ী একটি সম্পর্ক বিশেষ, যা সন্তান জন্মদানের পরও অব্যাহত থাকে। এছাড়া বিবাহ একটি আইনানুগ ও জনমতের স্বীকৃতিসম্মত বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ। সমাজবিজ্ঞানী ল্যান্ডবার্গ তাঁর Foundations of Sociology (1956) গ্রন্থে বিবাহের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, বিবাহ হচ্ছে এমন কতকগুলো নিয়মনীতি ও আইন-কানুন, যা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং সুযোগ সুবিধাকে সংজ্ঞায়িত করে (Marriage consists of rules and regulations which define the rights, duties and privileges of husband and wife, with respects to each other.)। সমাজজ্ঞানী হর্টন এবং হান্ট এর মতে, বিবাহ হচ্ছে একটি অনুমোদিত সামাজিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে দুই কিংবা ততোধিক ব্যক্তি একটি পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে পারে (Marriage is the approved social pattern whereby two or more persons establish a family)। লুসি মেয়ার (Lucy Mair) এর মতে, বিবাহ হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার সমাজস্বীকৃত এমন যুগল বন্ধন যার মাধ্যমে ঐ মহিলা যেসব সন্তানের জন্ম দেবে সেসব সন্তান বিবাহিত ঐ পিতা-মাতার বৈধ সন্তানের স্বীকৃতি লাভ করবে।

স্কট (W. P. Scott) তাঁর Dictionary of Sociology গ্রন্থে বিবাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন বিবাহ হলো এমন একটি অনুষ্ঠান কিংবা সামাজিক রীতি নীতির এক জটিল রূপ যা একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং যা পারিবারিক জীবন পরিচালনায় অপরিহার্য ("Marriage is an institution or complex of social norms that sanctions the relationship of a man and woman and binds them in a system of mutual obligations and rights essential to the functioning of family life")।

সুতরাং বিবাহ হচ্ছে সমাজস্বীকৃত একজন পুরুষের সাথে একজন মহিলার এমন একটি যুগল বন্ধন, যার মাধ্যমে ঐ পিতা-মাতা পিতৃত্বের এবং মাতৃত্বের অধিকারী হয়।

মূলত বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত একটি চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা একত্রে বসবাস করার বৈধ ক্ষমতা লাভ করে, যার ফলে পরিবার গঠনের প্রাথমিক ধাপ শুরু হয় এবং পরস্পরের মাঝে অধিকার ও কর্তব্যের বিকাশ ঘটায়।

বিবাহের প্রকারভেদ

সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে বিবাহ ব্যবস্থাতেও এসেছে পরিবর্তন। আদিম সমাজ থেকে বর্তমান সমাজের বিবাহ পদ্ধতি ভিন্ন। শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞানের উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি কারণে বিবাহের প্রকারভেদের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এই বৈচিত্র্যের ভিত্তিতেই সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা বিবাহের ভিন্নতার কথা বলেছেন। যেমন: একক বিবাহ, বহু স্ত্রী বিবাহ, বহু স্বামী বিবাহ, গোষ্ঠী বিবাহ, শ্যালিকা বিবাহ ইত্যাদি।

একক বিবাহ (Monogamy)

একক বিবাহ প্রথায় একজন পুরুষ একই সময়ে একজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারে। এটি পৃথিবীর বহুল প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি এবং সর্বজনস্বীকৃত। এজন্য নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কীর মতে, Monogamy is, has been, and will remain the only true type of marriage. অর্থাৎ একক বিবাহ পদ্ধতি হচ্ছে সর্বকালের জন্য যথার্থ ব্যবস্থা। কেবল উন্নত সমাজেই নয়, শিকার ও খাদ্য সংগ্রহমূলক অর্থনীতির সমাজেও কম বেশি একক বিবাহ রীতির প্রচলন ছিল বলে কোনো কোনো নৃবিজ্ঞানী মনে করেন।

বহুস্ত্রী বিবাহ (Polygyny)

Polygyny শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে আগত, যার অর্থ 'একাধিক মহিলা'। বহুস্ত্রী বিবাহ প্রথায় একজন পুরুষের সাথে একাধিক মহিলার বিবাহ হয়ে থাকে। বহুস্ত্রী বিবাহ এবং বহুস্বামী বিবাহ দুটিই বহু বিবাহের দুইটি ভিন্ন রূপ। এস্কিমো এবং আফ্রিকার নিগ্রোদের ভেতর বহুস্ত্রী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। উপমহাদেশের মুসলমান এবং হিন্দু সমাজেও এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কৃষি নির্ভর সমাজে অর্থনৈতিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য বহুস্ত্রী গ্রহণের প্রচলনের উদাহরণ ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজে রয়েছে।

বহুস্বামী বিবাহ (Polyandry)

পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থায় একজন নারী একই সাথে একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তবে এটা খুব বিরল ঘটনা। তিব্বতে বহুস্বামী বিবাহ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। দুই ধরনের বহুস্বামী প্রথা লক্ষ্য করা যায়। যথা-ভ্রাতৃত্বমূলক (Fraternal) এবং অভ্রাতৃত্বমূলক (Non-fraternal)। প্রথমটিতে সকল সহোদর মিলে একজন নারীকে বিবাহ করে আর দ্বিতীয়টিতে বিবাহিত মহিলার স্বামীরা পরস্পর ভাই নয়।

একাধিক শ্যালিকাবিবাহ

বহুস্ত্রী বিবাহের একটি বিশেষ রূপ হলো একাধিক শ্যালিকা বিবাহ । এর মাধ্যমে একজন পুরুষ কোনো পরিবারের একাধিক কন্যাকে বিয়ে করে। রেডইন্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায় যে, স্ত্রীরা যদি পরস্পর বোন হয় তবে তারা একই তাবুতে বসবাস করে। আর স্ত্রীরা যদি পরস্পর বোন না হয় হয় তাহলে তারা ভিন্ন ভিন্ন তাবুতে বসবাস করে।

দলগত বিবাহ

যে বিবাহ ব্যবস্থায় একাধিক পুরুষ ও একাধিক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাকে দলগত বিবাহ বলে। এ ধরনের বিবাহ খুব কম দেখা যায়। তিব্বত এবং শ্রীলংকার সমাজে প্রচলিত বহুস্বামী গ্রহণ রীতি ধীরে ধীরে দলগত বিবাহ রীতিতে পর্যবসিত হতে দেখা যায়। তিব্বতীয় সমাজে দেখা যায় যে, ভ্রাতৃত্বমূলক বহুস্বামী গ্রহণের (Fraternal Polyandry) ক্ষেত্রে একজন মহিলার যৌথ স্বামীরা (স্বামীরা পরস্পর ভাই) সন্তান লাভে ব্যর্থ হলে তারা আরেকটি স্ত্রী গ্রহণ করতে। তবে এক্ষেত্রে তাদের আগের স্ত্রীকে বন্ধ্যা হতে হবে।

ভ্রাতৃ-বিধবা বিবাহ

কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে ঐ মৃত স্বামীর ভাইয়ের সাথে ঐ মহিলার বিবাহ হলে তাকে ভ্রাতৃবিধবা বিবাহ বা লেভিরেট বলে। এ প্রথাটি যেন ভ্রাতৃত্বমূলক বহুস্বামী গ্রহণের (Fraternal Polyandry) একটি বিশেষ রূপ। এ ধরনের ব্যবস্থায় কোনো মহিলার দুজন স্বামী পরস্পর ভাই সম্পর্কের।

শ্যালিকা বিবাহ বা সরোরেট

কোনো পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে ঐ মৃত স্ত্রীর বোনের সাথে ঐ পুরুষের বিবাহ হলে তাকে শালিকা বিবাহ বা সরোরেট বলে। এটি একাধিক শ্যালিকা বিবাহেরই একটি বিশেষ রূপ। এ ধরনের বিবাহ প্রথা আমাদের সমাজে বেশ প্রচলিত।

বহির্বিবাহ

বিবাহের ক্ষেত্রে যদি কে নো পুরুষ বা মহিলা তার নিজ গোষ্ঠীর বাইরে থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে তখন বহির্বিবাহ বলে। পাত্র বা পাত্রী যে গোষ্ঠীর সদস্য সে গোষ্ঠীর বাইরে অন্য গোষ্ঠী থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করতে হয়। এ ধরনের বিবাহ

ব্যবস্থার আরো কতক নাম পর্যবেক্ষণ করা যায়। যেমন: বহির্গোষ্ঠী, বহির্গোত্র এবং বহির্গ্রাম বিবাহ। উত্তর ভারতে একজন ব্যক্তিকে নিজ গ্রামের বাইরে বিয়ের পাত্রী খুঁজতে হয়। অতএব এর নাম বহির্গ্রাম বিবাহ (Village Exogamy)।

অন্তর্বিবাহ

বিবাহের ক্ষেত্রে যদি কোনো পুরুষ বা মহিলাকে তার নিজ গোষ্ঠীর ভেতরে থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে তখন তাকে অন্তর্বিবাহ বলে। পাত্র বা পাত্রী যে গোষ্ঠীর সদস্য সে গোষ্ঠীর মধ্য থেকে তাকে পাত্র/পাত্রী খুঁজতে হবে। পাঁচ প্রকারের অন্তর্বিবাহ রয়েছে। যথা: উপজাতীয় অন্তর্বিবাহ, জাতি বর্ণ ভিত্তিক অন্তর্বিবাহ, শ্রেণিমূলক অন্তর্বিবাহ, উপজাত বর্ণ ভিত্তিক অন্তর্বিবাহ ও নরগোষ্ঠীগত অন্তর্বিবাহ।

প্যারালাল কাজিন বিবাহ

প্যারালাল কাজিন হলো চাচাত ভাইবোন বা খালাত ভাইবোন। অর্থাৎ একই লিঙ্গের ভাইয়ের সন্তানেরা বা বোনের সন্তানেরা পরস্পর প্যারালাল কাজিন। চাচাত ভাইবোনের মধ্যে অথবা খালাত ভাইবোনের মধ্যে বিবাহকে বলা হয় প্যারালাল কাজিন বিবাহ। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজসহ পৃথিবীর অনেক সমাজেই প্যারালাল কাজিন বিবাহ প্রথা প্রচলিত।

ক্রস কাজিন বিবাহ

বিপরীত লিঙ্গের অর্থাৎ ভাই এবং বোনের সন্তানেরা ক্রস কাজিন। পিতার বোনের সন্তান-সন্ততি (বা ফুপাত ভাইবোন) এবং মাতার ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি (বা মামাত ভাইবোন) হলো ক্রস কাজিন। এ ধরনের বিবাহ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রায়ই দেখা যায়।

অনুলোম বিবাহ

উঁচু বর্ণের হিন্দু পাত্রের সঙ্গে নিচু বর্ণের হিন্দু পাত্রীর বিবাহকে অনুলোম বিবাহ (Hypergamy) বলে। ভারতের গুজরাট ও কেরালায় এর উদাহরণ পাওয়া যায়।

প্রতিলোম বিবাহ

নিচু বর্ণের হিন্দু পাত্রের সঙ্গে উঁচু বর্ণের হিন্দু পাত্রীর বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ (Hypogamy) বলে। ভারতে এ ধরনের বিবাহ একেবারে বিরল নয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিবাহের প্রকারসমূহের নাম লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিবাহের মাধ্যমেই পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। বিবাহ হচ্ছে, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। বিবাহের একটি অন্যতম সামাজিক অবদান হলো এই যে, ইহা যে কোনো মানব শিশুকে সমাজস্বীকৃত পিতা ও মাতা দান করে। তবে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে একক বিবাহ, বহুস্ত্রী বিবাহ, বহুস্বামী বিবাহ, গোষ্ঠী বিবাহ অনুলোম বিবাহ, প্রতিলোম বিবাহ, বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে একই জ্ঞাতিসম্পর্কের নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ না হওয়ার বিধান কোনো কোনো সমাজে বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নারী পুরুষ কিসের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করে?
i. পরিবারের মাধ্যমে
ii. সমাজের মাধ্যমে
iii. বিবাহের মাধ্যমে
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। Foundations of Sociology গ্রন্থটি কে লিখেছেন?
(ক) নিমকফ (খ) মারডক
(গ) কার্ল মার্কস (ঘ) ল্যান্ডবার্গ

৩। যে রীতিতে নিজ গোত্র বা গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ করতে হয় তাকে বলে
i. অন্তর্গোত্র বিবাহ
ii. বহির্গোষ্ঠী বিবাহ
iii. বহির্গোত্র বিবাহ
কোনটি সঠিক
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বিপরীত লিঙ্গের ভাইবোনের সন্তানদের মাঝে বিবাহকে কী বলে?
(ক) ক্রস কাজিন বিবাহ (খ) প্যারালাল কাজিন বিবাহ
(গ) অনুলোম বিবাহ (ঘ) প্রতিলোম বিবাহ

পাঠ-৫.২ পরিবার : ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
Family: Concept and Characteristics

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিবারের সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- পরিবারের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরিবার, জৈবিক সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদি।

পরিবারের প্রাথমিক ধারণা

পরিবার হলো একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য। পরিবারের মধ্যেই আমরা জন্মগ্রহণ করি, বড় হই, নিজেই পরিবার গঠন করি, কর্মজীবনে অবসরে পরিবারের মাঝে ফিরে আসি এবং পরিবারেই একজন সদস্যের মৃত্যু ঘটে। এজন্যই রবার্ট ফ্রস্ট (Robert Frost) বলেছেন, "Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in"- অর্থাৎ পরিবার সেই স্থান, যেখানে আপনি যখন যেতে চাইবেন তখন পরিবার আপনাকে গ্রহণ করবে।

পরিবর্তনশীল আধুনিক সমাজে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নানারকম অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার ফলে পরিবারের গড়ন, বৈশিষ্ট্য এবং এর ভূমিকা ও কার্যাবলীতে এসেছে পরিবর্তন। পরিবারের গড়ন, বৈশিষ্ট্য এবং এর ভূমিকা ও কার্যাবলীতে পরিবর্তন এলেও পরিবার তার নিজস্ব গুরুত্ব বজায় রেখেছে এবং সময়ের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে পরিবার অদ্যাবধি তার ভূমিকা পালন করে চলছে। পরিবার আমাদের নানাবিধ প্রয়োজন মিটিয়েই টিকে আছে এবং হয়ত টিকে থাকবে।

পরিবারের সংজ্ঞা

পরিবার এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Family' যা ল্যাটিন শব্দ 'Familia' থেকে এসেছে। সাধারণ কথায় বলা যায় পরিবার হলো এমন একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত/বিবাহিত সন্তান-সন্ততিসহ বসবাস করে।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ এর মতে, Family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. অর্থাৎ সুস্পষ্ট জৈবিক সম্পর্কের দ্বারা সৃষ্ট সুনির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী হলো পরিবার যা সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।

সমাজবিজ্ঞানী নিমকফ (Nimkoff) পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করেন। ("Family is a union of husband and wife with or without children").

স্কট (W. P. Scott) তাঁর Dictionary of Sociology গ্রন্থে সীমিত অর্থে এবং ব্যাপক অর্থে পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে সীমিত (বা সংকীর্ণ অর্থে) পরিবার হলো এমন একটি মৌলিক জ্ঞাতিভিত্তিক সামাজিক একক, যা স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত। ব্যাপক অর্থে পরিবার হলো পোষ্য সন্তানাদি (দত্তক) সহ এমন এক জ্ঞাতির সমষ্টি যারা একত্রে বসবাস করে। ("Family is a basic kinship unit, in its minimal form consisting of husband, wife and children. In its widest sense, it refers to all relatives living together ... including adopted persons").

কিংসলি ডেভিস পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "Family is a group of persons whose relations to one another are based upon consanguinity and who are, therefore, kin to another."(অর্থাৎ পরিবার হচ্ছে এমন কতকগুলো ব্যক্তির দ্বারা গঠিত গোষ্ঠী, যারা পরস্পর রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সে সূত্রে তারা একে অন্যের আত্মীয়)। অন্যদিকে আরনল্ড গ্রীণ বলেন, "পরিবার হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা একটি সামাজিক গোষ্ঠী, যার উপর জনসংখ্যার প্রতিস্থাপনের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে"।

পরিবার হচ্ছে একটি সামাজিক গোষ্ঠী যেখানে বিবাহ, রক্তের সম্পর্ক অথবা দত্তক প্রথার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি সংঘবদ্ধ হয় এবং এর সকল সদস্য একই বসতবাড়িতে বসবাস করে। এই সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও যোগাযোগ বিদ্যমান থাকে। তারা অভিন্ন সংস্কৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে যথাযথ সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে। তারা স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, ছেলে- মেয়ে, ভাই- বোন হিসেবে পরস্পর মিলে মিশে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে।

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে পরিবারের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

১) পরিবারের সদস্যরা সাধারণত রক্ত, বৈবাহিক বা দত্তকসূত্রে সম্পর্কযুক্ত;
২) পরিবার একটি স্থায়ী সংগঠন, কারণ এর সদস্যরা দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করে;
৩) পরিবার হলো উৎপাদন ও ভোগের একটি মৌলিক একক। কেননা এর সক্ষম সদস্যরা উৎপাদন করে এবং সবাই মিলে ভোগ করে;
৪) পরিবারের দায়িত্বশীল সদস্যরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং বেশি বয়স্ক সদস্যদের ভরণ-পোষণসহ অন্যান্য দায়-দায়িত্ব বহন করে;
৫) পরিবারের সদস্যদের বসবাসের জন্য একটি স্থায়ী এবং নির্দিষ্ট বসতবাড়ী থাকে;
৬) পরিবার সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান;
৭) প্রত্যেক পরিবারেই একজন প্রধান থাকেন;
৮) পরিবার সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বাহন।

সামাজিক গবেষণায় পরিবারের পাশাপাশি বাড়ি (Household) বা খানা প্রত্যয়টি লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিবারের চেয়ে বাড়ি বা খানা অধিকতর সুস্পষ্ট। বস্তুত, একই বাড়িতে যারা বসবাস করেন তারা একটি পরিবারই গঠন করেন। তবে পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততি এবং কখনো নাতি-নাতনীদের নিয়ে গঠিত সামাজিক সংগঠনকে বোঝায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবারের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

পরিবার একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করি, লালিত হই এবং কর্মজীবনের শেষে সেখানে ফিরে আসি। সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে পরিবারের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে সব সংজ্ঞাই এক একটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিবার একটি সামাজিক সংগঠন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি বসবাস করবে। কখনো কখনো পরিবারে দাদা-দাদীসহ বিবাহিত ছেলেমেয়েরাও একত্রে বসবাস করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Family' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে নিচের কোন শব্দ থেকে-

i. Familia
ii. Faminia
iii. Faminist

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i ও iii

২। নিচের কারা পরিবারের সদস্য?

i. স্বামী-স্ত্রী
ii. সন্তান-সন্ততি
iii. পাড়া-প্রতিবেশি

কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৩ পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন তত্ত্ব
Origin and Evaluation Theory of Family

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন সংক্রান্ত মর্গানের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন সংক্রান্ত ওয়েস্টারমার্কের তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরিবার, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, বিবর্তন, তত্ত্ব, মাতৃতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র ইত্যাদি।

পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১৮৬১ সালে ব্যাকোফেন (Bachofen) তাঁর *Mother Right* গ্রন্থে পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি তত্ত্বপ্রদান করেন। তাঁর তত্ত্বটির নাম অবাধ যৌনাচার (Sexual Promiscuity) তত্ত্ব । তাঁর তত্ত্ব মতে, আদিম সমাজে যৌন জীবনের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং বিবাহ-ভিত্তিক কোনো পরিবার ছিল না। এরূপ ব্যবস্থায় সন্তান জন্মদানের জন্য জন্মদাত্রী হিসেবে মাতাকে চিহ্নিত করা যেতো কিন্তু জন্মদাতা হিসেবে পিতাকে চিহ্নিত করা যেতো না। পিতার কোনো নিশ্চিত পরিচয় না থাকায় মাতাই তার সন্তানদের নিয়ে মাতৃপ্রধান পরিবারের প্রথম সূত্রপাত করেন এবং পরে পিতৃপ্রধান পরিবারের রূপান্তর ঘটে।

রবার্ট ব্রিফল্ট (R. Briffault) তাঁর *The Mothers* গ্রন্থে প্রাক-একক পরিবারের নানা বর্ণনা দিতে গিয়ে সরোরাল পলিজিনি (Sororal polygyny) তথা স্ত্রীর একাধিক বোনকে বিবাহ করার রীতির উদাহরণ দিয়েছেন। বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থাকে শালিকা বিবাহ (Sororate marriage) বলে। এরূপ বিবাহ ব্যবস্থায় কোনো পুরুষ একটি পরিবারের বড় বোনকে বিয়ে করলে স্ত্রীর অন্যান্য বোনদেরও স্বামী বলে গণ্য হয়। পশ্চিম অস্ট্রেলীয় ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, উত্তর আমেরিকান ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ও ক্যালিফোর্নিয়ার আদিম জনগোষ্ঠী, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, নিউ গ্রানাডার ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, কালাহারীর বুশম্যান, দক্ষিণ আফ্রিকার কাফির, মোজাম্বিকের দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকীয় ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, প্রাচীন ইন্দো-আর্য এবং পাঞ্জাবেও এ ধরনের প্রথা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। ব্রিফল্টের মতে, অবাধ যৌনচারের ফলে জন্মকৃত সন্তানদের নিয়ে মায়েরাই প্রথমে পরিবার ব্যবস্থার সূচনা করেন।

মাতৃতন্ত্রের পূর্ব অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি

যেসব নৃবিজ্ঞানী অবাধ যৌনাচারের তত্ত্বের স্বপক্ষে যুক্ত দেখিয়েছেন তারাই আদিম সমাজে পিতৃতন্ত্রের আগে মাতৃতন্ত্রের আবির্ভাবের কথা বলেছেন।

প্রথমত: জ্ঞাতিগোষ্ঠী ভিত্তিক আদিম সমাজ ব্যবস্থায় সব বয়স্কা মহিলা ছিল মাতা এবং সব বয়স্ক পুরুষ ছিল পিতা। অবাধ যৌনাচার তত্ত্বে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মাতাকে চিহ্নিত করা গেলেও পিতাকে চিহ্নিত করা যায়নি। এমতাবস্থায় সন্তানের জন্মের পর মাতাকেই শিশু লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হত। এক্ষেত্রে সন্তানের পিতা পরিচয় চিহ্নিত করতে না পারার কারণে মাতাই তার সন্তানদের ভরণপোষণ দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সূচনা করেন।

দ্বিতীয়ত: এই মতাদর্শের নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজ গঠনের প্রথম পর্যায়ে পরিবার ও সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মায়েদের হাতেই ন্যস্ত ছিল।

তৃতীয়ত: নৃবিজ্ঞানীরা আরো মনে করেন যে, সন্তানের পিতাকে নির্দিষ্ট করতে না পারার কারণে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে (Family based on group marriage) মহিলাদের ক্ষমতাই প্রাধান্য পায়। তবে মর্গানের পরিবার ব্যবস্থার

বিবর্তনের ধারায় তৃতীয় স্তরকে একটি ক্রান্তি পর্ব বলা হয় যেখানে পরিবার মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

পিতৃতন্ত্রের পূর্ব অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি

প্রথমত: ১৮৬১ সালে হেন্‌রী মেইন তাঁর *Ancient Law* গ্রন্থে বলেন যে, পিতৃপ্রধান পরিবারই হচ্ছে মানব সমাজের আদি পরিবার। তাঁর মতে, প্রাচীন রোম এবং ভারতীয় সমাজে পিতৃতন্ত্রই প্রচলিত ছিল।

দ্বিতীয়ত: নৃবিজ্ঞানী ওয়েস্টারমার্ক অবাধ যৌনাচার তত্ত্বের ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, সন্তানের জন্মের পর মাতা ও পিতা অন্তত কিছু দিনের জন্য হলেও একত্রে বাস করতে বাধ্য। কেননা সন্তানের জন্মের পরবর্তী সময়ে মাতা এবং সন্তান দু'জনেই খুব নাজুক অবস্থায় থাকেন। এমতাবস্থায় মাতা ও সন্তানের যত্ন নেওয়া অবশ্যই জরুরী। এ সময়ে পিতাই তথাকথিত ক্ষণস্থায়ী পরিবারেরও প্রধান। তাই সমাজের গোড়ায় মাতৃতান্ত্রিক না বরং পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থাই বিদ্যমান ছিল।

তৃতীয়ত: রাষ্ট্রের উৎপত্তির নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পিতৃতন্ত্রের পূর্ব অস্তিত্বের কথা জোর সমর্থন করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মাতাই প্রাথমিক পর্যায়ের মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের নেতৃত্বে ছিলেন। আরো বলা হয়, রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালনায় মাঝে-মধ্যে যে কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয় যা মহিলাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মাতৃতন্ত্র নয়, পিতৃতন্ত্রের উপস্থিতিই হলো রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল উৎস।

চতুর্থত: দৈহিকভাবে পুরুষের চেয়ে কম শক্তিশালী হওয়ার কারণে মহিলারা নয় বরং পুরুষেরাই পশু শিকার ও যুদ্ধ বিগ্রহে প্রাগৈতিহাসকাল থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। এছাড়াও মাসিক ঋতুস্রাবের কারণে ধর্মীয় কার্যক্রম থেকেও মেয়েদেরকে বিরত থাকতে হয়েছে। তাই পুরুষেরাই পরিবারসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের হাল ধরেছে। এসব কারণে ম্যালিনোস্কীসহ আধুনিক অনেক নৃবিজ্ঞানীই মাতৃতন্ত্রের পূর্ব অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

মর্গানের তত্ত্ব

সামাজিক নৃবিজ্ঞানের জনক হেনরী মর্গান Ancient Society (1877) গ্রন্থে পরিবার, সম্পত্তি, রাষ্ট্র ও সরকারের উৎপত্তি এবং সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্ক বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর মতে, আধুনিক একক বিবাহভিত্তিক পরিবার (Monogamian family) এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল।

নিম্নে মর্গান বর্ণিত পরিবারের বিবর্তন তত্ত্ব আলোচনা করা হলো-

অবাধ যৌনাচারের পর মর্গান যে পাঁচটি পরিবার ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক এক ধরনের বিবাহ পদ্ধতি।

অবাধ যৌনাচার

ব্যাকোফেনের সমর্থনে মর্গান বলেন যে, মানব সমাজে শুরুতে অবাধ যৌনাচার বিদ্যমান থাকায় তখন যৌন জীবনের উপর কোনো সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছিল না। অবাধ যৌনাচারের ঐ যুগে বিবাহ ব্যবস্থা ছিল অকল্পনীয়। যৌন জীবনের প্রাথমিক এ স্তরের নাম ছিল প্রাক-বিবাহ ও প্রাক-পরিবার ব্যবস্থা। মর্গান আরো মনে করেন যে, অবাধ যৌনাচার সামাজিক বিবর্তনের বন্যদশার নিম্ন পর্যায়ে উপস্থিত ছিল বলে অনুমান করা হয়।

১) সগোত্র পরিবার

অবাধ যৌনাচার ব্যবস্থা অতিক্রম করে মানব সমাজ প্রাথমিক পর্যায়ে যে পরিবার ব্যবস্থা গড়ে তুলে তাকে সগোত্র পরিবার ব্যবস্থা বলা হয়। এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থায় আপন ভাই বোন ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। এর ফলে যৌন জীবনের উপর প্রথম বারের মতো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। মর্গানের বর্ণনানুসারে বন্য দশার-নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল তখন সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানার অস্তিত্ব ছিল। পরিবার ব্যবস্থার বিবর্তনের এ পর্যায়ে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ ঘটেনি। সগোত্র পরিবারের আদিমতম রূপটি পলিনেশীয়দের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, যাকে মালয়ী ব্যবস্থা (Malayan System) বলে আখ্যা দেন। আর তুরানীয়ান ব্যবস্থা (Turanian System) সগোত্র পরিবারের দ্বিতীয় রূপ, যা এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান ছিল। এছাড়াও মর্গান ভারত ও চীনে সমাজ গঠনের আদিম পর্যায়ে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন।

২) পুনালুয়ান পরিবার

একদল পুরুষের সঙ্গে একদল মহিলার বিবাহের ভিত্তিতে যে পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাকে পুনালুয়ান পরিবার বলে। পুনালুয়ান পরিবার সাধারণত আপন বা জ্ঞাতি সম্পর্কের বহু সংখ্যক বোনের সঙ্গে একদল পুরুষের অথবা আপন বা জ্ঞাতি সম্পর্কের বহু সংখ্যক ভাইয়ের সঙ্গে একদল মহিলার আন্ত-বিবাহের ভিত্তিতে গঠিত হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে যৌথ স্বামী বা স্ত্রীরা পরস্পর জ্ঞাতি নাও হতে পারে। মর্গানের মতে, বন্যদশার উচ্চ এবং বর্বর দশার নিম্ন পর্যায়ে পুনালুয়ান পরিবারের অস্তিত্ব ছিল এবং সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পলিনেশীয়দের মধ্যে পুনালুয়ান পরিবার লক্ষ্য করা যায়।

৩) সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার

একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা যখন অস্থায়ী বা স্বেচ্ছামূলক সাময়িক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করে তখন তাকে সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার বলে। স্বামী-স্ত্রীর ইচ্ছার উপর এ ধরনের পরিবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এক স্বামী এবং এক স্ত্রীর পরিবার হওয়ায় সিনডিয়াসমিয়ান পরিবারই আধুনিক একক পরিবারের ভিত্তি প্রস্তুত করে। মর্গান বর্ণিত বর্বর দশার নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ পর্যায় সিনডিয়াসমিয়ান পরিবারের বিশেষত্ব হিসেবে চিহ্নিত। সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার ব্যবস্থার সময়ে সম্পত্তিতে আংশিক ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশ ঘটে।

৪) পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

একজন পুরুষের সঙ্গে বহু/একাধিক নারীর বিবাহের ভিত্তিতে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠে। মর্গান বর্ণিত এই পরিবারের অন্য নাম বহুস্ত্রী ব্যবস্থা। তবে যে নামেই ডাকা হোক এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থায় ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। মর্গানের মতে, বর্বর দশার মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ে পিতৃপ্রধান পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তখন সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার পথ আরো সুগম হয়। প্রাচীন রোমান সমাজে পিতৃপ্রধান পরিবারের অস্থিত্ব বিদ্যমান ছিল।

৫) একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবার

একজন পুরুষের সাথে একজন মহিলার বিবাহের মাধ্যমে যে পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাকে একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবার বলে, যা মোটামুটিভাবে যুগল পরিবার। মর্গানের মতে, একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারই আধুনিক পরিবারের সার্বজনীন রূপ ধারণ করে। তিনি আরো মনে করেন যে, বর্বর দশার উচ্চ পর্যায় থেকে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। শিল্পোন্নত সমাজে একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারই মোটামুটি সার্বজনীন পরিবার। তবে প্রাক-শিল্প সমাজেও এর উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল।

ওয়েস্টারমার্কের তত্ত্ব

মর্গানের তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্ব প্রদান করেন ওয়েস্টারমার্ক। ওয়েস্টারমার্ক তাঁর "The History of Human Marriage" গ্রন্থে মর্গান, ব্যাকোফেন, ব্রিফল্ট প্রমুখদের অবাধ যৌনাচার তত্ত্বের বিপরীতে ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব প্রদান করেন। তাঁর মতে, একক বিবাহভিত্তিক পরিবারই হচ্ছে সার্বজনীন যা সব সময় (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) বিদ্যমান। ওয়েস্টারমার্ক অবাধ যৌনাচার সমর্থনকারীদের বক্তব্যের অসামঞ্জস্যতা উল্লেখপূর্বক একক পরিবারের পক্ষে তাঁর যুক্তি উপস্থাপন করেন। ওয়েস্টারমার্ক এর মতে নিম্নোক্ত দু'টি ধারণার উপর অবাধ যৌনাচারের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১) অপর্যাপ্ত ও অস্পষ্ট তথ্য

ওয়েস্টারমার্কের মতে, কিছু প্রাচীন লেখক ও আধুনিক পর্যটকের লেখায় অবাধ যৌনাচারে অভ্যস্ত বন্য সমাজের উদাহরণ পাওয়া যায় যা অপর্যাপ্ত এবং অস্পষ্ট। তাঁর মতে, প্রাচীন লেখকগণ সুদূর অতীতের প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

২) অবাধ যৌনাচার

ওয়েস্টারমার্কের মতে, অবাধ যৌনাচার বিষয়টি একটি ব্যতিক্রমী বিষয়। তিনি আরো মনে করেন, অণু পরিবারই পরিবারের আসল রূপ, অন্যগুলো ব্যতিক্রম বিশেষ করে অবাধ যৌনাচার। তবে শুরুতে অণু পরিবারের রূপ আজকের মত এ রকম ছিল না। সন্তান জন্মদান থেকে শুরু করে এদের স্বনির্ভর ও দায়িত্ববান করে তোলা পর্যন্ত মা-বাবাকে অণু বা যুগল পরিবারেই বসবাস করতে হতো।

ওয়েস্টারমার্ক বহুস্বামী গ্রহণ প্রথা (Polyandry) সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ নেতিবাচক মতামত দেন। কেননা তিব্বতীয় সমাজে কয়েক ভাই মিলে এক স্ত্রী গ্রহণ করলেও একই সময়ে স্ত্রীর সঙ্গে একাধিক স্বামী বসবাস করে না। স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্য পুরুষের হেফাজতে রেখে যায়। বস্তুত, এসব প্রথাকে অতিরঞ্জিত করে দলগত বিবাহ ও অবাধ যৌনাচারের তত্ত্বকে যৌক্তিক করে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

শুধু ওয়েস্টারমার্ক ছাড়াও অনেক প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী অবাধ যৌনাচার এবং যৌথ বিবাহের অস্থিত্ব অস্বীকার করেছেন। যেমন- বিল্‌স ও হোয়জার (Beals and Hoijer) বলেন যে, প্রাচীনকালে বা অন্য কোনো সময়ে অবাধ যৌনাচারের কোনো প্রমাণ মেলেনি।

শিক্ষার্থীর কাজ	**পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন। সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

মর্গানের মতে, একক বিবাহভিত্তিক পরিবার এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল। তিনি পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্বে অবাধ যৌন জীবনের পর পর্যায়ক্রমে পাঁচ প্রকার পরিবার ব্যবস্থা বিকাশের কথা বলেছেন। কিন্তু ওয়েস্টার মার্ক পরিবারের গঠন ও বিবর্তন সম্পর্কিত মর্গানের তত্ত্বকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তিনি ব্যাকোফেন, মর্গান ও ব্রিফল্টের অবাধ যৌনাচার তত্ত্বের প্রবল বিরোধিতা করেন এবং পরিবার সম্পর্কে এক ভিন্নধর্মী তথা ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ওয়েষ্টারমার্কের মতে, সর্বকালে এবং সর্বত্র মানুষ একক বিবাহভিত্তিক যুগল পরিবারে বসবাস করে আসছে

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ‘Ancient society’ নামক বইটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

i. 1877
ii. 1777
iii. 1977

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i ও iii

২। মর্গানের সিনডিয়াসমিয়ান পরিবারের সাথে আন্দামান দ্বীপের পরিবারের গঠনকে কে সর্বপ্রথম তুলনা করেন?

i. বেইজাট
ii. ওয়েস্টারমার্ক
iii. এডওয়ার্ড বেলচার

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলি
Types and Functions of Family

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিবারের ধরনসমূহ আলোচনা করতে পারবেন;
- পরিবারের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কর্তৃত্ব, কাঠামো, ক্ষমতা, বাসস্থান, বিবাহ, বংশানুক্রম, আন্তঃগোষ্ঠী, বর্হিগোষ্ঠী, রক্তের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক, প্রজননমূলক, শিক্ষামূলক ইত্যাদি।

পরিবারের প্রকারভেদ

সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন নির্ণায়কের সাহায্যে পরিবারকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, যথা: কর্তৃত্ব (Authority), কাঠামো (Structure), বাসস্থান (Residence), বিবাহ (Marriage), বংশানুক্রম (Ancestry), আন্তঃগোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠী সম্পর্ক (In-group and Out-group affiliation) এবং রক্তের সম্পর্ক (Blood relationship)।

১) কর্তৃত্ব: কর্তৃত্বের দিক থেকে পরিবারকে পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) এবং মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) এই দুভাগে ভাগ করা হয়। পরিবারের কর্তৃত্ব পিতা, স্বামী বা প্রধান পুরুষের ওপর ন্যস্ত থাকলে তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা হয়। আর কর্তৃত্ব যদি মাতা, স্ত্রী বা প্রধান মেয়েদের উপর বর্তায় তাহলে তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। আদিম সমাজে পারিবারিক জীবনে মাতা, নাকি পিতার প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। অর্থাৎ আদিম পরিবারগুলো কি মাতৃতান্ত্রিক, নাকি পিতৃতান্ত্রিক সে বিষয়ে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের ভেতর মত বিরোধ রয়েছে। তবে কোনো পরিবারেই স্ত্রীর সর্বময় কর্তৃত্ব এবং পুরুষের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ছিল না।

২) বাসস্থান: বিবাহের পরবর্তী স্বামী-স্ত্রীর বসবাসের ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃবাস (Patrilocal), মাতৃবাস (Matrilocal) এবং নয়াবাস (Neolocal)–এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। পিতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত নব দম্পতি স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করে। অপরপক্ষে, মাতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত নব দম্পতি স্ত্রীর পিতার বাড়িতে বসবাস করে। আর নয়াবাস পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত নব দম্পতি সম্পূর্ণভাবে তাদের নতুন বাড়িতে বসবাস করে। বাংলাদেশের সমাজে পিতৃবাস প্রথা চালু রয়েছে। তবে বাংলাদেশের গারো পাহাড়ে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃবাস প্রথা চালু রয়েছে। অবশ্য কিছু আদিবাসী সমাজে দ্বিবাস প্রথা bilocal rules রয়েছে। এই নিয়মানুযায়ী বিবাহিত নব দম্পত্তির ইচ্ছার উপর বসবাসের বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয়।

৩) বংশ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার: বংশ পরম্পরা এবং সম্পত্তিতে অধিকারের উপর ভিত্তি করে পরিবারকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা-পিতৃসূত্রীয় (Patrilineal) পরিবার এবং মাতৃসূত্রীয় (Matrilineal) পরিবার। পিতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থায় সন্তানগণ পিতার সম্পত্তি, বংশানুক্রম এবং পারিবারিক নাম (Surname) ব্যবহার করে। অন্যদিকে, মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থায় সন্তানগণ মায়ের সম্পত্তি, বংশানুক্রম এবং পারিবারিক নাম (Surname) ব্যবহার করে। পিতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা আর মাতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা দেখা যায়।

৪) পরিবারের আকার বা কাঠামো: পরিবারের আকার (Size) বা কাঠামো (Structure) এর দিক থেকে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ অণু পরিবার (Nuclear or single), যৌথ পরিবার (Joint family) এবং বর্ধিত পরিবার (Extended family)। অণুপরিবার হলো একজন স্বামী, একজন স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান নিয়ে গঠিত। শিল্পোন্নত শহুরে সমাজে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা বেশি দেখা যায়। আর যৌথ পরিবার হচ্ছে পিতা-মাতা, ভাই বোন, সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতৃবধূ কিংবা পুত্রবধূর সমষ্টিতে গঠিত পরিবার। ঐতিহ্যবাহী কৃষি সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে যৌথ পরিবার। অন্যদিকে বর্ধিত পরিবার হচ্ছে তিন পুরুষের পরিবার। এটি একক পরিবারের বর্ধিত রূপ বলেই একে বর্ধিত পরিবার বলে। এ পরিবারে দাদা-দাদি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়েসহ তিন প্রজন্মের সদস্য বাস করে।

৫) স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা বা বিবাহের ভিত্তি: স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা বা বিবাহের ভিত্তিতে পরিবারকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা: একক বিবাহভিত্তিক পরিবার (Monogamian family) বহু-স্ত্রী-বিবাহভিত্তিক পরিবার (Polygynous family), বহু-স্বামী-বিবাহভিত্তিক পরিবার (Polyandrous family) এবং দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার (Family based on group marriage)। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার বিবাহের মাধ্যমে যে পরিবার গড়ে তুলে তাকে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। এটি পরিবারের আদর্শ রূপ, আধুনিক বিশ্বে এ ধরনের পরিবারের সর্বাধিক জনপ্রিয়তা রয়েছে।

একজন পুরুষ একাধিক মহিলার সাথে বিবাহের ভিত্তিতে যে পরিবার গড়ে তুলে তাকে বহু স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। অনেক সভ্য জাতি বা সমাজের মধ্যে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

একজন মহিলার সঙ্গে একাধিক পুরুষের বিবাহের ভিত্তিতে পরিবার গঠিত হলে তাকে বহু স্বামী/বহু পতি বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে। আধুনিক সভ্য সমাজে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা খুঁজে বের করা দুষ্কর। তবে ভারতের টোডা আদিবাসীদের মধ্যে এধরনের পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন আছে।

একাধিক মহিলার সঙ্গে একাধিক পুরুষের বিবাহের মাধ্যমে যে পরিবার গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার। সামাজিক নৃবিজ্ঞানী মর্গান তাঁর 'আদিম সমাজ' গ্রন্থে এ ধরনের পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন।

৬) বহির্গোষ্ঠী ও অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ: বহির্গোষ্ঠী ও অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহের ভিত্তিতে পরিবারকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা: বর্হিগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার (Exogamous family) এবং অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার (Endogamous family)। বর্হিগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে আপন গোত্রের বাইরে বিবাহের জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে হয়। অন্যদিকে, অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই আপন জাতিবর্ণের মধ্যে বিবাহের জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে হয়।

বর্হিগোষ্ঠী বিবাহকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন: অনুলোম বিবাহ এবং প্রতিলোম বিবাহ। এ দুটি ব্যবস্থা হিন্দু সমাজে বেশি লক্ষণীয়। প্রথমটিতে উঁচু বর্ণের হিন্দু পাত্রের সঙ্গে নিচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহকে বোঝায়। আর দ্বিতীয়টিতে নিচু বর্ণের হিন্দু পাত্রের সঙ্গে উঁচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহকে বোঝায়। গুজরাট, কেরালা, রাজপুতনায় এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

পরিবারের কার্যাবলি

সমাজবিজ্ঞানী জি. পি. মারডক মানব সমাজে পরিবারের চারটি কার্যাবলির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন- যৌনসূচক (Sexual), অর্থনৈতিক (Economic), প্রজননমূলক (Reproductive) ও শিক্ষামূলক (Edcuational)। অগবার্ণ ও নিমকফ এর মতে, পরিবারের ছয়টি কাজ রয়েছে। যথা: স্নেহসম্পর্কিত, অর্থনৈতিক, বিনোদনমূলক, নিরাপত্তামূলক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক। আবার সমাজবিজ্ঞানী ল্যাণ্ডবার্গ মৌলিক কাজের চারটি ভাগ দেখিয়েছেন। যথা-যৌন আচরণের নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন, শিশুদের যত্ন ও প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা ও শ্রমবিভাগ এবং মুখ্য গোষ্ঠীর সন্তুষ্টি। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞানী রিড পরিবারের কাজকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-বংশের স্থায়িত্ব, সামাজিকীকরণ, যৌন চাহিদার নিয়ন্ত্রণ ও সন্তুষ্টি এবং অর্থনৈতিক।

১) জৈবিক কাজ: মানুষ যে সব মৌলিক প্রয়োজনে পরিবার গড়ে তুলে তার অন্যতম হচ্ছে জৈবিক কাজ। পরিবারের জৈবিক কাজ প্রধানত দুটি : যথা (ক) স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক এবং (খ) সন্তান জন্মদান। পরিবারের এ দুটি কাজের মধ্যে প্রথমটি অপরিবর্তিত থাকলেও সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে যাতে কম সন্তান জন্ম লাভ করে। আধুনিক শিল্পায়নের যুগে পিতা-মাতাসহ পরিবারের সক্ষম সদস্যদেরকে ঘরের বাইরে অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যস্ত থাকায় প্রায়শ শিশুকে নার্সারী অথবা দিবাযত্ন কেন্দ্রে রেখে লালনপালন করা হয়।

২) সন্তান প্রতিপপালনমূলক: নবজাত শিশুর লালন পালন থেকে শুরু করে ভরণ পোষণের দায়িত্ব পরিবারকে পালন করতে হয়। জন্ম লাভের পর সকল মানব শিশু থাকে অসহায়। এসময় শিশুর সেবা যত্ন ও লালন পালনের দায়িত্ব কেবল পরিবারের মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে।

৩) মনস্তাত্ত্বিক: শিশুর প্রতি মমত্ববোধ থেকেই শিশুর লালন-পালনের দায়-দায়িত্বের ভিত্তি রচিত হয়। শিশুর গোসল, খাবার প্রদান, যত্ন, বিনোদনের আয়োজন, ব্যায়াম, আদর ইত্যাদি সকল কাজই পরিবার করে থাকে। শৈশব থেকে শুরু করে যৌবন এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও মানুষের মনের অস্থিরতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। জগতের নানা রহস্য নিয়ে শিশু-কিশোরদের মনে অনেক প্রশ্ন দানা বাঁধে। কখনো কখনো তারা স্পর্শকাতর হয়ে উঠে। তাই তাদের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পরিবার

গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক কাজটি পালন করে থাকে। এছাড়া, পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ তথা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনে যে যত্নবান থাকেন সেটাও পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

৪) দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তামূলক: পরিবারের সকল সদস্য দৈহিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ ও সবল থাকে না। এক্ষেত্রে পরিবারের সুস্থ সদস্যরা অন্যান্য সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকেন। মানুষের মানসিক নিরাপত্তা বিধানে পরিবার অনেক বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। মানসিক নিরাপত্তাবোধ না থাকলে মানুষের মাঝে হতাশা, হীনমন্যতা ও আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে যা জীবন ধারণে কষ্টকর। এর ফলে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এরূপ বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে তারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে পারে।

৫) অর্থনৈতিক: আদিম সমাজে পরিবার গড়ে উঠার পেছনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অন্যতম ভূমিকা পালন করতো। সে সময় সমাজে মানুষের জৈবিক চাহিদার পাশাপাশি আর্থিক প্রয়োজনটাও জরুরি ছিল। বিবাহিত নব দম্পতি যে পরিবার গঠন করতো তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দলবদ্ধভাবে খাদ্য সংগ্রহ, পশু পালন এবং কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা। খাদ্যের নিরাপত্তা তাদেরকে সর্বদা ব্যস্ত রাখতো। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পরিবারগুলো এখনও উৎপাদন (Production), বন্টন (Distibution) এবং ভোগের (Consumption) একক হিসেবে কাজ করে থাকে।

৬) শিক্ষাদানমূলক: আদিম ও মধ্যযুগে গৃহে বসেই মানুষ শিক্ষা লাভ করতো। পরিবারের দায়িত্ব ছিল সন্তান-সন্ততির লেখাপড়ার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা এবং অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা। আধুনিক যুগে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানের কাজটি গ্রহণ করলেও শিক্ষাদানের হাতে খড়ির কাজটি আজও মূলত পরিবারই করে থাকে। পরিবারই সন্তানদের ধর্মীয় ও সামাজিক নীতিবোধ শিক্ষা, বিদ্যালয়ে ভর্তি, বাড়িতে নিয়মিত পড়ালেখার উপর নজর, প্রয়োজনে গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে।

৭) ধর্মীয় কাজ: মানব শিশু কোনো ধর্ম পালন করবে তা নির্ভর করে পারিবারিক ধর্মীয় শিক্ষার উপর। যেমন: মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী পারিবারিক ধর্মীয় শিক্ষার কারণে ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি মনে চলে, তেমনি হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী শিশু হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি মেনে চলে। সুতরাং ধর্মীয় শিক্ষার সূতিকাগার হচ্ছে পরিবার। যদিও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

৮) সামজিক মর্যাদা অর্পণমূলক: সামাজিক মর্যাদা অর্পণের ক্ষেত্রে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা মূলত পারিবারিক পরিচিতির দিক থেকে অর্জিত হয় থাকে। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও রয়েছে। মাঝে মাঝে ব্যক্তি তার নিজের পরিচয়েও পরিচিতি লাভ করে।

৯) রাজনৈতিক: পরিবারই সন্তান-সন্ততিকে নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ-কর্তব্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকে। সন্তান-সন্ততিদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা পরিবারের অন্যতম কাজ । পরিবার অধিকার ও কর্তব্যবোধের পাশাপাশি শিশুদের শৃঙ্খলাবোধও শিক্ষা দেয় যা সুনাগরিক হওয়ার জন্য এক অতীব প্রয়োজনীয় গুণ।

১০) সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক: সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবারের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা তার সদস্যদেরকে অসামাজিক কাজ থেকে বিরত রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

১১) সামাজিকীকরণ: পরিবার হলো সামাজিকীকরণের সবচেয়ে বড় বাহন। পরিবার তার শিশু-কিশোরদের সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-প্রথা, রীতি-নীতি তথা সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দান করে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তুলে। আর পরিবারের এরূপ কার্যাবলিকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় সামাজিকীকরণ বলে।

১২) বিনোদনমূলক: মানুষের বিনোদনের অন্যতম জায়গা হলো পরিবার। সারা দিনের কাজ শেষে ক্লান্তি দূর করার জন্য মানুষকে পরিবারের কাছে ছুটে আসতে হয়। পূর্বে গ্রামের পরিবারগুলো কবিগান, পালা গান, যাত্রা, কেচ্ছা-কাহিনী ইত্যাদির আয়োজন করলেও আধুনিক যুগে প্রযুক্তির উন্নয়নে মানুষের বিনোদেনর ক্ষেত্রও বদলে গেছে। বস্তুত, গ্রামীণ সংস্কৃতির উপর নগর সংস্কৃতির প্রভাব এখন খুবই প্রবল।

পরিবারের কার্যাবলির পরিবর্তন ঃ আধুনিক কালে শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগের ফলে পরিবারের কার্যাবলিতে এসেছে নানা পরিবর্তন। আধুনিক শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আয় রোজগারের কারণে আগের চেয়ে পরিবারের দিকে তুলনামূলক কম নজর দিতে পারে। পরিবর্তনশীল এই সমাজে তাই অনেক দায়িত্ব বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে। শিক্ষা, বিনোদন, অর্থনৈতিক উৎপাদন ইত্যাদি কাজগুলো এখন হয়তো পরিবার পর্যায়ে

তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। সে কারণেই অনেকে মনে করেন যে, পরিবার ক্রমশ বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এটা সত্য যে, পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে পরিবারের কার্যাবলির মধ্যে এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। আধুনিক যুগে সামাজিক নানা জটিলতার কারণে ও যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য সমাজের নতুন নতুন চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে পরিবারকে আরও বেশি দায়িত্ব করতে হচ্ছে।

১) শিল্পায়ন ও নগরায়নের ব্যাপক প্রসারের ফলে নানা রকম কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়াতে গ্রামের যৌথ পরিবার থেকে অনেকে নগরে স্থানান্তরিত অণুপরিবার গড়ে তুলছে। যৌথ পরিবার ভাঙ্গনের ফলে পরিবারের কার্যাবলিতে পরিবর্তন এসেছে। জীবিকা নির্বাহের জন্যে অনেকে দেশের বাইরে চাকরি ও ব্যবসা করতে গিয়ে অণুপরিবারে বসবাস করছে। এ জন্যই পরিবারের আকার এবং কাঠামোয় এসেছে পরিবর্তন।

২) জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ, নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণমূলক কাজ পরিবার ছাড়া অন্য কারো পক্ষে করা প্রায় অসম্ভব কেননা অন্য কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দিয়ে কাজগুলো করানো যাবে না। কেননা মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাই শিশুদের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখেন।

৩) শিক্ষা এবং বিনোদনমূলক কাজে পরিবারের ভূমিকাতে আধুনিককালে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এসব কাজ আধুনিক পরিবারগুলো আগের মতো তেমন করছে না। যদিও পরিবারই শিশুর হাতে খড়ি কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কাজটি পরিবারের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়। আমাদের মতো দেশে শিক্ষার অর্থ যোগান, প্রাইভেট শিক্ষক নিয়োগ এবং সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের কাজটি পরিবারই করে।

৫) আধুনিককালে বিনোদনমূলক কাজেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। পরিবারের পক্ষে এককভাবে আর করা সম্ভব হচ্ছে না। আধুনিক সমাজে অনেক বিনোদনমূলক কাজ প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর।

৪) পরিবার আজও শিশু কিশোরদের নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ অর্জনের যে মানসিকতার প্রয়োজন হয় তার ব্যবস্থা করে থাকে। তবে আধুনিককালে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য নানা প্রকার মসজিদ, মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে।

৫) পরিবার ছাড়াও রাজনৈতিক শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের অভাব না থাকলেও নিয়ম-শৃঙ্খলা, অধিকার-কর্তব্য ও নেতৃত্বের মূল ধারণা পরিবারেই দেওয়া হয়ে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**পরিবারের কার্যাবলিগুলোর নাম লিখুন। সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন নির্ণায়কের (ক্ষমতার মাত্রা, বিবাহোত্তর বসবাসের স্থান, বংশ মর্যাদা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, পরিবারের আকার স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন রীতি ইত্যাদি) ভিত্তিতে পরিবারকে বিভক্ত করা হয়েছে। পরিবার গঠনের মৌলিক প্রয়োজন হল ঃ নিয়ন্ত্রিত যৌনসম্পর্ক নির্বাহ করা, সন্তান লাভের বাসনা, উত্তরাধিকার সৃষ্টি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা, বিনোদন, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক তথা জীবনের নিরাপত্তাবোধ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে কোন্ দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

i . পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক

ii. পিতৃবাস ও মাতৃবাস

iii. অনুপরিবার ও বর্ধিত পরিবার

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i ও iii

২। "সমাজের মঙ্গলেই পরিবারকে টিকিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য" এটি কোন মতবাদের কথা?

i. রক্ষণশীল

ii. উদারনৈতিক

iii. চরমপন্থি

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ পরিবারের সাম্প্রতিক প্রবণতা
Recent Trend of Family

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিবারের সাম্প্রতিক প্রবণতা আলোচনা করতে পারবেন;
- পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	যৌথ পরিবার, অণু পরিবার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, পিতৃপ্রধান, মাতৃপ্রধান ইত্যাদি।

পরিবারের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সাম্প্রতিককালে আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার, ধর্ম, বসবাসের স্থান, যথা: গ্রাম, শহর, সমতল ও পাহাড়ি এলাকা, অর্থনৈতিক শ্রেণি ও সামাজিক পদমর্যাদা ভেদে পরিবারের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবী ক্রমশ ব্যাপক শিল্পায়ন এবং নগরায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তবে নগরায়ন যা হয়েছে সে অনুযায়ী শিল্পায়ন হয়নি এবং কর্মক্ষেত্রের সুযোগ যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাও জনসংখ্যার অনুপাতে সামান্য। কেননা অদ্যাবধি বেশির ভাগ লোকই গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। এতদ্সত্ত্বেও শিল্পায়ন ও নগরায়ন পরিবারের কাঠামো ও কর্মকান্ডের উপর নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। যা নিম্নরূপ-

ক) শহরাঞ্চলে প্রধানত অণুপরিবার লক্ষণীয়। এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন: বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারগুলো একসময় যৌথ পরিবার ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সম্পত্তির স্বল্পতা, পেশাগত পরিবর্তন, সম্পত্তির সিলিং নীতি, মানসিকতার পরিবর্তন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশের কারণে যৌথ পরিবারে দ্রুত ভাঙন দেখা দিয়েছে। তবে হিন্দু সমাজে ঐতিহ্যগত কারণে কতক যৌথ পরিবার এখনও বিদ্যমান।

খ) একক বিবাহভিত্তিক পরিবার বর্তমানকালের পরিবার ব্যবস্থার উদাহরণ। তারপরও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, বংশ রক্ষা, গৃহস্থালী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গ্রামীণ ধনী ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে একাধিক বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। শুধু তাই নয় শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে কিছু কিছু বহু-স্ত্রী বিবাহ ভিত্তিক পরিবার লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক শিক্ষিত সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এ সংখ্যা ক্রমশ কমে এসেছে। শহরে যদিও বহু বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে তবে তা অত্যন্ত নগণ্য।

গ) পিতৃপ্রদান পরিবারই সাম্প্রতিককালের পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে আধুনিক শিক্ষার ফলে শহরের কিছু উচ্চ শিক্ষিত ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমতা দেখা যায় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মতামতের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ঘ) মূলত: পিতৃবাস ভিত্তিক পরিবারই হলো আধুনিক পরিবার ব্যবস্থার স্বরূপ। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন: পরিবারে ছেলে সন্তান না থাকলে এবং শুধু মেয়ে সন্তান থাকলে সে পরিবার একটি মেয়েকে এমন একটি পরিবারের ছেলের সাথে বিবাহ দেয়া হয় যে তার স্ত্রীর বাবার বাড়িতে বসবাস করতে আসে। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে মানুষের কর্মস্থলের সুবিধার্থে অথবা ক্যারিয়ারের জন্য, সন্তানদের পড়ালেখার জন্য অনেকেই শহর ও শিল্প এলাকায় বিবাহোত্তর জীবনে নয়াবাস গড়ে তুলে।

ঙ) আধুনিক পরিবারসমূহে মূলত দ্বি-সূত্রীয় নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ পিতৃ এবং মাতৃ উভয় কুলের আত্মীয়দের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সম্পত্তিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উত্তরাধিকার বজায় থাকে।

চ) সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার প্রসার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ, আর্থিক অভাব-অনটন, ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে পরিবারের বন্ধন দ্রুত শিথিল হয়ে পড়েছে, তবে এটা পরিবারের মূল কাঠামোকে এখনও তেমন দুর্বল করতে পারেনি।

ছ) আধুনিককালে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে চাকুরির সুবাদে এবং নগর মানসিকতার কারণে নয়াবাস (Neolocal) পরিবার ব্যবস্থাটি ক্রমশ: জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

জ) নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে সীমিত আয় এবং বাসস্থান সমস্যার কারণে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে অণু পরিবারে রূপ লাভ করছে। তারপরও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকজন পিতা-মাতা বা স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষের লোকজন এসে এসব পরিবারে বসবাস করায় এখানেও যৌথ পরিবারের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ঝ) আধুনিককালে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারে ঐতিহ্যবাহী পিতৃপ্রধান পরিবারের প্রকৃতির ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। যেমন, শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের পরিবারে এখন নেতৃত্ব স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের হাতে ন্যাস্ত থাকে।

ঞ) বর্তমানে শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে মানুষের ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবারের পূর্বেকার কতক দায়-দায়িত্ব আর তেমন পালিত হচ্ছে না। মানুষের ব্যস্ততার কারণে অবসর যাপন, শিক্ষাদান, চিত্তবিনোদন, সন্তান-সন্ততি রক্ষাণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ পরিবারের বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যাস্ত হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালের আধুনিক পরিবারসমূহে কিছু বৈশিষ্ট্যেও পরিবর্তন এসেছে। যেমন:

ক) বিবাহের চুক্তিতে মা-বাবা বা অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস। বিবাহ হলো পরিবার গঠনের ভিত্তি। কিন্তু আধুনিককালে পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণ আগের মতো নেই।

খ) আধুনিককালে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে নারী-পুরুষ দুজনই পরিবারের বাইরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে লিপ্ত। তাই বলা যায় সাম্প্রতিককালে পরিবারে নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে।

গ) আধুনিক পরিবারে নারী সদস্যগণ অধিকতর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এরূপ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আধুনিককালে নারীর দৃষ্টিভঙ্গিকে আগের চেয়ে প্রসারিত করছে। ফলে পরিবারে নারী-পুরুষের মর্যাদা নতুনভাবে নির্ধারিত হচ্ছে।

ঘ) আধুনিক পরিবারের আকার আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে আসছে।

ঙ) আধুনিককালে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, কিন্ডার কার্টেনসহ নানা প্রতিষ্ঠান পরিবারের অনেক কাজের দায়িত্ব নেওয়ায় পরিবারের কার্যাবলি আগের চেয়ে অনেক কমে এসেছে।

পরিবারের ভবিষ্যৎ

একশ বছর আগে পরিবারকে একটি সম্প্রদায় বলে মনে করা হলেও বর্তমানে পরিবারকে একটি সংঘের সাথে তুলনা করা হয়। আগে পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততির পড়া লেখা থেকে শুরু করে দেখাশোনা করতেন। কিন্তু আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ব্যস্ততার মাঝে পিতা-মাতা উভয়কেই অনেক সময় কাজের জন্য ঘরের বাইরে থাকতে হয় বলে পরিবার এখন আর আগের মতো সদস্যদের বিনোদন কেন্দ্র নয়, শিশুদের শিক্ষালয়ও নয়, একটি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও নয়। এসব কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব এখন মাতৃসদন, শিশুসদন, ক্লাব, শিশু নিকেতন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যাস্ত। পরিবারের পূর্বের কার্যাবলিতে অনেক পরিবর্তন আসলেও, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটবে তা বলা যাবে না। নারী পুরুষের জৈবিক চাহিদার বাইরে তাদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার পূরণ করতে পরিবারের প্রয়োজন রয়েছে।

১) রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি: রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যেহেতু পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাই কোনো ধরনের হঠাৎ কিংবা চমকপ্রদ পরিবর্তন মানব সমাজের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না। সুতরাং সমাজের মঙ্গলেই পরিবারকে টিকিয়ে রাখা আবশ্যক।

২) চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি: যেহেতু সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতেও পরিবারকে বিভক্ত করা যায় সেহেতু পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী মনে করেন যে, দলগত বিবাহভিত্তিক যৌথ পরিবারে সম্পত্তিতে সকলের যৌথ মালিকানা ছিল। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার থেকে একক বিবাহভিত্তিক পরিবারের উদ্ভবের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার অবতারণা হয়। পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি মধ্যে যে কোনো একটির বিলুপ্তি অন্যটির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারে। মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য অপরিহার্য। কাল মার্কস ও এঙ্গেলস এর মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হলে ঐ সম্পত্তির মালিক হবে সমাজ, রাষ্ট্র নয়। সাম্যবাদী সমাজে

রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁরা মনে করেন, রাষ্ট্র হলো শোষণের হাতিয়ার। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পরিবার পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি । যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতেই পরিবার টিকে আছে, সেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে পরিবার ব্যবস্থা টিকে থাকবে।

৩) উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি: উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি ক্রিয়াবাদী চিন্তা থেকে। ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজের সকল প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ কার্যাবলি সম্পাদনের ফলে টিকে আছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা তার প্রয়োজন ও ভূমিকার উপর নির্ভর করে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো সমাজের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে না পারে অথবা চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। পরিবারের কাজ যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পাদন করে তাহলে পরিবার লোপ পেয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানগুলো কি পরিবারের সকল কাজ পালন করতে পারবে? যেমন-মাতৃস্নেহের কাজটি কি কোনো প্রতিষ্ঠান দিয়ে করিয়ে নেওয়া সম্ভব? কাজেই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাতেও পরিবারের বিকল্প নেই।

শিক্ষার্থীর কাজ	সাম্প্রতিককালের পরিবারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

পরিবার গঠনে নিয়ামক ও মৌলিক প্রয়োজনগুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পরিবারের কার্যাবলি পরিবর্তনশীল। পূর্বে পরিবারের মধ্যে শিক্ষা, বিনোদন, উৎপাদন ইত্যাদি প্রায় সকল কর্মকান্ড সংগঠিত হত। কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়ন, নগরায়ন তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগের ফলে পরিবারের অনেক দায়িত্ব বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে এবং এর প্রভাব বাংলাদেশের পারিবারিক ব্যবস্থায়ও পড়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন ধরনের একক বিবাহভিত্তিক পরিবারই বর্তমানকালের মূল বিবাহভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা?

i. একক বিবাহভিত্তিক
ii. দ্বৈত বিবাহ ভিত্তিক
iii. দলগত বিবাহভিত্তিক

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i ও iii

২। আধুনিককালে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে কোন ধরনের পরিবার ব্যবস্থা ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে?

i. পিতৃবাস
ii. মাতৃবাস
iii. নয়াবাস

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৬ জ্ঞাতিসম্পর্ক
Kinship

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জ্ঞাতিসম্পর্কের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- জ্ঞাতিসম্পর্কসূচক বিভিন্ন রীতিনীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জ্ঞাতি, মুখ্য, গৌণ, বিবাহভিত্তিক, সগোত্র, রীতিনীতি ইত্যাদি।

জ্ঞাতিসম্পর্ক

সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে নানা জটিল সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। বেঁচে থাকার তাগিদে সমাজের মানুষকে কারো না কারো সংস্পর্শে থাকতে হয়। আর এ ধরনের সম্পর্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো জ্ঞাতিসম্পর্ক।

জ্ঞাতিসম্পর্কের অর্থ: ইংরেজি Kin শব্দের অর্থ জ্ঞাতি আর Kinship শব্দের অর্থ জ্ঞাতিসম্পর্ক। সাধারণত একজন মানুষ যখন রক্ত বা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে কোনো সম্পর্ক গড়ে তুলে তখন তাকে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। তবে ব্যাপক অর্থে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে রক্ত, বিবাহ, বন্ধুত্ব, কাল্পনিক, দত্তক ইত্যাদি সূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ককে নির্দেশ করতে বোঝানো হয়। সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন জ্ঞাতিসম্পর্ক হলো সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার ফল।

জ্ঞাতিসম্পর্কের প্রকার : সাধারণত দু প্রকারের জ্ঞাতিসম্পর্ক হয়ে থাকে। যথা- বিবাহভিত্তিক জ্ঞাতিসম্পর্ক (Affinal Kinship)এবং সগোত্রসূচক জ্ঞাতিসম্পর্ক (Consanguineal Kinship)। বৈবাহিক বন্ধনের সূত্র ধরে যে ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাকে বিবাহভিত্তিক জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। কোনো নারী পুরুষের মধ্যে বিবাহের ফলে শুধু বিবাহিত ঐ নারী পুরুষের মধ্যেই সম্পর্ক তৈরি হয় না বরং নারী এবং পুরুষের দুই পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও সম্পর্ক তৈরি হয়। এক্ষেত্রে শ্যালক, শ্যালিকা, দুলাভাই, ভাবী, দেবর, ভাসুর, ননদ, শ্বশুর, শাশুড়ি ইত্যাদি সম্পর্ক দুই পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, রক্তের বন্ধনের ভিত্তিতে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে যেসব সম্পর্ক গড়ে উঠে তাকে সগোত্রসূচক জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। এক্ষেত্রে চাচা, ছেলে, ভাই, জেঠা, ফুফু, চাচাতো ভাই, চাচাতো বোন, ফুফাতো ভাই, ফুপাতো বোন ইত্যাদি সম্পর্ক। আরো এক ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক আছে, যাকে সামাজিক জ্ঞাতিসম্পর্ক (Social Kinship) বলে। বিবাহিত কোনো সন্তানহীন দম্পতি যদি অন্যের কোনো সন্তানকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে রক্তের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও এক ধরনের সগোত্রসূচক জ্ঞাতিসম্পর্ক তৈরি হয় যাকে বলা সামাজিক জ্ঞাতিসম্পর্ক।

এছাড়াও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের নৈকট্য বা দূরত্বের ভিত্তিতে জ্ঞাতিসম্পর্ককে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- মূখ্য জ্ঞাতি (Primary Kin) এবং গৌণ জ্ঞাতি (Secondary Kin)। মূখ্য জ্ঞাতি হলো স্বামী-স্ত্রী, বাবা- ছেলে, মা- মেয়ে, বাবা- মেয়ে, মা- ছেলে এবং ভাই- বোন। অন্যদিকে গৌণ জ্ঞাতি হলো চাচা/জেঠা-ভাতিজা/ভাতিজি, শ্যালক/শ্যালিকা-দুলাভাই, ননদ/দেবর-ভাবী ইত্যাদি।

জ্ঞাতিসম্পর্কসূচক রীতিনীতি

ক) নিষিদ্ধ জ্ঞাতিসম্পর্ক রীতিনীতি : আমাদের সমাজে কোনো কোনো জ্ঞাতি সম্পর্কে কিছু কিছু বিধি নিষেধ পালন করতে হয়। যেমন-ছেলের বউয়ের সাথে শ্বশুর অথবা মেয়ের স্বামীর সাথে শাশুড়ি, ভাই-বোন এর মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের কারো কারো সাথে দেখা সাক্ষাতও নিষিদ্ধ। যেমন ছেলের বউ-চাচা/মামা শ্বশুর, মেয়ের স্বামী-চাচী/মামী শাশুড়ি। এরূপ সম্পর্ককে নিষিদ্ধসূচক জ্ঞাতিসম্পর্ক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

খ) হাসি-তামাসার জ্ঞাতিসম্পর্ক রীতিনীতি: এ ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হাসি তামাসা-কৌতুক, চিমটি কাটা ইত্যাদি চলে বিধায় এটি নিষিদ্ধ জ্ঞাতিসম্পর্কের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী জ্ঞাতিসম্পর্ক। যেমন- দেবর-ভাবী, শ্যালিকা-দুলাভাই ইত্যাদি এরূপ সম্পর্কের উদাহরণ।

গ) পরোক্ষ জ্ঞাতিসম্পর্কসূচক রীতিনীতি : এরূপ জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কারো সাথে প্রত্যক্ষভাবে কোনো জ্ঞাতিভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে না তুলে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি করে বিধায় একে পরোক্ষ জ্ঞাতিসম্পর্কসূচক রীতিনীতি বলা হয়। উপমহাদেশের সমাজে পরিবারগুলোতে নারীরা তাদের স্বামীরা নাম সরাসরি মুখে না এনে সন্তানের নামের সাথে মিলিয়ে সম্বোধন করে। এক্ষেত্রে পরিবারের বড় সন্তানের নামই বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন- অমুকের বাবা, তমুকের বাবা ইত্যাদি।

ঘ) মাতুলপ্রভাবসূচক রীতিনীতি : আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায় মায়ের ভাইয়ের/মামার সাথে ছেলেমেয়েদের/ভাগিনা-ভাগিনির সুদৃঢ় সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে মামার অবদান ভাগিনা-ভাগিনি জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। কখনো কখনো এ প্রভাব পিতার থেকেও বেশি হয়।

ঙ) ফুফুর সাথে বিশেষ সম্পর্কসূচক রীতিনীতি : কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাবার বোন তার ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের প্রতি অনেক যত্নশীল হওয়ার কারণে এ ধরনের সম্পর্কের রীতিনীতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের জীবনে ফুফুর অবদানকে স্বীকৃত দেওয়া হয়।

সামাজিক নৃবিজ্ঞানীগণ সমাজের জ্ঞাতিসম্পর্ক বিশ্লেষণে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা জ্ঞাতিসম্পর্কের শিথিলতা সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। তবে শিল্পায়িত আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এর প্রভাব আগের তুলনায় অনেক কম। আধুনিক সমাজে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে নগর ভিত্তিক অণু পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠার ফলে এখন জ্ঞাতি আবেদন মানুষের মাঝে কম। এছাড়াও নব্যবাস বিবাহ প্রথার কারণে এমনটি বেশি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জ্ঞাতিসম্পর্কের সংজ্ঞা লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

রক্ত, বিবাহ, বন্ধুত্ব, কাল্পনিক, দত্তক ইত্যাদি সূত্রে আবদ্ধ জীবনযাপন করে কোন সম্পর্ক গড়ে তুলে তখন তাকে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। জ্ঞাতিসম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন-বিবাহভিত্তিক, সগোত্রসূচক, মূখ্য, গৌণ ইত্যাদি। তবে জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রীতিনীতি অনুসরণ করা হয়

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Kin' অর্থ কী ?
i. জ্ঞাতিসম্পর্ক
ii. জ্ঞাতি
iii. জাতি
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i ও ii

২। সাধারণত জ্ঞাতসম্পর্ক কত প্রকারের?
i. দুই
ii. তিন
iii. চার
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয় কিসের মাধ্যমে?
(ক) পরিবারের মাধ্যমে
(খ) বিবাহের মাধ্যমে
(গ) সমাজের মাধ্যমে
(ঘ) জ্ঞাতি সম্পর্কের মাধ্যমে

২। পিতৃবাস পরিবারে নব বিবাহিত দম্পতি কোথায় বাস করে?
(ক) মাতার বাড়িতে
(খ) স্ত্রীর পিতার বাড়িতে
(গ) স্বামীর পিতার বাড়িতে
(ঘ) স্বামীর মাতার বাড়িতে

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩। জ্ঞাতিসম্পর্ক স্থাপিত হয়-
i. ধর্মের মাধ্যমে
ii. বিবাহের মাধ্যমে
iii. রক্ত সম্পর্কের মাধ্যমে
সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

ড. শফিক ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তাঁর বন্ধুকে বললেন যে, ছোটবেলায় তাঁরা তাদের গ্রামের বাড়িতে সকল কাজিন মিলে খুব মজা করতেন। একসাথে খাওয়া, গোসল, পড়াশোনা সবই চলতো। তাঁদের রান্না-বান্না একই হাড়িতে হতো। কিন্তু একসময় শফিকের বাবা চাকুরির সুবাদে বদলি হয়ে শফিক, তাঁর ছোট বোন মাকে নিয়ে একটি নতুন শহর এলাকায় বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের বাসায় চাচা, মামা এবং এদের ছেলে মেয়েদের আনাগোনা ছিল। তবে ছুটিতে সকল আত্মীয়-স্বজন গ্রামের বাড়িতে এক সাথে আনন্দ করতো।

১) পরিবার কী? ১
২) যৌথ পরিবার বলতে কী বোঝেন? ২
৩) উদ্দীপকের আলোকে জ্ঞাতি সম্পর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন। ৩
৪) উপরের উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে কোন কোন ধরনের পরিবার ব্যবস্থা দেখা যায়? আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৫.১ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৫.২ ঃ ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৫.৩ ঃ ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৫.৪ ঃ ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৫.৫ ঃ ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৫.৬ ঃ ১। খ ২। ক

সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ
Influential Factors of Social Life

ইউনিট ৬

পরিবর্তনশীল মানব সমাজে নানা রকম উপাদান প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ, নির্দিষ্ট সমাজের সংস্কৃতি, গোষ্ঠীগত ভাবনা ও বংশগতির প্রভাব অন্যতম। এসব উপাদান কখনো এককভাবে আবার কখনো অন্য উপাদানের সহযোগী হয়ে সমাজ পরিবর্তনে প্রভাবশালী হয়ে উঠে। কেননা এসব উপাদানসমূহ একটি অপরটির সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে মানুষের খাপ খাওয়াতে সাময়িক অসুবিধা হলেও অবশেষে তা পারে। শুধু সমাজজীবন নয়, মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবেশ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। যদিও মানুষ পরিবেশের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে তথাপি কখনো কখনো পরিবেশ দ্বারাও মানুষের জীবনযাত্র বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজজীবনে মানুষের সব রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, নিয়ম-শৃঙখলা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, জীবনাচরণ ইত্যাদি সব কিছুই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন সমাজ জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নদী ভাঙ্গনের ফলে মানুষের সামাজিক জীবন বিপন্ন হয়, মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বসতি গড়তে বাধ্য হয়। আবার আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব বর্তমান সময়ে সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৬.১: সমাজজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব
পাঠ- ৬.২: সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব
পাঠ- ৬.৩: সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব
পাঠ- ৬.৪: সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব

পাঠ-৬.১ সমাজজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব
Impact of Geographical Environment on Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভৌগোলিক পরিবেশ, সমাজ, জলবায়ু, অঞ্চল, অস্তিত্ব, প্রভাব ইত্যাদি।

ভৌগোলিক পরিবেশ হলো ভূ- প্রকৃতি, জলবায়ু, মাটির উর্বরতা, সমতল ভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী নিবিড় অরণ্য এবং মরুভূমির সামগ্রিক অস্তিত্ব। প্রাকৃতিক পরিবেশই সাধারণত নানাবিধ ভৌগোলিক উপাদানের মাধ্যমে গঠিত। সব ভৌগোলিক উপাদানের বৈচিত্র্যের কারণেই পৃথিবীর নানান দেশের সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং মানুষের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে অসম অগ্রগতি পরিলিক্ষিত হয়। ভৌগোলিক উপাদান এমনই শক্তিশালী যে, এর ভিত্তিতে সমাজচিন্তাবিদরা সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি বিকাশ ও বিলুপ্তির পেছনে ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিককালের সমাজ দার্শনিকরা সমাজজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাবকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন।

ভৌগোলিক মতবাদে গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এরিস্টটলের মতে, অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে প্রাচীনকালে গ্রীকরা নানাক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেছেন। ব্যাকন ও হান্টিংটন মানব সমাজে ভৌগোলিক প্রভাবের উপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন এবং যা ভৌগোলিক যা নিয়ন্ত্রণবাদ নামে পরিচিত।

মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ হান্টিংটন দেখিয়েছেন যে, জলবায়ু মানুষের কর্মকান্ডকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর মতে, অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবেই উত্তর অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। ব্যাকন বলতে চেয়েছেন, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে ও বিকশিত হয়। ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কু বলেছেন মানুষের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য।

ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের চিন্তা চেতনা, পরিকল্পনা, কাজকর্ম ও আচার-আচরণকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ শীত প্রধান অঞ্চলের মানুষ দৈহিকভাবে শক্তিশালী ও সাহসী হয়ে থাকে। আবার উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলের মানুষ ঠিক তার বিপরীত কর্ম বিমুখ ও অলস প্রকৃতির হয়ে থাকে। ভৌগোলিক উপাদানের ভিন্নতার কারণেই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার ধরনও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে ও অগ্রগতির মাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে সত্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রকৃতির কাছে আজও অসহায়। সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে। মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানব বসতিকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ২০১৫ সালে নেপালে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। পূর্বাভাস ও সাধারণ সর্তকতার মাধ্যমে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো ছাড়া প্রকৃতির খেয়ালীপনা সর্বদাই মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়ে গেছে।

বস্তুতপক্ষে, মানবজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে মানুষ কোনো ক্রমেই অস্বীকার করতে পারে না। মানবজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১) প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং ২) পরোক্ষ প্রভাব

প্রত্যক্ষ প্রভাব

১) সভ্যতার বিকাশ: এ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী গোল্ডেন ওয়েজার বলেন, মানুষ কী ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলবে প্রাকৃতিক পরিবেশ তার রূপরেখা প্রদান করে, যেমন মরু প্রদেশ এবং উষ্ণ মন্ডলের ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব জীবনযাত্রাও যে সেসব অঞ্চলে ভিন্ন হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। উষ্ণ মন্ডলের লোকদের পক্ষে এস্কিমোদের মত তুষার ঘর তৈরী

করা সম্ভব নয়, আবার ইন্দোনেশিয়াতে উষ্ণমন্ডলজনিত কারণে দেখা যায় নারিকেল গাছ বেশি জন্মে। তাই এই নারিকেলের উপর ভিত্তি করে সেখানে গড়ে উঠেছে নারিকেল সংস্কৃতি । কিন্তু এস্কিমোরা ইচ্ছে করলেই নারিকেল সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারবে না। অন্যদিকে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ অনুকূল হবার ফলে সেখানে গড়ে উঠেছে ধ্রুপদী সভ্যতা।

২) কর্ম প্রতিভার বিকাশ: অনেক সময় অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের ফলে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাই কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, "ভৌগোলিক পরিবেশের সুতিকাগারই মানুষের কর্ম প্রতিভার বিকাশের সর্বোত্তম ক্ষেত্র।" কারণ এখানেই মানুষ আপন ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করার সুযোগ পায়।

৩) শিল্পের উপর প্রভাব: বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশে তথা মাটি, জলবায়ু ও তাপমাত্রার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয়। যেমন:বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বিধায় সেখানে চা-শিল্প গড়ে উঠেছে। একইভাবে সিলেটে কমলা উৎপন্ন হয়, বরিশালে বিপুল পরিমাণ ধান জন্মে, রাজশাহী ও কুষ্টিয়ায় অনেক আম পাওয়া যায়। বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন ও তীব্রতর বন্যা, জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়েছে এবং তা উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে।

৪) পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাব: ভৌগোলিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন স্থানে নানা পেশার লোক দেখা যায়। যেমন-যেখানে খনি আছে সেখানে খনিশ্রমিক, শিল্প এলাকায় শিল্প শ্রমিক এবং কৃষি প্রধান এলাকায় কৃষিশ্রমিক বেশি দেখা যায়।

৫) যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রভাব: ভৌগোলিক বৈচিত্র্য একটি দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে । এক মহাদেশের সঙ্গে অন্য মহাদেশের এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। যেমন- খাইবার গিরিপথ ও সুয়েজখাল পাশ্ববর্তী দেশসমূহে বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করেছে। সাম্প্রতিককালে নির্মিত বঙ্গবন্ধু (যমুনা বহুমুখী) সেতু (যা দক্ষিণ এশিয়ায় দীর্ঘতম) শুধু বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগকেই সুগম করে নি বরং এটি বাংলাদেশকে সমগ্র এশিয়া মহাদেশের সাথেও স্থলপথে সংযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

৬) কুটির শিল্পের উপর প্রভাব: কুটির শিল্পের উপরও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট। যেসব অঞ্চলে যে ধরনের কাঁচামাল বেশি উৎপন্ন হয় কিংবা সহজলভ্য সেসব অঞ্চলে ঐ কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে কুটির শিল্প গড়ে উঠে । যেমন: রাজশাহীতে প্রচুর তুঁতগাছ জন্মানোর কারণে সেখানে রেশমী শাড়ীর জন্য বস্ত্রমিল গড়ে উঠেছে, তেমনি সিলেট বেত শিল্পের জন্য এবং পাবনা তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

৭) পোষাক পরিচ্ছদের উপর প্রভাব: পোশাক পরিচ্ছদও ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। শীত প্রধান অঞ্চলে মোটা কাপড় বা গরম পশমী এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষ হালকা সূতির কাপড় ব্যবহার করে ।

৮) ঘরবাড়ির উপর প্রভাব: ভৌগোলিক পরিবেশের উপর ঘর বাড়ি তৈরির নমুনা নির্ভর করে। বাড়ি ঘর তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। যেমন-বাঁশ, কাঠ , ছন, খড়, ইট ইত্যাদি ভৌগোলিক উপাদনের প্রভাবধীন। যে অঞ্চলে ভূমিকম্প বেশি হয় সেখানে কাঠের দ্বারা বাড়ি ঘর তৈরি করে ,আবার তুষার অঞ্চলের লোকেরা অর্থাৎ এস্কিমোরা তুষার ঘর তৈরি করে।

৯) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাব: শিল্প, সাহিত্য ও প্রযুক্তির সৃষ্টির পেছনেও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন: জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বারবার প্রকৃতির কথা ফুটে উঠেছে। তিনি প্রাকৃতির সৌন্দর্য্যের কারণেই বাংলাদেশকে 'রূপসী' বাংলা কলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার পাহাড়ী অঞ্চলের গানের সুর ভাটিয়ালী সুর থেকে আলাদা। ভৌগোলিক পরিবেশ-নির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্থাই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের রূপরেখা রচনা করে।

১০) আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রভাব: সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে মানুষের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের সমাজে যে সকল আচার- অনুষ্ঠান মেনে চলা হয় সেসব ইউরোপের দেশগুলোর আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে ভিন্ন। এক বিশেষ ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে বাঙালি সমাজে আড্ডা, দুপুরে ঘুমান, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া এবং শীতের পিঠা উৎসব এক একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য।

বিয়ের সময় গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান এবং অতিথি আপ্যায়ন পান-সুপারীর ব্যবস্থার অস্ট্রিক জাতিভুক্ত বাঙালির অন্যতম সামাজিক বৈশিষ্ট্য , যার পিছনে অনুকূল ভৌগোলিক উপাদান ক্রিয়াশীল।

১১) ব্যক্তিগত আচরণ ও দক্ষতার উপর প্রভাব: জলবায়ু ও তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে মানুষের আচরণেও ভিন্নতা দেখা যায়। গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের মানুষ অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ক্ষুধা বেশি লাগে, মেজাজী হয় এবং ঐ অঞ্চলের মানুষের ঘুমের মাত্রা অত্যাধিক। অন্যদিকে, শীত প্রধান অঞ্চলে মানুষের ঘুম কম হয় এবং তারা বেশি পরিশ্রমী হয়।

১২) ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব: ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের ব্যক্তিত্বকেও প্রভাবিত করে। এই কারণেই জাতীয় চরিত্র বলে একটি কথা চালু রয়েছে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, এক এক দেশের মানুষের মৌলিক ব্যক্তিত্ব এক এক ধরনের। যেমন: বাংলাদেশের মানুষ বেশি আবেগ প্রবণ, সমতল ভূমির মানুষ ধীর ও শান্ত হয় এবং পাহাড়ী মানুষ হয় কর্মঠ এবং হিংস্র, সমুদ্র এবং নদীপ্রধান অঞ্চলের লোকেরা সাহসী হয়। কারণ তারা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখিন হয়ে থাকে।

১৩) বনায়ন ও বন উজাড়করণ: বর্তমান পৃথিবীতে বনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং তা আবহাওয়ায় বিরূপ প্রভাব ফেলছে। পৃথিবীর সর্বত্র বনভূমির পরিমাণ কমে যাওয়ার পেছনে গরীবদেরকে দায়ী করা হলেও ধনীরা কোন অংশে কম দায়ী নয়। গরীব মানুষেরা টিকে থাকার প্রয়োজনে বন থেকে গাছ পালা কেটে ফেলছে। বিখ্যাত আমাজন ফরেষ্ট এর সীমানা ছোট হয়ে আসছে। পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ ম্যাগ্রোভ বন নামে পরিচিত সুন্দরবনকেও আমরা রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছি। এগুলো আঞ্চলিক আবহাওয়াতে বিরূপ প্রভাব তৈরি করছে। বনায়নের চেষ্টা কোথাও কোথাও পরিলক্ষিত হলেও বনধ্বংস করা হচ্ছে।

১৪) বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন: জলবায়ু পরিবর্তন হলো আবহাওয়ার সেসব উপাদান রয়েছে সেসব উপাদানের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন সাধিত হওয়া। যেমন: বন্যা, জলোচ্ছাস। অতিবৃষ্টি আগেও হতো কিন্তু বর্তমান সময়ের যত এত বেশি এবং ক্রমশ তীব্রতর অবস্থায় ছিলো না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই এমন হয়েছে। শিল্প কারখানা ব্যাপক বিস্তৃতি এবং প্রযুক্তির ব্যাপকভাবে ব্যবহারের ফলে বিশ্বের তাপমাত্রায় পরিবর্তন ঘটেছে এবং ক্রমই বায়ুমন্ডল উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হচ্ছে। এর ফলে মেরু এলাকার বরফ ধীরে ধীরে গলছে যার পরিণতি হিসেবে আমরা দেখি উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে এবং ঘন ঘন বন্যা, উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি তীব্রতর হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে চলেছে।

পরোক্ষ প্রভাব

১) রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব: রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মন্টেস্কু বলেন যে, পৃথিবীর কৃষি প্রধান অঞ্চলে অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, আর বাণিজ্যপ্রধান এলাকা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। সে কারণে ইউরোপের শীত প্রধান অঞ্চলের শহরগুলোকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্র গড়ে উঠেছে ।

২) অপরাধ প্রবণতার উপর প্রভাব: অনেকে মনে করেন যে অপরাধ প্রবণতার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক প্রভাব কম বেশি দায়ী। অপরাধ বিজ্ঞানীদের মতে অপরাধ প্রবণতা, যেমন: খুন, জখম, চুরিসহ বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সমতল অঞ্চলের তুলনায় পাহাড়ী অঞ্চলে বেশি। কারণ অপরাধ করে সহজেই পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা যায়। বাংলাদেশে জুন ও ডিসেম্বর মাসে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়, কারণ জুন মাসে বাংলাদেশের চাষীরা পাট বিক্রি করে এবং হাতে নগদ টাকা আসে। অন্যদিকে, ডিসেম্বর মাসের লম্বা রাত সিদেল চুরির জন্য ধুবই উপযোগী।

৩) জৈবিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাব: মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্যের উপরও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের লোকেরা কম বয়সে বয়োপ্রাপ্তঃ হয় আর শীত প্রধান দেশের লোকেরা বেশি বয়সে বয়োপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে জন্মহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

৪) নীতিবোধের উপর প্রভাব: মানুষের নীতিবোধের উপরও ভৌগোলিক প্রভাব দেখা যায়। গো-রক্ষা ভারতীয় হিন্দুদের ধর্মের একটি অন্যতম অংশ। তাই সে সমাজে গো-হত্যা মহাপাপ বলে গণ্য। প্রাচীনকালে যখন ভারতে কৃষি অর্থনীতির বিকাশ ঘটে তখন কৃষি উৎপাদনের জন্য গরুর প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। আবার মরু অঞ্চলে অতিথি পরায়ণতা একটি বিশেষ নীতিধর্ম। মরু অঞ্চলে প্রচন্ড গরমে যাতায়াতের সময় ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে হয়। তাই সেখানকার মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে অপূর্ব আতিথেয়তাবোধ। আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবেশজনিত কারণে আরবের সংস্কৃতিতে আতিথেয়তা একটি নীতিবোধ হিসেবে আখ্যায়িত।

৫) সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা: ভৌগোলিক কারণে যেসব অঞ্চলে দুর্যোগ বেশি হয় সেখানকার সামাজিক নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

পরিশেষে বলা যায় সমাজ ব্যবস্থা , মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আচার- অনুষ্ঠানে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বিদ্যমান। তাই মানুষের জীবনে যে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে তা অনস্বীকার্য। আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হলেও মানুষ এখনো প্রকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় নি। ভৌগোলিক পরিবেশ এখনও মানুষের সমগ্র জীবন ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। আর মানুষ তার ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে সংহতি রক্ষা করে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে চলেছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজ জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক উপাদানের বৈচিত্র্যের কারণেই পৃথিবীর নানান দেশের সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং মানুষের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে অসম অগ্রগতি পরিলিক্ষিত হয়। ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের চিন্তা চেতনা, পরিকল্পনা, কাজকর্ম ও আচার আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মানবজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে মানুষ কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারে না। মানবজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রত্যক্ষ প্রভাব ও পরোক্ষ প্রভাব। আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হলেও মানুষ এখনো প্রকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি। ভৌগোলিক পরিবেশ এখনও মানুষের সমগ্র জীবন ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানব জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায় ?

(ক) দুই ভাগে (খ) তিন ভাগে

(গ) চার ভাগে (ঘ) পাঁচ ভাগে

বহুনির্বাচনী :

২। কোনটি পরোক্ষ প্রভাবের সাথে জড়িত ?

(i) নীতিবোধ

(ii) শিল্প

(iii) অপরাধ প্রবনতা

(ক) i (খ) i + ii (গ) ii + iii (ঘ) i + iii ।

পাঠ-৬.২ সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব
Impact of Culture on Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সমাজজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরিবেশ, সংস্কৃতি, সমাজ, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট চ্যানেল, প্রভাব ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের মতে, 'মানব সৃষ্ট সব কিছুই সংস্কৃতি'। অর্থাৎ মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে তাই সংস্কৃতি। ব্যাপক অর্থে মানুষের ভাবধারা, বিশ্বাস, নীতিবোধ, আইন, ভাষা এবং মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এমন কি বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যে সকল কৌশল অবলম্বন করে সে সব কিছুর সমষ্টি হল সংস্কৃতি। মানুষ ও মানুষের সমাজ এই সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়।

মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ তার সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তির জীবনে এই সংস্কৃতির প্রভাব কখনো অবচেতন, আবার কখনো সচেতন ভাবে কাজ করে। ব্যক্তি তাই সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে চেষ্টা করে। সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের অন্যতম গুরুপ্তপূর্ণ উপাদান হিসেবে সাংস্কৃতিক উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে, সমাজজীবনকে যে সকল উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তার মধ্যে সংস্কৃতি অন্যতম।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

সংস্কৃতি বলতে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী মানব-সৃষ্ট সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত উপকরণকে বুঝিয়ে থাকেন। মানব সংস্কৃতির দুটি দিক আছে ক) পার্থিব (Material) এবং খ) অপার্থিব (Non material)। তবে সংস্কৃতি বলতে সাধারণ সমাজের সুকুমার শিল্প ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অবদানকে বোঝানো হয়ে থাকে।" অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলা প্রভৃতি সূক্ষ শিল্প কর্মকে বোঝায়।

নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা যে অর্থে সংস্কৃতিকে বুঝিয়েছেন তা সংস্কৃতির প্রচলিত সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্নতর। সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি হল মানুষের চিন্তা ও কর্মের একটা সার্বিক রূপ। মানুষের জীবনে পরিপূর্ণ প্রকাশই হচ্ছে সংস্কৃতি। মানুষের সমাজজীবনকে যে চারটি মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে তার মধ্যে সংস্কৃতি অন্যতম। সংস্কৃতি সব সময়ই সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে।

প্রথমেই আমরা বলতে পারি যে, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের সংস্কৃতি গড়ে উঠে, যা তার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। একজন মানুষ প্রথমত তার পরিবারের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরে মানুষের উপর তার সমাজের প্রভাব পড়ে। একথা আমরা সকলেই জানি যে, একটি সমাজের সংস্কৃতিতে যেসব বিষয় শালীনতাপূর্ণ আচরণ বলে গণ্য সেই একই আচরণ অন্য সমাজের সংস্কৃতিতে নিন্দিত হতে পারে। যেমনঃ বড়দের সামনে সিগারেট খাওয়া পাশ্চাত্য সমাজে এমন কিছু গর্হিত কাজ বলে মনে করা হয় না। কিন্তু গুরুজনের সামনে সিগারেট খাওয়া আমাদের সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এভাবেই সংস্কৃতি প্রতিনিয়তই মানুষের সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। প্রত্যেক মানুষেই একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশের মাঝে জন্মগ্রহণ করে। ম্যাকাইভার বলেন, "মানুষ কখনো কখনো সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃতিই মানুষকে প্রভাবিত করে।" এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, কোনো মানব শিশু যদি মানব সমাজের সংস্কৃতি বহির্ভূত পরিবেশে বড় হয়, তাহলে তার আচার আচারণ মানুষের মত না হওয়াই স্বাভাবিক।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সমাজজীবন

বর্তমানে আমরা তথ্যের এক দারুন যুগে বাস করি। একবিংশ শতকের প্রথমাংশে তারবিহীন প্রযুক্তিগত যোগাযোগের যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তীব্র গতি এনে দিয়েছে। এই প্রযুক্তি যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে দিয়েছে যে, আমরা এখন সহজেই বলতে পারি যে, বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ এখন ইন্টারনেটের কল্যাণেই পরস্পর যুক্ত হবার এ অভিনব সুযোগ পেয়েছে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত আমাদের সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের যোগাযোগ বোঝাতে প্রায়ই 'নেটওয়ার্ক সোসাইটি' প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। নেটওয়ার্ক সোসাইটি বলতে বোঝায় এমন একটি সমাজ যেখানে মানুষজন সবাই প্রযুক্তিগত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভ্যস্ত এবং পারস্পরিক সার্বক্ষণিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

ডিজিটাল প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে আমাদের দেশেও এর একটা বড় প্রভাব পড়েছে। গত এক দশকে যে পরিমাণে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে তা বিগত দশকে কেউ কল্পনাও করতে পারত না। অফিস আদালত থেকে শুরু করে নিত্যপণ্যের বাজার, পারিবারিক সম্পর্ক পর্যন্ত অনেক কিছুই এখন ডিজিটাল প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট নির্ভর। ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস্‌এ্যাপ, ইউটিউব এসবের নাম জানেনা এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। শুধু তাই নয় ইন্টারনেটের বিস্তৃতি এখন গ্রামীণ সমাজেও পরিবর্তন আনছে উল্লেখযোগ্য গতিতে।

সমাজের সদস্যদের আচার-আচারণে, নৈতিকতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে, মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়। আধুনিক স্যাটেলাইট ভিত্তিক আকাশ সংস্কৃতির যুগে নানান দেশের সংস্কৃতিগত ধারণা মানুষ গ্রহণ ও চর্চা করছে। বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির এ বৈশ্বিক প্রবণতা থেকে বাদ পড়ে নি। স্যাটেলাইট কেন্দ্রিক এই যে সংস্কৃতির সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা-একে বলা হয় সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন।

টেলিভিশনের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং শত শত স্যাটেলাইট চ্যানেলের কল্যাণে বাংলাদেশে বসেই আমরা বিশ্বের নানান দেশের টিভি চ্যানেল উপভোগ করার সুযোগ পাই। এসব থেকে ঐসব দেশের ভাষা, আচরণ, মনোভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাপন তথা সামগ্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে থাকি, কখনো সজ্ঞানে কখনো বা অজান্তেই। এসব থেকে যেগুলো আমাদের কাছে উপভোগ্য মনে হয়, সেগুলোকে আমরা গ্রহণ করি। সেসব সংস্কৃতির কোনো বিশেষ উপাদান আমাদের জীবনযাত্রাকে আরো সহজতর ও উপভোগ্য করবে বলে যদি আমরা মনে করি তবে আমরাও ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ করতে চেষ্টা করি। উদাহরণস্বরূপ, কমিউনিটি সেন্টার কেন্দ্রিক বিয়ে ব্যবস্থা বাঙালি সংস্কৃতিতে কখনোই ছিল না। অন্য সংস্কৃতির এই ধারণা আমাদের কাছে (বিশেষত নগর সমাজ ব্যবস্থায়) সহজতর মনে হওয়ায় আমরা একে গ্রহণ করেছি। এভাবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ভাষা, পোষাক, আচরণ, ভাবনার ধরণ, যোগাযোগের ব্যাপ্তি, উৎসব উৎযাপনের ধরণ ইত্যাদি সংস্কৃতির নানা উপাদান নিত্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

সাধারণত তারুণ্য এসব ভিন্ন সংস্কৃতিকে পছন্দ করে বেশি, এর মূল কারণ হলো বয়সের কৌতুহল। তবে সময়ের ব্যবধানে সব বয়সের মানুষেরাই স্যাটেলাইট সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চলছে। স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে এই যে সংস্কৃতির পরিবর্তন তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার প্রভাবই রয়েছে। ইতিবাচক প্রভাবের মধ্যে আমাদের জীবনযাত্রায় গতি এসেছে, আমাদের উৎসবের উদযাপন এখন অনেক বৈচিত্র্যময়। অন্যদিকে, নেতিবাচক প্রভাবের মধ্যে অপরাধের বিস্তার, অপরাধের ধরণে নানামুখী জটিল প্রযুক্তির ব্যবহার, সামাজিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে নানামুখী সন্দেহ ও জটিলতার সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	**সমাজ জীবনে স্যাটেলাইট চ্যানেলের প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মানুষের সমাজজীবনকে যে চারটি মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে তার মধ্যে সংস্কৃতি অন্যতম। সংস্কৃতি সবসময়ই সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের সংস্কৃতি গড়ে উঠে, যা তার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। একজন মানুষ প্রথমত তার পরিবারের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরে মানুষের উপর তার সমাজের প্রভাব পড়ে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত আমাদের সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের যোগাযোগ বোঝাতে প্রায়ই 'নেটওয়ার্ক সোসাইটি' প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। নেটওয়ার্ক সোসাইটি বলতে বোঝায় এমন একটি সমাজ যেখানে মানুষজন প্রযুক্তিগত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভ্যস্ত এবং পারস্পরিক সার্বক্ষণিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। ইন্টারনেটের বিস্তৃতি এখন গ্রামীণ সমাজেও পরিবর্তন আনছে। টেলিভিশনের ব্যাপক বিস্তৃতি এবং শতশত স্যাটেলাইট চ্যানেলের কল্যাণে বাংলাদেশে বসেই আমরা বিশ্বের নানান দেশের টিভি চ্যানেল উপভোগ করার সুযোগ পাই। এভাবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ভাষা, পোষাক, আচরণ, ভাবনার ধরণ, যোগাযোগের ব্যাপ্তি, উৎসব উদযাপনের ধরণ ইত্যাদি সংস্কৃতির নানা উপাদান নিত্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংস্কৃতির দিক কয়টি ?

(ক) তিনটি (খ) দুইটি

(গ) পাঁচটি (ঘ) চারটি

২। 'নেটওয়ার্ক সোসাইটি' প্রত্যয়টি যুক্ত হয়েছে কিসের মাধ্যমে ?

(ক) স্যাটেলাইট চ্যানেল (খ) ফেসবুক

(গ) ইন্টারনেট (ঘ) ইউটিউব

পাঠ-৬.৩ সমাজজীবনে গোষ্ঠীর প্রভাব
Impact of Group on Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- গোষ্ঠীর সংজ্ঞা ও ধরন বলতে পারবেন;
- সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক গোষ্ঠী, সমাজ, আন্তরিকতা, মুখ্য ও গৌণ দল, ব্যক্তিত্ব, প্রভাব ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

মানুষ সহজাতভাবেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পছন্দ করে। এ কারণে সমাজে বসবাসের সময় মানুষ ছোট বড় বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তার সামাজিক জীবনকে উপভোগ করে। মানুষ একই সাথে একাধিক দল বা গোষ্ঠীর সাথে তার সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখে। এসব সামাজিক সম্পর্ক ব্যক্তি জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

সামাজিক দল হলো দুই এর অধিক যে কোনো সংখ্যক মানুষের সমন্বয়ে সৃষ্ট গোষ্ঠী যারা কোনো না কোনো কারণে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। দলের আকার খুব ছোট বা অনেক বড় হতে পারে। মাত্র দুজন থেকে একটা দেশের সমগ্র জনসংখ্যা পর্যন্ত একটি দল হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

সামাজিক দলের অন্যতম একটি শ্রেণিকরণ করেছিলেন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী সি. এইচ কুলি। তাঁর মতে, সামাজিক দল বা গোষ্ঠী দু রকম-প্রাথমিক বা মুখ্য দল এবং গৌণ দল।

কুলির মতে, প্রাথমিক বা মুখ্যদলের সদস্যদের মধ্যে খুব আন্তরিকতা বিরাজ করে। তাদের মধ্যে দৈনন্দিন আন্তঃসম্পর্ক ঘটে থাকে। সদস্যদের মধ্যে একটা নিজস্ব ও বিশ্বস্ত সম্পর্ক বিরাজ করে যা দীর্ঘ সময় অবধি ভালভাবে টিকে থাকে। তারা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয় এবং নিজেদের মধ্যে আবেগী সম্পর্ক বজায় রাখে। অর্থ্যাৎ এই দলের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগ ও আন্তরিকতা উভয়ই দারুণভাবে কাজ করে। উদাহরণসরূপ, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এ ধরণের সম্পর্ক কাজ করে বিধায় তা মুখ্য দল।

পক্ষান্তরে গৌণ দল এমন কিছু ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যাদের মধ্যে আন্তরিকতা সামান্যই থাকে। এদের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগ প্রায় থাকে না বললেই চলে। গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক হলো কাজ ভিত্তিক বা কাজের সম্পর্ক। তাদের মধ্যে সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। যেমন: হাই স্কুল পাসের পর কেউ যখন কোনো দোকানে চাকরি নেয় তখন দোকানের বাকি কর্মীদের সাথে ব্যক্তির কাজের সম্পর্কই থাকে, অন্য কিছু নয়।

সমাজজীবনে গোষ্ঠীর প্রভাব

সমাজবিজ্ঞানে মুখ্য ও গৌণ দলের পাশাপাশি আরো একটা দল গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়। এটি হলো রেফারেন্স দল। একজন ব্যক্তি বা একটি দলকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে অন্য যে একটি দলের উল্লেখ করে তুলনা করা হয় সেই 'অন্য' দলটিই হলো রেফারেন্স দল। রেফারেন্স দলের উল্লেখ করাই হয় মূলত একটি দলের গুণগত বৈশিষ্ট্য তুলনা করার জন্য। এতে দলের গুণগত ঘাটতি হলো নাকি অগ্রগতি হলো তা ভালভাবে বোঝা যায়। এতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার কাজে প্রেরণা পায় এবং অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে।

ব্যক্তির সামাজিক জীবনে যে সকল দল বা গোষ্ঠীর প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় থাকে এবং সেগুলোর ভিত্তিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন ও সামাজিক জীবন আবর্তিত হয় সেগুলোকে এখানে তুলে ধরা হলো–

১) পরিবার

সামাজিক উপাদানের মধ্যে পরিবারই প্রধান। মানব শিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবারকে কেন্দ্র করেই জীবন অতিবাহিত হয়। পরিবারই হচ্ছে সমাজ জীবনের প্রাণকেন্দ্র। পরিবারের মাধ্যমেই শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়। পরিবারে পিতামাতাই হয় শিশুর প্রথম সাথী, বন্ধু এবং প্রতিপালক তাই পিতামাতার আচরণ ব্যবহার তথা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে।

শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম পর্যায়ে পরিবারই হচ্ছে একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিবারই ব্যক্তির অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গন। পরিবারই স্নেহ-ভালবাসা, প্রথা, আচার-ব্যবহার এবং নিয়ম-শাসনের মধ্য দিয়ে একটি শিশুর জীবন পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়। তাই বলা হয় পরিবারই শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির, সমাজের প্রতি ব্যক্তির, প্রতিবেশির প্রতি ব্যক্তির আচার ব্যবহার কী হবে, তার শিক্ষা জীবন, তার সামাজিক জীবন কীভাবে গড়ে উঠবে এসব কিছুর জ্ঞান সে প্রাথমিকভাবে পরিবার থেকেই আয়ত্ত করে। বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব কী হবে তাও সে পরিবার থেকেই অর্জন করে। সর্বোপরি একজন মানুষের সার্বিক ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক গুণাবলি পারিবারিক পরিবেশে বিকশিত হয়। পারিবারিক কাঠামো বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যেমন:যৌথ পরিবার ও একক পরিবার। আবার ধনসম্পদ, শিক্ষা ও পেশার ভিত্তিতে আমরা পরিবারকে শিক্ষিত পরিবার, ধনী পরিবার, মধ্যবিত্ত পরিবার, গরীব পরিবার, ব্যবসায়ী পরিবার, কৃষক পরিবার, শ্রমিক পরিবার প্রভৃতি রূপে চিহ্নিত করতে পারি। যে ধরনের পরিবারই হোক না কেনো সংশ্লিষ্ট পরিবারে শিশুরা সেভাবেই গড়ে উঠবে। পরিবার ব্যক্তির উপর সামাজিকীকরণ ধরে প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তি যদি ধর্মীয় মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে ধর্মীয় মতাদর্শের অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে পারে।

২) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সমাজবিজ্ঞানে ধর্মকে একটি প্রতিষ্ঠান বল হয় মানব সমাজের প্রত্যেকটি ধর্ম সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। মসজিদ, মন্দির ও চার্চ যথাক্রমে মুসলিম, হিন্দু ও খৃষ্টান সমাজের লোকদের আচার আচরণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রভাবিত করে। এটি দলগত তথা সামাজিক প্রভাবেরই নামান্তর। আর এভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষের আচরণ ও কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ জীবনকে সুন্দর ও মার্জিত করতে পারে। মানব শিশু তার পরিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে শুরু হয়। এখানে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে পরিচিত হয়। এ ফলে তার মেধা ও মননের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তি বিদ্যালয়ের শুধু পুঁথিগত জ্ঞানই অর্জন করে না। বিদ্যালয়ের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড তথা সাংস্কৃতিক ও চিত্তবিনোদন মূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সে একজন পরিপূর্ণ সামাজিক ব্যক্তিরূপে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানুষ নিয়ম শৃঙ্খলা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। পারিবারিক গন্ডি পার হয়ে মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই দলগত জীবনযাপনের সুযোগ পায়। এখানে সে বিভিন্ন পরিবার ও পরিবেশ থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মিশে এবং ভাল মন্দ সম্পর্কে অবহিত হয়। সে জন্য স্কুল জীবনকে বলা হয় ব্যক্তির ভবিষৎ জীবনের সূতিকাগার। এতএব আমরা বলতে পারি ব্যক্তির সমাজজীবন রূপায়ণে বিদ্যালয় হলো সূতিকাগার ।

৪) খেলার সাথী

মানব শিশু যখন বড় হয় তখন সে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলায় অভ্যস্ত হয়। পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে একটি শিশু খেলার মাঠে পাড়া প্রতিবেশি ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য শিশুর সংস্পর্শে আসে। খেলার সাথীদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান শুরু হয়। খেলার মাঠে সে পরিবারের বাইরে জগতের অস্তিত্ব অনুভব করে। খেলার মাঠ থেকে সে নেতৃত্ব নিয়ম-শৃঙ্খলা, দায়িত্ব- কর্তব্য এবং সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করে। খেলাধূলার নেতৃত্বদান ও নিয়ম-শৃঙ্খলা আয়ত্ত করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ ও সামাজিকতার বিকাশ ঘটে।

খেলার সাথীদের সঙ্গ এমনই একটি সামাজিক উপাদান যার থেকে মানুষ তার জীবন গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি অর্জন করতে পারে। খেলার মাঠ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও বিভিন্ন গুণাবলি তার ভবিষৎ জীবনের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে

পারে। অতএব বলা যায় একজন ব্যক্তির সামাজিক জীবন রূপায়নে ও তার সমাজজীবনের গন্ডি বৃদ্ধিতে খেলার মাঠের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৫) সংঘ

মানুষ যখন পারিবারিক গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসে তখন তার সামাজিত পরিধি বৃদ্ধি পায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে তার জ্ঞানের প্রসার ঘটে। সমাজ সম্পর্কে তার আগ্রহ বেড়ে যায় এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করার স্পৃহা বিকশিত হয়। কোনো না কোনো সংঘের সদস্য হলেই মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের প্রবণতার প্রকাশ ঘটে। সংঘ হচ্ছে ঐচ্ছিক সংগঠন। সেখানে মানুষ অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সংগঠিত হয়। সংঘ বলতে তাই সমভাবাপন্ন কতক ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝায়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্বকীয়তা ও সৃজনশীলকার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায়। সেজন্য মানুষ খেলাধূলা, সংগীত র্চচা, চিত্তবিনোদন ও সেবামূলক কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের সংঘ প্রতিষ্ঠা করে। সংঘের মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবনকে দেশের ও জনসেবার কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমেই মানুষ সামাজিকতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে। মানুষ নেতৃত্ব প্রদান একং স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেও শিখে। অর্থাৎ সংঘ হচ্ছে মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠা লাভের অন্যতম সামাজিক উপাদান।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারি যে, পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, খেলার সাথী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দল এবং সংষ মানুষ ও তার সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। এছাড়া আরো কতগুলো উপাদান আছে যেসব মানুষের সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে যেমনঃ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, কর্মক্ষেত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও পত্রপত্রিকা প্রভৃতি। মানুষ সমাজে একা বাস করতে পারে না। যে বন্ধু বান্ধবের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করে। সামাজিক মেলামেশার মধ্যদিয়ে সে কতকগুলে গুণ আয়ত্ব করে। সে ভাল বন্ধুর সহযোগিতায় জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়, আর মন্দ লোকের সাহচর্যে অনেকের জীবন ধ্বংস হয় । আত্মীয়স্বজনের প্রভাবও মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ যখন পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গন্ডি পার হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেখানেও সে বিভিন্ন সহকর্মীর ও পেশাজীবী মানুষের সংস্পর্শে আসে। এর ফলে তার আচরণ ও ভাবধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজজীবনের উপর ভৌগোলিক পরিবেশ, বংশগতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক উপাদানসমূহের প্রভাব অনস্বীকার্য। বস্তুত, কোনোটির প্রভাবকেই খাটো করে দেখা যায় না। প্রত্যেকটি উপাদান স্ব স্ব পরিমন্ডলে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এসব কিছুর সমন্বয়েই ব্যক্তি জীবন আবর্তিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। সময়ঃ ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মানুষ একই সাথে একাধিক দল বা গোষ্ঠীর সাথে তার সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখে। এসব সামাজিক সম্পর্ক ব্যক্তি জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ব্যক্তির সামাজিক জীবনে যে সকল দল বা গোষ্ঠীর প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় থাকে এবং সেগুলোর ভিত্তিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন ও সামাজিক জীবন আবর্তিত হয় সেগুলো হলো পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, খেলার সাথী ও সংঘ। সমাজজীবনের উপর ভৌগোলিক পরিবেশ , বংশগতি , সংস্কৃতি এবং সামাজিক উপাদানসমূহের প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রত্যেকটি উপাদান স্ব স্ব পরিমন্ডলে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সি.এইচ কুলি কোন দেশের সমাজ বিজ্ঞানী ?

(ক) জার্মান (খ) ইটালি

(গ) ফ্রান্স (ঘ) আমেরিকান

উদ্দীপকের আলোকে ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ-

শান্তিপুর একটি গ্রামের নাম। সেখানকার লোকজন সব সময় নিজের কাজে আন্তরিকতা নেই বললেই চলে। তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক কাজ ভিত্তিক। ঐ গ্রামের লোকজন দেখা সাক্ষাত ঠিবন্তত হয় না, আবেগ নেই বললেই চলে।

২। উপরোক্ত উদ্দীপক কোন ধরনের দলের বৈশিষ্ঠ্য পাওয়া যায় ?

(i) মুখ্য দল

(ii) গৌন দল

(iii) রেফারেন্স দল

(ক) i (খ) iii (গ) i + ii+ iii (ঘ) কোনটিই নয়

৩। সমাজ জীবনে গোষ্ঠীর প্রভাব অধিক কার্যকরী বলে কোনটি বিবেচিত ?

(ক) পরিবার (খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

(গ) সংঘ (ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পাঠ-৬.৪ সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব
Impact of Heredity on Social Life

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বংশগতির ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বংশগতি, সমাজ, বংশ পরম্পরা, অঞ্চল, ব্যক্তিত্ব, প্রভাব ইত্যাদি।

পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্র। কোনো মানুষই চিন্তা ভাবনা, আচরণগত বৈশিষ্ট্য কিংবা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে কখনোই পুরোপুরি আরেকজন মানুষের মত হয় না। এমনকি যেসব বাচ্চা জমজ হিসেবে জন্মায় তাদের চিন্তাধারায়ও ব্যাপক ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত আমরা যখন মানসিক চিন্তার বিষয়কে তুলনা করার চেষ্টা করি তখনই সবচাইতে বেশি ভিন্নতা দেখা যায় । জীবের অনেক বৈশিষ্ট্যই তার ক্রমোজমে অবস্থিত জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তা বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। এ কারণে অনেক সময়ে সন্তানের সাথে পিতামাতার কিংবা তার পূর্বসূরীর দৈহিক, আচরণগত এমনকি মনোগত বৈশিষ্ট্যেও অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। এ বির্তক Nature versus nurture বা Heredity versus environment নামে পরিচিত। উত্তরাধিকার বা বংশগতি সম্পর্কে উপরে যা বলা হয়েছে এর বিপরীতে অনেক সমাজবিজ্ঞানী আছেন যারা মনে করেন মানুষের সামাজিক জীবন বংশগতির চেয়ে বরং পরিবেশ দ্বারাই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। বংশগতি তথা উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ যত বৈশিষ্ট্যই অর্জন করে তার পরিপার্শ্বস্থ ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে সেসব বৈশিষ্ট্য বিকশিত কিংবা অদমিত হয়। তবে একটা বিষয় নিয়ে প্রায়শই দ্বিমত থাকে না যে ভৌগোলিক পরিবেশ এবং বংশগতির পারস্পরিক প্রভাবেই সমাজস্থ মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। প্রত্যেক মানুষ তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই তার জীবন অতিবাহিত করে থাকে।

সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাব অনস্বীকার্য। বংশগতি বলতে সাধারণত কতকগুলো জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়, যেসব জন্মসূত্রে মানুষ লাভ করে। স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, মেধা, স্মরণশক্তি, মেজাজ সর্বোপরি দৈহিক কাঠামো একান্তভাবেই বংশগতির প্রভাবাধীন। মানুষ স্বেচ্ছায় এসব উপাদান সৃষ্টি কিংবা পরিবর্তন করতে পারেনা। মানুষের গড়া সমাজের উপর বংশগতির একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জন্মসূত্রে মানুষ মা-বাবা ও দাদা দাদির কাছ থেকে দেহের আকৃতি, চোখের আকৃতি, রং ইত্যাদি অবয়ব পেয়ে থাকে। দেহের রং, চুলের রং, মাথার আকৃতি, রক্তের গ্রুপ, মন-মেজাজ, ও রোগ-ব্যাধির অনেকটাই মানুষ বংশানুক্রমিক ধারায় অর্জন করে। জীববিজ্ঞানী মেন্ডেল বংশগতির এ তত্ত্ব দিয়েছেন বলে একে মেন্ডেলবাদ বলা হয়। বংশ পরম্পর জৈবিক বৈশিষ্ট্যাবলির পুনরাবৃত্তির মধ্যেই মেন্ডেলবাদের মূল কথা নিহিত।

সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব

সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর সমাজ দর্শনে সামাজিক স্তর বিন্যাসের সাথে মানসিক গুণাবলির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। আর ঐ মানসিক গুণাবলির অনেকটাই জৈবিক বৈশিষ্ট্য থেকে অর্জিত। প্লেটো তাঁর 'দি রিপাবলিক' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মানসিক গুণাবলির ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণির অস্তিত্ব নির্ণয় করেছেন। যেমন: তিনি যুক্তি (Logic), সাহস (Courage) ও ক্ষুধা (Appetite)- এ তিনটি জৈব মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রাচীন গ্রীক সমাজে যথাক্রমে দার্শনিক তথা শাসক শ্রেণি, যোদ্ধা শ্রেণি ও উৎপাদক শ্রেণির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তবে প্লেটোর চেয়ে তাঁর প্রিয় ছাত্র এরিষ্টটলের রচনায় (পলিটিকস) বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীক সমাজের প্রধান দুটি শ্রেণি যথা দাস ও দাস-মালিক শ্রেণির অস্তিত্বে মূলে যে জৈবিক উপাদান তথা বংশগতি অধিকতর ক্রিয়াশীল সে কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এরিষ্টটলের মতে, দাস প্রভু সমাজে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। দাস ছাড়া প্রভু কিংবা প্রভু ছাড়া

দাসের কল্পনাই করা যায় না। বর্ণবাদী নৃবিজ্ঞানীদের মতে, কেবল উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর লোকেরাই সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কারণ তারা সভ্য, মার্জিত, কর্মঠ, উন্নত বুদ্ধিমত্তা, চিন্তা ও সভ্যতার ধারক ও বাহক । তারা উৎকৃষ্ট শাসকও বটে।

অপর পক্ষে, নিকৃষ্ট বংশধারার লোকেরা অলস ও অমার্জিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের অনীহা থাকে। তাই তারা সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে কোন অবদানই রাখতে পারে না। বর্ণবাদী পন্ডিত তথা জৈবিক নিয়ন্ত্রণবাদীদের মতে, উৎকৃষ্ট জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষেরাই কেবল সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারে। জৈবিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট গুণাবলির অভাব ঘটলে সভ্যতার পতন ঘটে।

তাঁদের মতে, উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর সৃজনশীল বৈশিষ্ট্য লোপ পাবে এবং উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠী সভ্যতার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে ব্যর্থ হবে। এতে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অনেক সমাজবিজ্ঞানীও বংশগতির প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। এরা বিশ্বাস করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক জন্মগতভাবেই উত্তম অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তায় এরা উন্নত। এরা কর্মবীর, এরা সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসক ও নেতা পদে আসীন হতে পারে। সে যা হোক বর্ণবাদী নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞনীদের উক্ত ধারণা আজকাল ভ্রান্ত বলে আর স্বীকৃতি পায় না । অর্থাৎ মানুষের জীবনে বংশগতির চেয়ে পরিবারের প্রভাব বেশি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফ্রান্সিস গ্যাল্পন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যে কোনো পরিবারেই উত্তম ও অনন্য প্রতিভা জন্মাতে পারে। তাঁর মতে, পিতা মাতা যদি বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত মানের হয় তা হলে তাদের সন্তানরাও উন্নত মানের এবং প্রতিভাবান হতে পারে। এই প্রতিভাবান সন্তানরা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। তবে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়।

বিজ্ঞানী গোবীনের মতে, সমাজ ও সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির মূলে নরবংশগত উপাদানই দায়ী। তাঁর মতে, উৎকৃষ্ট নরবংশ যদি বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে তাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে না। অপরপক্ষে, নিকৃষ্ট নরবংশের লোক যতই পরিশ্রমী হোক না কেনো তাদের দ্বারা সমাজ ও সভ্যতার কোনো অগ্রগতি সম্ভব নয়।

লাপোজের মতে, নরবংশ যদি নিকৃষ্ট গুণের অধিকারী হয় তবে শিক্ষা কিংবা অনুকূল পরিবেশ তার মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। জন্মগতভাবে নির্বোধ ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলা যায় না।

কার্ল পিয়ার্সনের মতে, দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উত্তারাধিকার সূত্রে অর্জিত হয়। তাঁর মতে, মানব জাতির উত্থান ও পতনের জন্য মূলত জৈবিক উপাদানই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন বলেন যে, একই সমাজের মধ্যে জন্মসূত্রে দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য বিদ্যমান। তাঁর মতে, উচ্চ শ্রেণির লোকদের সন্তানদের বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) নিম্ন শ্রেণির লোকদের সন্তানদের সমান সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে লালন পালন পরও দেখা গেছে যে, নিম্ন শ্রেণির লোকদের সন্তানেরা সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখতে পারে না। অথচ উচ্চ শ্রেণির ছেলেমেয়েরা সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পরিবেশ এক হওয়া সত্ত্বেও বংশগতির পার্থক্যের কারণে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে তারা সমান অবদান রাখতে পারছে না।

অপরাধ বিজ্ঞানীরাও বংশগতির প্রভাবকে সমাজে অপরাধ প্রবণতার জন্য দায়ী করেন। এঁদের মধ্যে লম্ব্রোসো অন্যতম। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডোগাল তাঁর তত্ত্বে বংশগতির প্রভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মানুষের কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তির কথা বলেছেন, যেসব মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে এবং সে যে আচরণ করে তা এই সহজাত প্রকৃত্তিরই ফল।

তবে বংশানুক্রমের উপর পরিবেশের প্রভাবকে বৈজ্ঞানিকরা একেবারে অস্বীকার করেন নি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ, অনুকূল জলবায়ু, খাদ্য এবং শিক্ষার কোনো ভূমিকা নেই একথা স্বীকার করেন না। ভৌগোলিক পরিবেশ কিভাবে সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে এই বিষয়টি ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কিত পাঠের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি।

অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশ ও বংশগতি উভয়েরই কম বেশি প্রভাব রয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে, বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিসত্ত্বা গড়ে উঠে। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সংস্কৃতি ও পরিবেশ মানুষের জীবনের উপর বহুমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে, বংশগতির প্রভাব অনেকটা গৌণ বলে প্রতীয়মান হয়।

তাই বলা যায় যে, ব্যক্তির জীবনে বংশগতি ও পরিবেশ কোনোটাই উপেক্ষণীয় নয়। মানুষ তার আচরণ ব্যবহার চলাফেরা ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি, উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং অনুকূল পরিবেশের সহায়তায় ঘটাতে পারে। পরিবেশ অনুকূল হলে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাসমূহ বিকশিত হবার সুযোগ বেশি পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব সম্পর্কে লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

উত্তরাধিকার বা বংশগতি সম্পর্কে অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন মানুষের সামাজিক জীবন বংশগতির চেয়ে বরং পরিবেশ দ্বারাই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। বংশগতি তথা উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ যত বৈশিষ্ট্যই অর্জন করে তার পরিপার্শ্বস্থ ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে সেসব বৈশিষ্ট্য বিকশিত কিংবা অদমিত হয়। তবে ভৌগোলিক পরিবেশ এবং বংশগতির পারস্পরিক প্রভাবেই সমাজস্থ মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। প্রত্যেক মানুষ তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই তার জীবন নির্বাহ করে থাকে। বংশগতি বলতে সাধারণত কতকগুলো জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়, যেসব জন্মসূত্রে মানুষ লাভ করে। স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, মেধা , স্মরণশক্তি, মেজাজ সর্বোপরি দৈহিক কাঠামো একান্তভাবেই বংশগতির প্রভাবাধীন। মানুষ স্বেচ্ছায় এসব উপাদান সৃষ্টি কিংবা পরিবর্তন করতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'দি রিপাবলিক' গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

(ক) সক্রেটিস (খ) প্লেটো

(গ) এরিস্টটল (ঘ) রুশো।

২। 'দৈহিক ও মানস্তাতিক বৈশিষ্ঠ্য উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত হয়' উক্তিটি কার ?

(ক) সরোকিন (খ) লোপজের

(গ) পিয়ার্সনের (ঘ) ম্যাকডোনাল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। কোনটি ঐচ্ছিক সদস্যপদের বিষয়?

(ক) পরিবার খ) সম্প্রদায়

(গ) সংঘ (ঘ) সবগুলোই

২। 'দি রিপাবলিক গ্রন্থের' রচয়িতা কে?

(ক) প্লেটো (খ) এরিস্টটল

(গ) সক্রেটিস (ঘ) বার্ট্রান্ড রাসেল

খ) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩। কুলি-এর মতে প্রাথমিক বা মুখ্যদলের মধ্যে কাজ করে-

(i) ভালবাসা

(ii) আবেগ

(iii) অনুভূতি

(iv) আন্তরিকতা

সঠিক উত্তর কোনটি?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) সবগুলোই (ঘ) ii ও iv

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

স্নাতক পড়ুয়া রাকিব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত। তার আচরণ মার্জিত, সে পড়াশোনাতেও খুব ভাল। একদিন শিক্ষক রাকিবদের ক্লাসে সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে স্যাটেলাইট চ্যানেলের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষক বলেন- ভাষা, আচরণ, মনোভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি স্যাটেলাইট চ্যানেল দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পরিবর্তিতও হয়। এর ফলে আমরা আমাদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলি। রাকিব তার শিক্ষকের বক্তব্যের সাথে একমত নয়। তার মতে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে আমরা বিভিন্ন দেশের ভাষা, পোষাক, আচার-আচরণ, কৃষ্টি, যোগাযোগ, জীবনযাত্রার মান ও সুযোগ সুবিধাসহ নানান বিষয় জানতে পারি।

১) সংস্কৃতি কী? ১

২) 'সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন' বলতে কী বোঝায়? ২

৩) উদ্দীপক অনুযায়ী রাকিবের মতামত কোন ধরনের প্রভাবকে প্রতিফলিত করে বলে আপনি মনে করেন? ৩

৪) উদ্দীপকের রাকিব ও তার শিক্ষকের মতামতের মূল পার্থক্যের জায়গাটি ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ ঃ ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ ঃ ১। খ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ ঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ ঃ ১। খ ২। গ

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া
Process of Socialization

ইউনিট ৭

ব্যক্তির সামাজিকীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি মানব শিশু যথার্থ সামাজিক জীবে পরিণত হয়। যথাযথ সামাজিকীকরণ না হলে শিশু মানসিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে অনেক অসামাজিক আচরণ করতে পারে। এ প্রক্রিয়া মানব শিশুর জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলতে থাকে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু সমাজ ও সংস্কৃতির নানা বিষয়াদি, যেমন: সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক প্রতিবেশ, সামাজিক শৃংখলা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয় শেখার মাধ্যমে পরিপূর্ণ সামাজিক জীবে রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের অনিয়ম ঘটতে তা সমাজের উপর প্রভাব পড়ে। তখন অসংলগ্ন আচরণ করার জন্য আমরা ঐ ব্যক্তিতে 'অসামাজিক' বলে আখ্যায়িত করি। ব্যক্তির এ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তার মা-বাবা, পরিবারের সদস্যরা, প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন এবং পরবর্তীতে তার শিক্ষক, সহযোগী, চেনা অচেনা অনেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৭.১: সামাজিকীকরণের ধারণা ও প্রক্রিয়া
পাঠ- ৭.২: সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব
পাঠ- ৭.৩: সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন এবং তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

পাঠ-৭.১ সামাজিকীকরণের ধারণা ও প্রক্রিয়া
Concept and Process of Socialization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিকীকরণ, প্রক্রিয়া ইত্যাদি ।

মৌলিক ধারণা

মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার প্রয়োজনে অনেক কিছু শিখতে হয়। এ শিক্ষণ প্রক্রিয়া জন্মের পর থেকে শুরু হয় এবং তার জীবনব্যাপি চলতে থাকে। শিশুর এ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তার মা-বাবা, পরিবারের সদস্যরা, প্রতিবেশি, আত্মীয়-স্বজন এবং পরবর্তীতে তার শিক্ষক, সহযোগী, চেনা অচেনা অনেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ শিক্ষণ প্রক্রিয়া মানব শিশুকে ভাষা, আচার আচরণ, প্রথা পদ্ধতি, মূল্যবোধ, আদব-কায়দা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করানোর মাধ্যমে তাকে সামাজিক মানুষ হয়ে উঠতে সহায়তা করে। জীবনব্যাপি চলতে থাকা এই শিক্ষণ প্রক্রিয়াকেই সামাজিকীকরণ বলে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি মূলত সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়।

সামাজিকীকরণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী বোগারডাস (Bogardus) বলেছেন, "সামাজিকীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তি জনকল্যাণের নিমিত্তে একত্রে নির্ভরযোগ্য আচরণ করতে শেখে। এটি করতে গিয়ে সামাজিক আত্মনিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব ও সুসামঞ্জস্য ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করে।"

Kingsley Davis তাঁর *Human society* গ্রন্থে বলেছেন, "যে প্রণালীতে মানব শিশু পূর্ণাঙ্গ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাই সামাজিকীকরণ।"

Ogburn and Nimkoff বলেছেন, "যে পদ্ধতিতে ব্যক্তি নিজ নিজ মানবগোষ্ঠীর ব্যবহারিক মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়, তাই সামাজিকীকরণ।" তাঁদের মতে, সামাজিকীকরণ ব্যতীত সমাজে জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে একটা মেয়ে শিশু তার মা দাদিমা কিংবা বোনকে অনুকরণ করে এবং কীভাবে কন্যা, বোন, স্ত্রী কিংবা মা হয়ে উঠবে সেটা ধীরে ধীরে রপ্ত করে। তার চারিপাশের ঘনিষ্ঠ জনও সেভাবেই তাকে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। যেমন: তার জন্মদিনে তাকে পুতুল কিংবা রান্নার খেলনা হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি উপহার দেয়। পক্ষান্তরে, ছেলে শিশু অনুকরণ করে তার বাবাকে, ভাইকে কিংবা পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্যকে এবং সে পুত্র, ভাই, বন্ধু, স্বামী কিংবা বাবা হয়ে উঠার প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে রপ্ত করে। সে খেলনা হিসেবে পায় ফুটবল, রেসের গাড়ি-ঘোড়া, রোবোট মানব কিংবা পেশীবহুল পুরুষের প্রতিবিম্ব যা সমাজে তার ভূমিকা নির্ধারণ করতে উৎসাহিত করে ।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

মানুষের জীবন প্রক্রিয়া একই সাথে শারীরিক ও সামাজিক এবং প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠে। শিশুরা যে পরিবেশ বেড়ে উঠে সেই পরিবেশের সংস্কৃতি ও মানুষের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার ও সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে আমৃত্যু জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কোনো না কোনো কিছু শিখছে। সামাজিকীকরণ একটি প্রক্রিয়া যা প্রতিটি পর্যায়ে চলতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি বড়দের সালাম দেওয়া, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আসলে দাঁড়ানো এগুলো আমরা জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে শিখেছি আর তার প্রকাশ ঘটাচ্ছি। আনন্দ ও দুঃখের বহি:প্রকাশ প্রত্যেক সমাজ একই হলেও এক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের ভূমিকা রয়েছে।

শৈশবকাল

শৈশবকাল জীবনের আলাদা ও পৃথক একটি অংশ। শিশুরা নবজাতক থেকে আলাদা, শৈশবকাল উঠতি বয়স (কৈশোর) ও শিশুদের মাঝে অবস্থিত। ফরাসি ইতিহাসবিদ ফিলিপ্পো আরাইস (Philippe Aries) 1965 মত প্রকাশ করেন যে শৈশব কাল জীবনের পৃথক ও উন্নতির একটা পর্যায়। শিশুরা আলাদা কিছু ব্যবহার ও কাজ করে থাকে। শিশুরা বড়দের সাথে একই ধরনের কাজে যোগদান করে। যদিও সেটা শৈশবকালীন ভূমিকা (Role take) করাকে বোঝায় এই পৃথক কিছু কাজ বা ব্যবহার শিশুদের সবার থেকে আলাদা করে ।

কৈশোর কাল

কিশোর বা কৈশোরকাল ধারণাটি আমাদের কাছে একজন ব্যক্তি নিজেস্ব যৌন বিষয়ে সক্ষম হয় একই সাথে জন্মদান এর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ সময় কিশোররা একটা বড় পরিবর্তন (যেমন-শারীরিক ও মানসিক) এর ভেতর দিয়ে যায়। এ সময়ে অর্থাৎ কিশোররা প্রাপ্তবয়স্কদের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে অনুকরণ করে কিন্তু তাদের আচরণে থাকে শিশুদের ছাপ আর তারা শিশুদের প্রচলিত আইনের আওতায় পরিগণিত হয় তারা বড়দের মতো কাজে যেতে ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু তারা অবস্থান করে বিদ্যালয়ে।

উঠতি প্রাপ্ত বয়স্ক

উঠতি প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায় হলো আলাদা একটি পর্যায়। এসময়ে ব্যক্তিগত ও শারীরিক (যৌনতা) বিষয়ে উন্নতি হয়ে থাকে। বিভিন্ন দল ও মানুষের উপর পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে মানুষ তার উঠতি বিশ বছরের প্রথমে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানো এবং সেই সাথে, শারীরিক ও যৌনতা বিষয়ক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিষয় এ জ্ঞান অন্বেষণ ও প্রকাশ করায় ইচ্ছুক থাকে।

প্রাপ্ত বয়স্ক

প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ে ব্যক্তি ভবিষৎ কিছু বিষয়ের জন্য নিজস্ব কিছু বিষয়ে পরিবর্তন এনে থাকে ভবিষ্যতকে নতুন ও সুন্দর মাত্রা দেওয়ার জন্য। মানুষ সাধারণত মোবাইল প্রযুক্তির বদৌলতে পিতামাতা ও অন্যান্যদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করছে। আর কাজের বিষয়ে তারা পূর্বের প্রজন্মের মতোই অনুকরণ করছে। যেমন: বিবাহ, পারিবারিক জীবন এবং কিছু সামাজিক বিষয়ে সমস্যার সমাধান। শারীরিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে বর্তমানে ব্যক্তির নিজস্ব অগ্রাধিকার বেশি। এটা অবশ্যই ব্যক্তির স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত।

বার্ধক্য

প্রত্যেক সমাজে বয়স্ক মানুষেরা বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেব পরিগণিত হয়। বিভিন্ন দেশে বয়স্কদের সুবিধা ভালো থাকলেও চাকরি থেকে অব্যাহতির পরে তাদের জীবন পূর্বের থেকে কিছুটা দুর্বল হয়। এটা ভাবা হয় যে যারা বয়স্ক বয়সের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে নিজের সমৃদ্ধ ভান্ডার নিয়ে তাদেরকে যদি স্বীকৃতির চেয়ে বেশি সামাজিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া তাহলে সেটা অনেক ভালো হয়। আর যদি কোনো সমাজে স্বাস্থ্যবান বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেশি থাকে সেটা বর্হিস্থ্য ও অন্যান্য দৃষ্টিতে অনেক সুন্দর হিসেবে বিবেচিত হয়।

সামাজিকীকরণের ভূমিকা: সামাজিকীকরণ হলো একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। প্রত্যেক মানব শিশু এই সামাজিকীকরণের ভেতর দিয়ে যায়। সামাজিকীকরণ একজন শিশুকে পারিপর্শ্বিক পরিবেশ, সংস্কৃতি ও সমাজের উপযোগী হয়ে উঠে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক সত্ত্বার বিকাশ হয়ে থাকে। সামাজিকীকরণের ভেতর দিয়ে মানব শিশু আদব কায়দা, ব্যবহার, নৈতিকতা, মূল্যবোধ শিখে থাকে। ফলে মানব শিশু অথবা একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তি সত্তার সাথে এবং সে গোষ্ঠী সত্ত্বার সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সামাজিকীকরণে পরিবার, সমাজ, বিদ্যালয়, প্রতিবেশি সাথী , ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে।

সামাজিক পরিবেশ ও বংশগতির প্রভাব মানব শিশুর সামাজিকীকরণে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এখন আমরা সামাজিক পরিবেশ ও বংশগতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিকীকরণের প্রভাব সম্পর্কে লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক সত্তার বিকাশ হয়ে থাকে। সামাজিকীকরণের ভেতর দিয়ে মানব শিশু আদবকায়দা, ব্যবহার, নৈতিকতা, মূল্যবোধ শিখে থাকে। সামাজিক পরিবেশ ও বংশগতির প্রভাব মানব শিশুর সামাজিকীকরণে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। সামাজিকীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। সামাজিকীকরণে সামাজিক পরিবেশ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। মানব শিশুকে অবশ্যই সামাজিক পরিবেশের ভেতর দিয়ে বৃহৎ গোষ্ঠীর উপযোগী হয়ে উঠতে হয়। সামাজিক পরিবেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতি স্থান কালভেদে ভিন্নতা পেয়ে থাকে। সমাজের উপযোগী হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট সংস্কৃতি সামাজিকীকরণে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রত্যেকটা সংস্কৃতি কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানব শিশু যে গোষ্ঠী বা ভিন্ন দেশের হোক না কেনো সে এই সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠে। ফলে সংস্কৃতি ও পরিবেশের সংস্পর্শে বেড়ে উঠার সাপেক্ষে শিশুর মধ্যে কিছু মানবীয় বিষয় উন্নত হতে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Looking glass of self (নিজেকে দেখা) ধারণাটি ব্যবহার করেন কে ?

(ক) A. H. mead (খ) C.H Cooely

(গ) Signond Freud (ঘ) Morphy

২। Jean Piagel, Cognative theory of development এ কয়টি ধাপোর উল্লেখ পাওয়া যায় ?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৩। 'Game stage' কোন সময়কে নির্দেশ করে ?

(i) শৈশব

(ii) প্রস্তুতি

(iii) কৈশোর

(ক) i + ii (খ) i + iii (গ) iii (ঘ) i

পাঠ-৭.২ সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ
Agents of Socialization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিকীকরণ, বাহন, পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, সঙ্গী , প্রযুক্তি, প্রভাব ইত্যাদি।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ

সামাজিকীকরণ হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া । বিভিন্ন মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিবার

মানুষের জীব সামগ্রিক জীবনের সামাজিকীকরণ প্রথমে পরিবার থেকে শুরু হয়। নবজাতক শোনা, দেখা, স্বাদ নেওয়া সহ বিভিন্ন বিষয় প্রথমে পরিবার থেকে শিখে থাকে। পরিবারের সদস্যরা সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। সব সমাজ ও পরিবার সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের আদব কায়দা, নীতি নৈতিকতা এবং শিক্ষার প্রথম ধাপ পরিবার থেকে শিশু শিখে থাকে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সামাজিকীকরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠার থেকে ব্যক্তি বিভিন্ন নৈতিক জ্ঞান লাভ করে। একজন দ্বান্বিক তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ করেন যে, স্কুল কলেজ অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজের পুরস্কার এবং শাস্তির বিষয়টা আছে সেটার প্রথম পরিচয় ঘটে থাকে। শিশুরা সময়ের সাথে সাথে বেশি বাস্তববাদী হয়ে উঠে সেটা শারীরিক মানবিক ও সামাজিক সক্ষমতাকেও বুঝিয়ে থাকে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ অনেক ব্যয়বহুল তার পরেও সেখানে দেখা যায় যে মেধাবী শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধা পেয়ে থাকে। একই সাথে কম দক্ষ শিক্ষার্থীরা এই সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

সঙ্গী ও সহপাঠী

সামাজিকীকরণে পরিবারের এর সাথে সাথে সঙ্গী ও সহপাঠীরাও ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবার থেকে বেরিয়ে শিশুরা একই বয়সী শিশুর সাথে একই সামাজিক যোগ্যতা ভাগ করে । এক অপরের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে ব্যবহার আচরণে পরিবর্তন আসে।

গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি

গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রেডিও, টেলিভিশন, রেকর্ডগান এবং ইন্টারনেরট এগুলো সামাজিকীকরণের সাথে জড়িত। বর্তমানে ইন্টারনেট টেলিভিশনের থেকে বেশি সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন অনুষ্ঠান এমনকি ব্যবসায়িক অনুষ্ঠান উঠতি বয়সীদের সাথে বিভিন্ন অপরিচিত সংস্কৃতি ও জীবনযাপন এর ধরনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

কর্মক্ষেত্র

একটি পেশায় কী ধরনের ব্যবহার যথাপোযুক্ত সেটা মানবিক সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। সহকর্মীর কাছে থেকেও বিভিন্ন বিষয় আদান প্রদান হয়ে থাকে। যখন একটা পেশা থেকে আরেকটি পেশায় কেউ যোগদান করে পেশাগত

সামাজিকীকরণ প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র বড় পরিবর্তন আনে ও চলতে থাকে। প্রযুক্তিগত দক্ষতাও সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করছে।

ধর্ম

ধর্ম পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। সমাজের মানুষের ধর্মীয় আদর্শ, বিশ্বাস ও জীবনধারার উপর ধর্ম ভূমিকা পালন করে থাকে। সঠিক জীবনধারার লক্ষে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা

রাষ্ট্র ও প্রচলিত সরকার ব্যবস্থা সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র একটি কর্তৃত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি থাকে যা রাষ্ট্রের সদস্য বা জনগণকে মেনে চলতে হয়। অন্যথায় শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। শিশু ছোটবেলা থেকে এই সমস্ত শাস্তির বিষয় ও জীবনযাপনের নিয়মের সাথে পরিচালিত হয়ে উঠে। সবশেষে এটাই প্রতীয়মান যে , রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা শিশুর সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক নীতি ও সামাজিকীকরণ

শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সামাজিক নীতি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। বহির্বিশ্বে বিশেষ শিশু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। শিশুর সামাজিকীকরণ হলো খুবই প্রয়োজনীয় এবং অত্যবশ্যকীয়। সেজন্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয় কোন কোন পদক্ষেপ শিশুর সামাজিকীকরণে অবদান রাখবে। ডেনমার্ক ও সুইডেনে দেশের এক তৃতীয়াংশ শিশুর প্রতিপালনে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো শিশুর প্রতিপালনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে পদক্ষেপগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	**সামাজিকীকরণের বাহন সমূহের প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সামাজিকীকরণ একজন শিশুকে পারিপর্শ্বিক পরিবেশ, সংস্কৃতি ও সমাজের উপযোগী হয়ে উঠে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক সত্তার বিকাশ হয়ে থাকে। সামাজিকীকরণের ভেতর দিয়ে মানব শিশু আদব কায়দা, ব্যবহার, নৈতিকতা, মূল্যবোধ শিখে থাকে। বিভিন্ন মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ হলো: পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সঙ্গী ও সহপাঠী, গনমাধ্যম ও প্রযুক্তি, কর্মক্ষেত্র, ধর্ম, রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিকীকরণ কেমন প্রক্রিয়া?

(i) জীবন ব্যাপি

(ii) অর্ধজীবন

(iii) শৈশবকাল পর্যন্ত

কোনটি সঠিক (ক) i + ii (খ) i + iii (গ) iii (ঘ) i

২। নিচের কোনটির ব্যক্তির সামাজিকীকরণে কোনো ভূমিকা নেই?

(ক) পরিবার (খ) রাষ্ট্র

(গ) পাড়া-প্রতিবেশি (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৭.৩ সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব

Impact of Globalization and Technology on Socialization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিকীকরণে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিকীকরণ, বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট চ্যানেল ইত্যাদি।

সামাজিকীকরণ

মানুষ শুধু সামাজিক নয় একই সাথে সে হলো সাংস্কৃতিক জীবও, অন্যন্য প্রাণীর সাথে মানুষের পার্থক্য সুস্পষ্ট। মানব শিশুর জন্মের পর থেকে বেড়ে উঠা সময় একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়। সেটা হলো সামাজিকীকরণ। ব্যক্তির গঠন কোন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন তার নিজস্ব সমাজের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই সমাজভেদে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। মানুষের ব্যবহার শিক্ষণের মাধ্যমে গঠন হয়ে থাকে। মানব শিশু পৃথিবীতে প্রথমে অন্যান্য প্রাণীর মতোই সাধারণভাবে আসে কিন্তু সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সে তার ব্যক্তিত্ব গঠন করে সবার সাথে বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠে। সামাজিকীকরণ হলো একটা শিক্ষণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানব শিশু তার ব্যক্তিত্ব গঠন করে ও বৃহৎ সমাজের সাথে বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠে।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব

বিশ্বায়ন শব্দটি বর্তমানে সবার কাছে পরিচিত একটি শব্দ। আমরা বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছি। এটা বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। বিশ্বায়নে সমগ্র প্রক্রিয়া অর্ন্তভুক্ত। প্রযুক্তি এক্ষেত্রে বিশেষ বড় একটা স্থান দখল করে আছে। প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনযাত্রাকে একটা নতুন মাত্রা দান করেছে। আমাদের প্রতিদিনের কাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রযুক্তির ভালভাবে প্রভাব রাখছে।

১) পরিবারে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব

পরিবার হলো সবচেয়ে আদিম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারেই শিশুর প্রথম সামাজিকীকরণ হয়ে থাকে। মানব শিশু পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। প্রযুক্তির ব্যবহারে সামাজিকীকরণে প্রভাব ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে পড়ে। চিরাচরিত পরিবার কাঠামো ভেঙে গিয়ে এখন ছোট পরিবার হচ্ছে। ফলে শিশুর বেড়ে উঠার সময় পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা কমে যাচ্ছে। কিছু প্রতিষ্ঠানে শিশু সদনে শিশুকে প্রাথমিকভাবে রাখা হয়। এটা শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ইতিবাচক বলতে শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতি গ্রহণের প্রভাব পড়েছে।

২) খেলার সাথী

শিশুর সামাজিকীকরণে খেলার সাথী ও সমবয়সীদের অবদান লক্ষ্য করা যায়। একসাথে মেশার ফলে বৃহৎ সমাজের উপদেষ্টা হয়ে বেড়ে ওঠে কিন্তু বর্তমান সমাজে বিশ্বায়নের ফলে প্রযুক্তির ব্যবহারে মিথষ্ক্রিয়ার সুযোগ কমে যাচ্ছে। একই সময়ে প্রযুক্তির মাধ্যমে কথা হলেও সেটা শিশুদের জন্য কতটা যৌক্তিক এটা প্রশ্নের বিষয়। কম্পিউটার, মোবাইলে বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক গঠন ঠিক মতো হচ্ছে না। কারণ আগে শিশুর মিথষ্ক্রিয়া খেলার মাঠে গিয়ে হতো এখন সেটা ব্যস্ত জীবনে সম্ভব হচ্ছে না।

১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বায়ন

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের বাহিরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বড় অবদান থাকে। প্রযুক্তির ব্যবহারে এখন শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে যা শিশুর ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে। কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভালোভাবে জ্ঞান আহরণ করছে কিন্তু একই সাথে কর্মমুখী শিক্ষা ও দর্শন শিক্ষার যে প্রবণতা ছিল এটা কমে যাচ্ছে। শিশুদের বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সাহায্য

নিয়ে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে, বাস্তবিক শিক্ষার প্রভাব পড়ছে না। এটা শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

২) গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির ব্যবহার

গণমাধ্যমও মানব শিশুর সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম এর সাহায্য নিয়ে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুর সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে। প্রযুক্তির ব্যবহারে শিশুর বর্তমান সমাজের উপযোগী হয়ে বেড়ে উঠে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম এর ফলে মুক্ত হয়ে শিশু বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব মানব শিশুর সামাজিকীকরণে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ফলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

৩) ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব/ ধর্ম ও এর প্রভাব

শিশুর সামাজিকীকরণে ধর্ম এর প্রভাব রয়েছে। ধর্মীয় কার্যাবলির মাধ্যমে শিশু ভালো ও খারাপ কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্বাচন করতে পারে। বিশ্বায়নের প্রভাবে আমাদের বর্তমান সামাজিকীকরণ কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ধর্মীয় প্রভাব এর শিথীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে প্রাপ্ত বয়স্করাও যেমন সামাজিক বিভিন্ন অপরাধের সাথে যুক্ত হয় তেমনি শিশুরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশুদের মূল্যবোধ, আচার আচরণে প্রযুক্তির এই নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আবার ইতিবাচক এর কথা থাকলে ধর্মীয় বিভিন্ন কার্যাবলি ও রীতিনীতি মানুষ সহজে পালন করতে পারছে। সমতার বিষয় ভালোভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিশু ধর্মীয় চিন্তার চেতনার অধিকারী হয়ে সমাজে বসবাসের উপযোগী হয়ে বেড়ে উঠে। খারাপ কাজ, বিভিন্ন অপরাধ থেকে বিরত থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব নিঃসন্দেহে সামাজিকীকরণের মধ্যে পড়েছে। তবে নেতিবাচক প্রভাবের সাথে সাথে ইতিবাচক প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার এর মাধ্যমেই একটি সমাজে শিশুর সামাজিকীকরণ নির্ভর করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিকীকরণের বাহন সমূহের ওপর বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আমরা বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছি। এটা বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। বিশ্বায়নে সমগ্র প্রক্রিয়া অর্ন্তভূক্ত। প্রযুক্তি এক্ষেত্রে বিশেষ বড় একটা স্থান দখল করে আছে। প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনযাত্রাকে একটা নতুন মাত্রা দান করেছে। প্রযুক্তির ব্যবহার সামাজিকীকরণে প্রভাব ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবে পড়ছে। এটা শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব মানব শিশুর সামাজিকীকরণে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ফলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। আবার ইতিবাচক এর কথা থাকলে ধর্মীয় বিভিন্ন কার্যাবলি ও রীতিনীতি মানুষ সহজে পালন করতে পারছে। প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার এর উপর একটি সমাজে শিশুর সামাজিকীকরণ নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

রাতুল ও রাকিব দুই বন্ধু। রাতুল তার পরিবারের কথা শোনে, ভাল পড়াশোনা করে, সাবাইকে সম্মান করে এবং সে প্রযুক্তি ব্যবহার করে যতটুকু দরকার। পক্ষান্তরে রাকিব তার পরিবারের কথা শোনে না, চিৎকার চেচাঁমেটি করে, পড়াশোনা করে না। বেশীর ভাগ সময়ই কম্পিউটার এ গেম নিয়ে সময় কাটায় এবং কাউকে সম্মান করে না।

উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নর উত্তর দাও-

(ক) সামাজিকীকরণ কী ?

(খ) সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ কী কী ?

(গ) উদ্দীপকের রাতুল ও রাকিবের সামাজিকীকরণের পার্থক্য কোথায় বলে তুমি মনে কর।

(ঘ) সামাজিকীকরণরে ক্ষেত্রে উদ্দীপকের রাতুল ও রাকিবের জীবনে প্রযুক্তির প্রভাব আলোচনা কর।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। 'Impression Management' ধারণাটি কার ?

(ক) কুলি-র (খ) মিড-র

(গ) গফম্যান-র (ঘ) ফ্রয়েড-র

২। লিখিত আইন অনুসারে মানুষকে আচরণ করতে বাধ্য করে?

(ক) রাষ্ট্র (খ) পরিবার

(গ) কর্মক্ষেত্র (ঘ) গণমাধ্যম

খ) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বচনী প্রশ্ন

৩। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির প্রভাব কোনটি?

(i) ইতিবাচক

(ii) নেতিবাচক

(iii) নিরপেক্ষ

সঠিক উত্তর কোনটি?

(ক) iii (খ) i

(গ) ii (ঘ) i ও ii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রেশমির ছোট ভাই রবিন স্কুলে পড়ে। একদিন স্কুল থেকে এসে সে তার মাকে সালাম করল। রেশমিকেও সালাম করল। সবাই অবাক! এর আগে সে কখনো এভাবে সালাম করেনি। জানতে চাইলে রবিন বলল, স্কুলে শিখিয়েছে, বড়দেরকে সালাম করতে হয়। একদিন সে একটি খারাপ কথা বল। রেশমি বুঝতে পারল, নিশ্চয় কোনো বন্ধুর মুখে কিংবা রাস্ড়াঘাটে শুনে সে খারাপ কথা শিখেছে। রেশমি তখন রবিনকে বলল, ভালো ছেলেরা কখনো পঁচা কথা বলে না। এভাবে রবিন ক্রমশ সামাজিক আচরণ রপ্ত করতে শিখল।

ক) ক্রমশ সামাজিক আচরণ রপ্ত করার প্রক্রিয়াকে কী বলে? ১

খ) সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া কয়টি ও কি কি? ২

গ) সামাজিকীকরণের বাহনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৩

ঘ) সামাজিকীকরণে বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ ঃ ১। ঘ ২। ঘ

সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাস
Social Inequality and Stratification

ইউনিট ৮

সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হলো সামাজিক অসমতা ও সামাজিক স্তরবিন্যাস। পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মানুষ সমান বলা হলেও বাস্তবে সকল ক্ষেত্রে অসমতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, রাষ্ট্রীয় সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি নজর দেয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে সবখানে সামাজিক অসমতা বিরাজমান। বিভিন্ন ধরনের অসমতার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক অসমতা, আয় ও সম্পদের অসমতা, সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের অসমতা, বয়স ও জাতিগত অসমতা, শ্রমের বিভাজন ও অসমতা, সমাজের সদস্য হিসেবে অসমতা ইত্যাদি। অন্যদিকে, স্তরবিন্যাস সর্বজনীন। একমাত্র আদিম সমাজ বাদে অন্য কোনো সমাজ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে সমাজের মানুষের মধ্যে বিভাজন নেই। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের সমাজসমূহের ধরনগুলোর আলোচনায় মূলত দেখানো হয়েছে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সমাজ, যেমন-সামন্ত সমাজের ভিত্তি হচ্ছে ভূমি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজ গড়ে উঠেছে মূলত: ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। ভিন্ন সূচকের মানদন্ডে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের মানুষ জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সেই স্তরবিন্যাসকে মেনে চলেছে। স্তর বিন্যাসের চারটি ধরন এখানে আলোচনা করা হবে। যথা- দাস প্রথা, সামন্ত প্রথা, সামাজিক শ্রেণি এবং বর্ণ প্রথা।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৮.১: সামাজিক অসমতা: ধারণা, উৎপত্তি ও প্রকারভেদ
পাঠ- ৮.২: সামাজিক স্তরবিন্যাস: ধারণা ও প্রকারভেদ
পাঠ- ৮.৩: সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ: দ্বন্দ্বমূলক ও ক্রিয়াবাদী
পাঠ- ৮.৪: সামাজিক শ্রেণি: ধারণা, গঠন ও উপাদান
পাঠ- ৮.৫: জেন্ডার: ধারণা ও মতবাদ
পাঠ- ৮.৬: জেন্ডার বৈষম্যের সামাজিক প্রভাব
পাঠ- ৮.৭: বৈষম্যবাদ: ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যসমূহ
পাঠ- ৮.৮: সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা এবং উপায়

পাঠ-৮.১ সামাজিক অসমতা : ধারণা, উৎপত্তি ও প্রকারভেদ
Social Inequality: Concept, Origin and Types

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক অসমতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- সামাজিক অসমতার উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসমতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক অসমতা।

মৌলিক ধারণা

সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক অসমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মানুষ সমান বলা হলেও বাস্তবে সকল ক্ষেত্রে অসমতা লক্ষ কার যায়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি নজর দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে, সর্বত্র সামাজিক অসমতা বিরাজমান। উদাহরণ হিসেবে বর্তমান সমাজের বিভিন্ন পদ, সেবার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সর্বত্র অসমতা। সমাজে যারা ভালো অবস্থান ও সেবা ভোগ করে তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। যারা কম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে বিভিন্ন কাজে, অধিকারের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় তারা হলো সমাজের সাধারণ শ্রেণি। আবার পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরা নারীর উপর কর্তৃত্ব আরোপ করে। সুতরাং সবদিক থেকেই সামাজিক অসমতা বিদ্যমান। সামাজিক অসমতা উত্তরাধিকার ব্যবস্থার মত আমাদের সমাজ কাঠামোর সাথে জড়িত হয়ে আছে। এটি অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে থাকবে।

সামাজিক অসমতার সংজ্ঞা

সাধারণভাবে যদি সামাজিক অসমতাকে বোঝাতে চাই তাহলে সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ, সামাজিক অবস্থান ও পরিচিতি এবং পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে যে অসম অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে সেটাই হলো সামাজিক অসমতা। সামাজিক অসমতা হলো সামাজিক ভিন্নতা তৈরির এমন এক প্রক্রিয়া, যার দ্বারা সামাজিক মান-মর্যাদা, যশ ,খ্যাতি, বিত্ত বৈভব ইত্যাদি বিকশিত হয় ও ব্যক্তি সমাজে পরিচিত লাভ করে।

সামাজিক অসমতা বলতে বোঝায় এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সমাজের সদস্যবৃন্দ অসম পরিমাণ বা মাত্রায় সম্পদ, যশ, খ্যাতি ও ক্ষমতার অধিকারী– *Oxford Advanced Learner's Dictionary।*

যখন সমাজের কতিপয় লোক অন্যান্যদের তুলনায় বেশি ক্ষমতা, সম্পদ অথবা খ্যাতির অধিকারী হয় তখন সেখানে সামাজিক অসমতা বিরাজ করে– রবার্টসন।

সামাজিক অসমতা এমন একটি ক্রমোচ্চমানকে নির্দেশ করে যেখানে অন্যান্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা পদের তুলনায় কতিপয় ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা পদের কাঙ্খিত জিনিস বা বিষয়বস্তু রয়েছে– এম. গিন্সবার্গ।

সামাজিক অসমতার উৎপত্তি

ক্ষুদ্র সমাজ কাঠামোর দিকে তাকালেও আমরা সামাজিক অসমতার উপস্থিতি লক্ষ করি। প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সমাজেও অসমতা ছিল। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক শ্রেণি ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তনের মাধ্যমে সব সমাজেই অসমতা টিকে আছে। এখানে সামাজিক অসমতা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর ধারণা উপস্থাপন করা হল:

সামাজিক অসমতা ও এরিস্টটল: অসম সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন-"প্রাকৃতিকভাবেই কিছু মানুষ স্বাধীন ও কিছু মানুষ দাস"। তিনি বিভিন্ন কারণে দাস প্রথাকে সমর্থন করেছেন। এরিস্টটল মূলত দাসত্ব প্রথার সমর্থনে বক্তব্য দিতে গিয়ে সামাজিক অসমতা বিষয়ে ব্যাখা করেন। তিনি বলেন, কিছু মানুষ

প্রাকৃতিকভাবে মেধাবী, বিচক্ষণ ও ক্ষমতাধর আর কিছু মানুষ প্রজ্ঞাহীন। প্রজ্ঞাহীনরা সমাজে দাসত্ব করবে আর জ্ঞানীরা সমাজের নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এটাই স্বাভাবিক। এদের অধীনে থাকবে দেশের সাধারণ মানুষ।

সামাজিক অসমতা ও কার্ল মার্কস: কার্ল মার্কস ও তাঁর সহযোগীরা মনে করেন যে, সমাজজীবনের সূচনাকাল থেকে সামাজিক অসমতা ছিল না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মুনাফা হলো মুখ্য বিষয় আর এক্ষেত্রে মালিক শ্রেণি সবসময় শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করে। মালিক শ্রেণি শোষণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে অসমতা টিকিয়ে রাখে।

সামাজিক অসমতা ও এমিল ডুর্খেইম: এমিল ডুর্খেইমের বক্তব্য এর সাথে এরিস্টটলের বক্তব্যের মিল রয়েছে। ডুর্খেইম বলেন যে, প্রাকৃতিকভাবে কিছু মানুষ মেধাবী যারা অন্যদের থেকে আলাদা। সমাজের পরিচালনা ও বড় কাজগুলো মেধাবীরা পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে, অন্যন্য কাজগুলো সাধারণ মানুষেরা করে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ফলে মেধাবীরা সমাজের মর্যাদায় আসনে আসীন হয়। এভাবে সামাজিক অসমতার সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসমতা

সামাজিক অসমতা সমাজের সবক্ষেত্রে বিদ্যমান। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসমতার বর্ণনা দেওয়া হলো:

রাজনৈতিক অসমতা: রাজনৈতিক অসমতা বর্তমান সমাজে লক্ষণীয়। রাজনৈতিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ক্ষমতাশালীরা ভোগ করে। এছাড়াও আইনের সুযোগ লাভের অধিকার এর উপর রাজনৈতিক অসমতা নির্ভর করে।

আয় ও সম্পদের অসমতা: সম্পদের মালিকানা ও আয়ের বৈষম্য বিভিন্ন সমাজে লক্ষ করা যায়। সম্পদ মূলত সমান সুযোগ মুষ্টিমেয় শ্রেণির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আয়ের ক্ষেত্রেও সম্পদের মতো বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

নাগরিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে অসমতা: মানুষের জীবনকে অর্থবহ করার জন্য সমাজে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সুযোগ সুবিধা গ্রহণের মতো ক্ষমতা সবার থাকে না। ফলে অসমতার সৃষ্টি হয়।

জেন্ডার ও জাতিগত অসমতা: সমাজে জেন্ডারের তারতাম্যের বিচারে অসমতা লক্ষ করা যায়। অনেক সমাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা বিরাজ করে। একজন পুরুষ তুলনায় একজন নারী সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করে না। জাতিগত অসমতা সকল সমাজে কম বেশি বিদ্যমান। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে অসমতার মূল কারণ জাতিগত ভিন্নতা।

শ্রমের বিভাজন ও সামাজিক অসমতা: শ্রমের বিভাজনেও অসমতা লক্ষণীয়। একটি সমাজে বিভিন্ন পেশা বিদ্যমান আর এক্ষেত্রে পেশাগত ও কর্মদক্ষতার ভিন্নতা সামাজিক অসমতা তৈরি করে।

সমাজের সদস্য হিসেবে অসমতা: সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির যে সমতার রয়েছে সেটা নানা কারণে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না। সমাজের সদস্য হিসেবে অধিকার ভোগ করা সম্ভব হয় না। সম্পদশালী ব্যক্তিরা সমাজে অসমতার অন্যতম কারণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অসমতা সম্পর্কে লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ, সামাজিক অবস্থান ও পরিচিতি এবং পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে যে অসম অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয় সেটাই হলো সামাজিক অসমতা। যখন সমাজের কতিপয় লোক অন্যদের তুলনায় বেশি ক্ষমতা, সম্পদ অথবা খ্যাতির অধিকারী হয় তখন সেখানে সামাজিক অসমতা বিরাজ করে। সভ্যতার শুরু থেকে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যে কম বেশি সামাজিক অসমতা বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'প্রাকৃতিকভাবেই কিছু মানুষ স্বাধীন ও কিছু মানুষ দাস'- উক্তিটি কার ?

(ক) এরিস্টটল (খ) প্লেটো (গ) জন লক (ঘ) কার্ল মার্কস

পাঠ-৮.২ সামাজিক স্তরবিন্যাস : ধারণা ও প্রকারভেদ
Social Stratification: Concept and Types

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা বলতে পরাবেন;
- সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ	সামাজিক স্তরবিন্যাস, দাসপ্রথা, সামন্তপ্রথা বর্ণপ্রথা ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকেই একে অন্যের থেকে আলাদা। বয়স, লিঙ্গ, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই একজন মানুষ আরেকজন মানুষের মত হয় না। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে আমরা সহজেই একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক করে ফেলি। এ বিবেচনা অনুসারে আমরা কাউকে দক্ষ, কাউকে অদক্ষ, ভালো-মন্দ ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করে থাকি। এ ধরনের শ্রেণিকরণকে সামাজিক বিভাজন বলা হয়। সমাজে আরেক ধরনের সামাজিক শ্রেণিকরণ আমাদের চোখে পড়ে-সেটি পদমর্যাদার ভিত্তিতে। ব্যক্তির এই পদমর্যাদার মূলে তাঁর আর্থিক সক্ষমতা, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, জন্মসূত্রে পাওয়া পরিচিতি ও সম্মান ইত্যাদি অনেক কিছু। যেভাবেই এ পদমর্যাদা তৈরি হোক না কেনো-এর ভিত্তিতে সমাজের মানুষকে আমরা স্তরে স্তরে ভাগ করে ফেলি এবং তার সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করি।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা

সামাজিক বৈচিত্র্য, বিভাজন ও স্তরবিন্যাস অনেকটা প্রকৃতির নিয়মের মতোই সত্য। মানব সমাজের কথাই ধরা যাক। শারীরিক সৌন্দর্য্য, অবয়ব, বুদ্ধিমত্তা, নৈতিকতার ধারণা, দর্শন, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা, ধর্মীয় অনুরাগ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিচারে মানুষ একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে সৃষ্ট পদমর্যাদার নিরিখে আমরা সমাজের মানুষকে স্তরে স্তরে বিন্যাস করি একেই সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে।

"যে প্রক্রিয়ায় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ কিংবা দলকে স্থায়ী বা অস্থায়িভাবে একেক পদমর্যাদার অধিকারী বলে বিন্যস্ত করা হয় তাকে স্তরবিন্যাস বলে।" অগবার্ণ ও নিমকফ

"সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সমাজে বসবাসকারী মানুষদেরকে স্থায়িভাবে দল অনুযায়ী বিন্যাস করা এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখা।" জিসবার্ট

জিসবার্ট (Gisbert) তাঁর *'Fundamental of Sociology'* গ্রন্থে বলেছেন, "সমাজকে একটি স্থায়ী দল বা প্রকরণে বিভক্ত করাই হচ্ছে সামাজিক স্ড়রবিন্যাস, যেখানে একে অন্যের সাথে উচ্চক্রম এবং নিম্নক্রমের ভিত্তিতে সম্পর্কিত। সামাজিক স্ড় রবিন্যাসের আলোকে সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ছাড়াও শাসক, শোষিত, মালিক–শ্রমিক, ধনী–দরিদ্র শ্রেণি পরিলক্ষিত হয়।"

অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সূচক অনুসারে সমাজের মানুষকে মর্যাদার ভিত্তিতে বিভক্ত করা। এই স্তরবিন্যাস সমাজ দীর্ঘ সময় ধরে ধারণ করে এবং মেনে চলে।

স্তরবিন্যাসের ধরনসমূহ

স্তরবিন্যাসের চারটি ধরন এখানে আলোচনা করা হলো। যথা- দাস প্রথা, সামন্ত প্রথা, সামাজিক শ্রেণি এবং বর্ণ প্রথা।

দাস প্রথা: দাস প্রথা হল সমাজের অসমতার এক চরম নিদর্শন। মানব ইতিহাসের যে পর্যায়ে দাস প্রথার প্রচলন হয়েছিল সেখানে দাস নামে আখ্যায়িত এক শ্রেণির মানুষকে দাস মালিকেরা নিজেদের কাজে নির্বিচারে ব্যবহার করত। কোনো কোনো আইনে (যেমন হাম্মুরাবি প্রণীত আইন) দাস ব্যবস্থাকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং দাসকে কেউ পালাতে সাহায্য করলে বা পলাতক দাসকে কেউ আশ্রয় দিলে তাকে শাস্তি পেতে হতো। দাসদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, দাস

মালিকদের ইচ্ছানুসারেই শ্রম দিতে হতো। দাস ছিল দাস মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অনেকটা হালের লাঙল, বলদ ইত্যাদির মতো। দাসদের কোনো অধিকার ছিল না। সমাজের স্বাধীন মানুষ অপেক্ষা দাসের মর্যাদা অনেক নিচে ছিল। অন্যান্য পণ্যের ন্যায় খোলাবাজারে দাস কেনাবেচা হতো এবং অনেক ক্ষেত্রে দাস মালিক কোনো কোনো দাসকে আজীবনের জন্য কিনে নিত। আদিম সমাজে দাসের কয়েকটা উৎস ছিল-কেউ যুদ্ধবন্দী হয়ে, কেউ ঋণগ্রস্থ হয়ে দাসে পরিণত হতো। কেউ বা বংশানুক্রমে দাসত্ব করতো।

সামন্ত প্রথা: ইউরোপের সামন্ত সমাজে এ প্রথা প্রধানত প্রচলিত ছিল বলা হলেও এর ব্যাপ্তি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে সামন্ত প্রথার আংশিক প্রমাণ মেলে। এ ব্যবস্থা মূলত সম্রাটের ভূমি ব্যবস্থাপনায় বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সম্রাট তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা সমস্ত ভূমিকে সামন্ত রাজাদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। এর মাধ্যমে সামন্ত রাজারা সম্রাটের সাথে এক ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন। এ চুক্তি অনুসারে নিজ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বা অন্য সাম্রাজ্য দখলের প্রয়োজনে সম্রাটের পরামর্শ বা সৈন্যসামন্তের প্রয়োজন হলে সামন্তরাজারা তা প্রদান করে সম্রাটকে সাহায্য করতেন। সামন্ত রাজারা তাঁদের জমি অভিজাত শ্রেণিকে আর অভিজাত শ্রেণি নাইটদেরকে, নাইটরা (যোদ্ধা শ্রেণি) কৃষককে খাজনার বিনিময়ে ভূমি জায়গীর হিসেবে প্রদান করতেন। এভাবেই সামন্ত সমাজে ভূমিভিত্তিক স্তরবিন্যাসের প্রচলন ছিল।

বর্ণপ্রথা: বর্ণভিত্তিক স্তরায়ন মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত। কোনো আর্থিক সচ্ছলতা বা মালিকানার ভিত্তিতে নয় বরং এ প্রথানুসারে মানুষের জন্মগ্রহণই তার পদমর্যাদা নির্ধারণ করে দেয়। এ প্রথার প্রচলন ও রীতিনীতিকে আইনসিদ্ধ করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ প্রথা অনুসারে মানুষ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে সে পরিবারের মান ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারে নবজাতকের মর্যাদা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বর্ণপ্রথার বিভিন্ন ধরন দেখা যায়। যেমন: প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র– এই চার ধরনের বর্ণ দেখা যায়। এ বিভাজন জন্মসূত্রে। হিন্দু শাস্ত্রে গুণ ও কর্ম অনুসারে বিভাজনের কথা বলা হলেও প্রাচীন কাল থেকে জন্মসূত্রে এ বিভাজন চলে আসছে। পশ্চিমা সমাজে গায়ের বর্ণের ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস দেখা যায়। এ স্তরবিন্যাসও জন্মসূত্রে। জন্মসূত্রে ব্যক্তি যে সামাজিক মর্যাদা পেয়ে থাকে সে সারাজীবন সে মর্যাদা ভোগ করে। বর্ণপ্রথা অনুসারে সামাজিক গতিশীলতার প্রায় কোনো সুযোগ নেই বললেই চলে।

সামাজিক শ্রেণি: শ্রেণি প্রত্যয়টি মূলত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে জড়িত। মূলত অর্থ সম্পদ, পেশা, শিক্ষার ভিত্তিতে এ বিভাজন করা হয়ে থাকে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটা শ্রেণি সহজেই অন্য শ্রেণির থেকে আলাদা হয়ে থাকে। সম্পদের মালিকানা বা আর্থিক সচ্ছলতার ভিত্তিতে সমাজের আলাদা আলাদা গোষ্ঠীগুলোতে শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করার এ প্রথা শুরু হয়েছে শিল্প বিপ্লবের পরপরই। শিল্প সমাজের বিকাশের সাথে সাথে মানুষের আর্থিক সম্পদের বৃদ্ধির ফলে সমাজে ধনী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ইত্যাদি শ্রেণির বিকাশ হতে থাকে।

অগবার্ন ও নিমকফের মতে, সামাজিক শ্রেণি হল সমাজে বসবাসকারী এমন এক ধরনের মানুষের সমাহার যাদের প্রায় একই ধরনের আর্থিক সম্পদ থাকার কারণে একই ধরনের সমাজিক মর্যাদা রয়েছে। মার্কসীয় সংজ্ঞা অনুসারে শ্রেণি হল এমন এক গোষ্ঠী যাদের উৎপাদনের উপাদানের সাথে একই ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সমাজে উৎপাদনের বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেটাই মুখ্য বিষয়। উৎপাদনের উপায়সমূহ যার বা যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে তার একটা শ্রেণি (পুঁজিপতি) আর যাদের হাতে সে নিয়ন্ত্রণ থাকে না তারা অন্য শ্রেণি, যেমন-সর্বহারা, শ্রমিক শ্রেণি।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজজীবনে স্তরবিন্যাস সম্পর্কে লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে যথা সম্পদ, পেশা, শিক্ষা, বর্ণ, জাতি, নরগোষ্ঠী, জেন্ডার ইত্যাদির নিরিখে আমরা সমাজের মানুষকে স্তরে স্তরে বিন্যাস করি যাকে। সামাজিক স্তর বিন্যাস বলে। যদিও বলা হয় সকল সমাজেই স্তরবিন্যাস বর্তমান এবং এটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া। মানব সমাজে মূলত চার ধরনের স্তরবিন্যাস লক্ষণীয়, এগুলো হলো- দাস প্রথা, সামন্ত প্রথা, সামাজিক শ্রেণি এবং বর্ণ প্রথা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক অসমতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'দাস প্রথা কে সমর্থন করেছেন কে ?

(ক) এরিস্টটল (খ) কার্ল মার্কস

(গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) প্লেটো

২। নিচের কোনটি সামাজিক অসমতা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ?

(ক) রাজনৈতিক অসমতা (খ) সম্পদের অসমতা

(গ) বয়সের অসমতা (ঘ) কর্মক্ষেত্রে অসমতা

পাঠ-৮.৩ সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ
Theory of Social Stratification

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ব্যাখ্যা পারবেন;

মুখ্যশব্দ	সামাজিক স্তরবিন্যাস, ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা সকল সমাজে স্তরবিন্যাসের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। তাঁদের মতে, আদিম সমাজেও কমবেশি স্তরবিন্যাস ছিল। তবে আদিম সমাজে স্তরবিন্যাসের ধরন ছিল খুব সাধারণ প্রকৃতির। নারী ও পুরুষের মধ্যে, বয়স্ক ও কমবয়সীদের মধ্যে, বিবাহিত ও অবিবাহিতদের মধ্যে সামান্য ভিন্নতা লক্ষণীয়। বিভিন্ন সমাজের একেক রকমের মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন পদ-মর্যাদার বিষয়টা গড়ে উঠতো ও তার চর্চা করা হতো। মুলত অভিজ্ঞতা, ধর্মীয় জ্ঞান, শিকারে দক্ষতা, বিনিময়ে বা বাণিজ্যে দক্ষতা, সৌন্দর্য্য, দৈহিক গড়ন, নেতৃত্বের ক্ষমতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে একেক সমাজে একেকভাবে স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই স্তরবিন্যাস সার্বজনীন কিনা কিংবা এটা সৃষ্টির কারণই বা কী এমন প্রশ্নে সমাজবিজ্ঞানীরা ভিন্নভাবে উত্তর খুঁজেছেন। সমাজে স্তরবিন্যাস কতখানি গুরুত্ব বহন করে এমন বিষয়েও তারা নানা মত পোষণ করেন। এখানে আমরা এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরব।

ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

ক্রিয়াবাদীরা মনে করেন সমাজে অনেকটা মানবদেহের মত। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন আলাদা আলাদা কাজ করে থাকে এবং এর মাধ্যমে সমগ্র মানবদেহে ভারসাম্য তৈরি হয়। ঠিক তেমনি সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যদি নিজ নিজ ক্রিয়াগুলো করে তাহলে সমগ্র সমাজে শৃংখলা বজায় থাকবে ও সুষ্ঠুভাবে চলবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রিয়াবাদী সমাজবিজ্ঞানী কিংসলি ডেভিস এবং উইলবার্ট মুর মনে করেন, সমাজে স্তরবিন্যাসের দরকার রয়েছে। সমাজ অবশ্যই তার সদস্যদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদমর্যাদা ভাগ করে দেবে। সমাজের সদস্যরা মেধা ও যোগ্যতা অনুসারেই পুরস্কার, গুরুত্ব, সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা ভোগ করবে।

ডেভিস এবং মুর মনে করেন, স্তরবিন্যাস সর্বজনীন এবং সমাজে অসমতার দরকারও রয়েছে। অসমতা আছে বলেই মানুষ এক অবস্থান থেকে আরো উন্নততর অবস্থান তৈরীর চেষ্টা চালায়, তার সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে সচেষ্ট হয়। এর বিপরীতে সমালোচকেরা বলেছেন, মানুষের মধ্যে পদমর্যাদার পরিবর্তন আনতে, উৎসাহ যোগানোর উদ্দেশ্যে অসমতার সৃষ্টি করা হয়েছে এমন যুক্তি যথার্থ নয়। মানুষ তার ব্যক্তিগত সুখের আশায় আত্ম-সন্তুষ্টির জন্য, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ থেকেও তার পদমর্যাদা বাড়াতে আগ্রহী হতে পারে। এসব তাড়না থেকেও সে নিরন্তর কাজ করার উৎসাহ পেতে পারে। ক্রিয়াবাদীরা সমালোচনা স্বীকার করেই মনে করেন, সমাজের উচিত যে ধরনের কাজে অধিক পরিশ্রম হয়, দীর্ঘ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় এমনকি বিপদজনক ধরনের যেসব কাজ রয়েছে সেসব কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা। এর ফলে মানুষ এ ধরনের কাজে নিযুক্ত হতে উৎসাহ বোধ করবে।

ক্রিয়াবাদীদের বিশ্লেষণ সন্তোষজনক বলে মনে হয় না। এছাড়া যেসব পদমর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে মানুষ তা ভোগ করে। যেমন- দাস, সামন্তপ্রভু, প্রচুর পুঁজির মালিকানা–এ ধরনের জীবনব্যাপি অসমতার কারণ কী তার কোনো সন্তোষজনক উত্তর ক্রিয়াবাদীরা দিতে পারেননি।

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

কার্ল মার্কসের লেখনী দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলভিত্তি রচনা করেছে। মার্কসের বিশ্লেষণে ইতিহাস হলো শোষক ও শোষিতের মধ্যেকার নিরন্তর সংগ্রামের বাস্তবতা। এই দ্বন্দ্ব তথা সংগ্রাম একটা সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যখন সমাজ সম্পূর্ণ শ্রেণিহীন

সমাজে রূপান্তরিত হবে। এই সংগ্রাম কেবল তখনই থামবে। স্তরবিন্যাসের ব্যাখ্যায় তিনি মনে করেন, সমাজে কেবল দুটি প্রধান শ্রেণিই বিরাজ করছে। এর একটি হলো বুর্জোয়া–যারা সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে ও একচ্ছত্র পুঁজির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে এবং অপরটি প্রলেতারিয়েত–যারা নিরন্তন শোষিত হয়ে চলেছে। বুর্জোয়া হলো সম্পদের মালিক শ্রেণি অন্যদিকে প্রলেতারিয়েত হলো শ্রমিক শ্রেণি । মার্কস কখনোই মনে করেননি যে, স্তরবিন্যাস অনিবার্য ও সর্বজনীন। তাঁর মতে, স্তরবিন্যাস হলো সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি।

মার্কসের মতোই সমসাময়িক দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, সমাজের সীমিত সম্পদ নিয়ে মানুষ তার সম্পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। মার্কস শ্রেণিদ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে, তাঁর অনুসারীরা তথা দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকেরা জেন্ডার, নৃগোষ্ঠীগত, বয়স ও অন্যান্য প্রেক্ষিতে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। এর অর্থ হলো সমাজের সর্বস্তরে সম্পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তথা লড়াই চলছে–এর একদিকে রয়েছে সুবিধাভোগী শেণি আর বিপরীতে আছে সুবিধাবঞ্চিত তথা শোষিত শেণি। শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে।

ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী রাফ ড্যারেনডর্ফ (Ralf Dahrendorf) মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে সময়োপযোগী করে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা দেখিয়েছেন। ড্যারেনডর্ফের মতে, সামাজিক শ্রেণি বলতে এমন কিছু মানুষের সমষ্টি বোঝায় যারা একই ধরনের সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীকে উল্লেখ করাতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন এখানে কেবল পুঁজিপতি বুর্জোয়াই নয় বরং এখানে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক, আইন প্রণেতা, বিচারিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, সরকারি আমলাগণ এমন অনেকেই আছেন। সুতরাং ক্ষমতাশালী সংখ্যা ও পদমর্যাদাগত অনেকেগুলো ধাপ তৈরি হয়েছে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে।

দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, আধুনিক ক্ষমতাশালীরা সমাজে কোনো বিশৃংখলা চায় না বরং চায় সমাজ যেন খুব শৃংখলাবদ্ধ ও সুষ্ঠুভাবে চলে যাতে করে তারা নিজেরা তাদের উচ্চ পদমর্যাদা, সুযোগ সংস্কার নিশ্চিন্তে ও নিষ্কন্টকভাবে উপভোগ করতে পারে। তাদের সম্পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতাকে তারা যে কোন মূল্যে নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষা করতে চায় এবং সে কারণেই তারা যে কোন ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্বকে কৌশলে অথবা কঠোর হাতে দমন করতে চায়।

ক্ষমতাবানদের পদমর্যাদা বজায় রাখা ও তা দীর্ঘ সময় ধরে যাতে লালিত পালিত হয় তার একটা উপায় হলো Dominant Ideology। এটি হলো এমন সব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তথা বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সমাহার যা কিনা সমাজের ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার চর্চা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। যেসব রাজা-বাদশারা তাদের রাজসভায় সভাকবি রাখতেন যার কাজই হতো রাজার গুণকীর্তন করে কাব্য রচনা করা। দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকদের যুক্তি হলো ক্ষমতাবানকে গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজেও নাটক, কবিতা ইত্যাদি নানা সাহিত্য রচিত হয় যেগুলোর মূল লক্ষ্য হলো জনগণের মনে শাসক সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করা যাতে জনগণ তাদের সমীহ করে এবং কখনো বিরোধিতা না করে। ধর্ম, শিক্ষা ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে ক্ষমতাবানরা 'Dominant Ideology' প্রচার করে ও জনমতের উপর ক্ষমতাবানদের সম্পর্কে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ক্ষমতাবানরা কেবল সম্পদ ও পদমর্যাদাই নিয়ন্ত্রণ করে না, তারা মানুষের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান তথা সংস্কৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

এখানেই শেষ নয়। সমাজের ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে যদি জনগণের কোনো অংশে কোনো প্রকারে আন্দোলনের আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে ক্ষমতাবানরা নানা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব স্থানীয়দেরকে তাদের অধীন করে ফেলে এবং আন্দোলনের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেয়। শ্রমিক কল্যাণের নামে কিছু সাধারণ আইনের প্রয়োগ করে (যেমন-ন্যূনতম শ্রম মজুরী নির্ধারণ, চিকিৎসা সুবিধা, উৎসব ভাতা ইত্যাদি) তারা শ্রমিকদের আন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করে। তবে দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকেরা মনে করে এ ধরনের আশা দেখিয়ে শ্রমিকদেরকে চিরদিন দমিয়ে রাখা যাবে না। শোষিতরা একদিন জেগে উঠবে, দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং সমতাভিত্তিক সমাজের দাবী জোরালো হবে। যতদিন শোষিতরা দাবী না তুলছে ততদিন ক্ষমতাবানরা সম্পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যেতে থাকবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত মতবাদ সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন পদ-মর্যাদার বিষয়টির ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস গড়ে উঠছে। ক্রিয়াবাদীরা মনে করেন, সমাজে স্তরবিন্যাসের দরকার রয়েছে। সমাজ অবশ্যই তার সদস্যদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদমর্যাদা ভাগ করে দেবে। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে, সামাজিক স্তরায়ন হলো শাসক ও শোষিতের মধ্যেকার নিরন্তর সংগ্রামের বাস্তবতা। এই দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম একটা সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যখন সমাজ সম্পূর্ণ শ্রেণিহীন সমাজে রূপান্তরিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলভিত্তি রচনা করেন ?

(ক) ডেভিস (খ) মুর

(গ) কার্ল মার্কস (ঘ) রাফ ড্যারেনডর্ফ

রহিম মিয়া একটি কারখানায় কাজ করে। তার মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকা। সে সারাদিন কাজ করেও পরিবারের ঠিকমত ভরণ পোষণ দিতে পারে না। আর তার কারখানার মালিক আসাদ অফিসে ঠিকমত আসে না। কিন্তু আসাদ সাহেবের অনেক টাকা। সে আবার কিছু পলিসি ব্যবহার করে শ্রমিকদের শোষণও করে।

উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-

(ক) Dominant Ideology বলতে কী বোঝেন?

(খ) শ্রেণি কোন আরোপিত মর্যদান নয় বরং অর্জিত মর্যাদা- ব্যাখ্যা করুন।

(গ) উদ্দীপক সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে- যুক্তি দিন।

(ঘ) উদ্দীপকের রহিম মিয়া ও আসাদ সাহেবের জীবনযাত্রার মান কার্ল মার্কস- এর সামাজিক শ্রেণি তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৮.৪ সামাজিক শ্রেণি
Social Class

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক শ্রেণির সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সামাজিক শ্রেণির গঠন উপাদান আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ	সামাজিক শ্রেণি , স্তরবিন্যাস, পদমর্যাদা, গোষ্ঠী, উপাদান ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সামাজিক স্তরবিন্যাসে চারটি প্রক্রিয়াগত ধরন হলো– দাসপ্রথা, বর্ণপ্রথা, সামন্তপ্রথা এবং সামাজিক শ্রেণি । এর মধ্যে দাসপ্রথা দাসভিত্তিক সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বর্ণপ্রথা বিশেষত ধর্ম ও জাতিবর্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সামন্তপ্রথা গড়ে উঠেছিল ভূমি মালিকানাকে কেন্দ্র করে। সামাজিক শ্রেণির ধারণা এগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সামাজিক শ্রেণি হলো বৃহৎ পরিসরের সামাজিক গোষ্ঠী যারা একই পরিমাণে অর্থনৈতিক সম্পদের অধিকারী এবং যারা প্রায় একই মানের জীবনযাপন করে। মূলত সম্পদের মালিকানা, পেশার ধরন, শিক্ষা, মর্যাদা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ইত্যাদি সামাজিক শ্রেণির মূল নির্ধারণী উপাদান।

সামাজিক শ্রেণির সংজ্ঞা

পি. জিসবার্টের মতে, সামাজিক শ্রেণি হলো *"একটা শ্রেণি বা জনসমষ্টি সমাজে যাদের একই ধরনের পদমর্যাদা রয়েছে, এই পদমর্যাদাই অন্য জনসমষ্টির সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করে।"(*A social class is a category or group of persons having a definite status in society which permanently determines their relation to other groups. – P. Gisbert)

অগবার্ন ও নিমকফের মতে, *"সামাজিক শ্রেণি এমন কিছু মানুষের সমষ্টি, সমাজে যাদের একই ধরনের সামাজিক পদমর্যাদা রয়েছে।"*(A social class is the aggregate of persons having essentially the same social status in a given society. – Ogburn and Nimkoff)

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, *সামাজিক শ্রেণি হলো কিছু মানুষের সমষ্টি যাদের সম্পদ আহরণের একই রকম সুযোগ সুবিধা রয়েছে এবং যাদের জীবন যাত্রার মান একই রকমের।* (Social classes are aggregates of individuals who have the same opportunities of acquiring goods, the same exhibited standard of living – Max Weber)

উপরের সংজ্ঞা থেকে এটা বলা যায় যে, সামাজিক শ্রেণি হলো সমাজের এমন একেকটা জনগোষ্ঠী যার সদস্যরা একই পদমর্যাদার অধিকারী।

আধুনিক সমাজের স্তরবিন্যাসের মূল নির্ধারক হলো সামাজিক শ্রেণি। আধুনিক সভ্য সমাজের স্তরবিন্যাস বোঝাতে সামাজিক শ্রেণি অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা ও পেশাগত পরিচয় ভিত্তিক প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। চারটি প্রধান কারণে সামাজিক শ্রেণি পূর্বেকার স্তরবিন্যাসের প্রক্রিয়াগত ধরনগুলো, যথা দাসপ্রথা, বর্ণপ্রথা, সামন্তপ্রথা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

সামাজিক শ্রেণির গঠন উপাদান

সামাজিক শ্রেণি গঠনে বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা রয়েছে। যেমন:

ক) **শ্রেণি হলো মর্যাদাগত গোষ্ঠী:** সামাজিক শ্রেণি হলো একই সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন মানুষের সমষ্টি। অর্থাৎ শ্রেণি সবসময় পদমর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষ বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত বলেই মানুষের মর্যাদাও ভিন্ন হয়, আর মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন হয় বলেই সমাজে মানুষের শ্রেণি ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

খ) **শ্রেণি কোনো আরোপিত মর্যাদা নয় বরং অর্জিত মর্যাদা:** আমরা জানি সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় মর্যাদা দু রকমের হয়। জন্মের সাথে সাথে পরিবার মানুষকে যে মর্যাদা দেয় তা পরিবার কর্তৃক আরোপিত মর্যাদা বলে। ব্যক্তি নিজে কঠোর পরিশ্রম করে পরবর্তীকালে যে মর্যাদা অর্জন করে। যেমন: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যাংকের ম্যানেজার, কলেজের প্রভাষক ইত্যাদি) তাকে অর্জিত মর্যাদা বলা হয়। সামাজিক শ্রেণি মানুষ তার চেষ্টা দ্বারা অর্জন করে বলে এটা প্রায়শই অর্জিত পদমর্যাদা (তবে এর ব্যতিক্রমও সম্ভব)।

গ) **উপলব্ধির ধরন:** প্রত্যেক শ্রেণির উপলব্ধির ধরনও ভিন্ন ভিন্ন। তিন ধরনের শ্রেণিগত উপলব্ধি সমাজে বিদ্যমান (ক) প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের নিজেদের মধ্যে একটা সমতার উপলব্ধি রয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তি যে শ্রেণির বলে নিজেকে মনে করে সেই শ্রেণির সাথে সে একাত্মতা অনুভব করে (খ) সমাজের অপেক্ষাকৃত মধ্য বা নিচু শ্রেণির মানুষেরা তাদের থেকে উঁচু মর্যাদার মানুষের তুলনায় নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে হীনমন্যতায় ভোগে (গ) অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা তাদের থেকে কম মর্যাদার মানুষের তুলনায় নিজেদের মর্যাদা বিষয়ে অতি উচ্চ মানসিকতা পোষণ করে।

ঘ) **মর্যাদার উপাদান:** ব্যক্তির সমাজে অবস্থানের সাথে তার মর্যাদার বিষয়টা জড়িত। ধনী শ্রেণি ও শাসক শ্রেণি প্রতিটা সমাজেই সব থেকে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। সমাজ কোনো কোনো উপাদানকে মূল্যায়ন করে ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারণ করবে এটা হয়ত সমাজভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিভিন্ন সমাজে জ্ঞান তথা পান্ডিত্য, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বংশ মর্যাদা, নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, সম্পদ, সাহসিকতা বীরত্ব ইত্যাদিকে বিভিন্নভাবে বড় করে দেখা হয়। আধুনিক সমাজে আমরা দেখি এগুলোর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থানও অনেক বড় করে বিবেচিত হয়।

ঙ) **জীবনযাপনের ধরন:** একটা সামাজিক শ্রেণিকে অন্য সামাজিক শ্রেণি থেকে আলাদা করার সহজ উপায় হলো তাদের জীবনযাপনের ধরন কেমন সেটা দেখা। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লাইফ স্টাইলও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। জীবনযাপনের ধরন বলতে আমরা অনেক কিছু একত্রে বুঝি, যেমন- পোষাক পরিচ্ছদ, বাসগৃহের ধরন, বসতি এলাকা, প্রতিবেশির ধরন, শিক্ষালাভের প্রকৃতি, বিনোদনের ধরন, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্কের ধরন, ব্যবহৃত মিডিয়ার প্রকৃতি, যোগাযোগের প্রকৃতি ও যানবাহন ব্যবহারের ধরন, প্রযুক্তির উপস্থিতির ধরন, উপার্জন ও ব্যয়ের প্রকৃতি ইত্যাদি। জীবনযাপনের ধরন একেক শ্রেণির একেক ধরনের পছন্দ-অপছন্দ, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ও রুচিবোধর পরিচয় দেয়।

চ) **সামাজিক শ্রেণি হলো অর্থনৈতিক গোষ্ঠী:** সমাজের মানুষের মর্যাদা যা কিছুর উপরই নির্ভর করুক না কেন সামাজিক শ্রেণির মূল ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক। প্রত্যেকটি শ্রেণির অর্থনৈতিক ভিত্তির সাথে যুক্ত হয় কিছু বস্তুগত ও অবস্তুগত বিষয়। অবস্তুগত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে শ্রেণি চেতনা, শ্রেণি সংহতিবোধ এবং শ্রেণি পরিচয়। অন্যদিকে, বস্তুগত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সম্পদ, সম্পত্তি, উপার্জন, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি। এসব কিছু মিলেই একেকটা শ্রেণি তৈরি হয়ে থাকে।

ছ) **সামাজিক শ্রেণি প্রকরণ:** আধুনিক শ্রেণি বিন্যাসকে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের শ্রেণির উল্লেখ করেছেন । যথা-(১) উঁচু শ্রেণি (২) নিম্ন-উচ্চ শ্রেণি (৩) উচ্চ-মধ্য শ্রেণি(৪) নিম্ন-মধ্য শ্রেণি (৫) উচ্চ-মধ্য শ্রেণি এবং (৬) নিম্ন-মধ্য শ্রেণি । সামাজিক শ্রেণি আলোচনার পথিকৃৎ কার্ল মার্কস মাত্র দুটি শ্রেণির কথা বলেছেন– “আছে” দের শ্রেণি এবং “নাই” দের শ্রেণি (“haves”and “have nots”)। যাদের আছে তাদেরকে তিনি বলেছেন পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া শ্রেণি এবং যাদের নেই তাদেরকে তিনি বলেছেন শ্রমিক শ্রেণি তথা প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক শ্রেণির গঠন উপাদান সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সামাজিক শ্রেণিএমন কিছু মানুষের সমষ্টি, সমাজে যাদের একই ধরনের সামাজিক পদমর্যাদা রয়েছে। সামাজিক শ্রেণি হলো বৃহৎ পরিসরের সামাজিক গোষ্ঠী যারা একই পরিমাণে অর্থনৈতিক সম্পদের অধিকারী এবং যারা প্রায় একই মানের জীবন যাপন করে। মূলত: সম্পদের মালিকানা ও পেশার ধরনই সামাজিক শ্রেণির মূল নির্ধারণী উপাদান। সামাজিক শ্রেণিকে সার্বজনীন বলা যেতে পারে। আধুনিক সভ্য সমাজের স্তরবিন্যাস বোঝাতে সামাজিক শ্রেণি (অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানা ও পেশাগত পরিচয় ভিত্তিক) প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। শ্রেণিগত পরিচয় জন্মসূত্রে নির্ধারিত নয়। মানুষ যে পরিবারেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেনো সে তার চেষ্টা দ্বারা অর্থনৈতিক অবস্থান ও পেশাগত পরিচয় তৈরি করে নিতে পারে তথা শ্রেণিগত অবস্থানও নির্ধারণ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কার্ল মার্কস নিচের কোন দুইটি শ্রেণির কথা বলেছেন ?

(ক) উঁচু ও নিম্ন শ্রেণি (খ) উচ্চমধ্যে ও নিম্নমধ্যে শ্রেণি

(গ) আছে ও নাই শ্রেণি (ঘ) কোনটিই নয়।

২। সমান্তপ্রথা কোনটি কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ?

(ক) জমি (খ) ধর্ম

(গ) অর্থ (ঘ) পেশা

পাঠ-৮.৫ জেন্ডার : ধারণা ও মতবাদ
Gender: Concept and Theory

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জেন্ডারের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- জেন্ডার স্তরবিন্যাসের সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন;
- জেন্ডারের ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, নারীবাদী দৃষ্টিভিঙ্গি, মিথষ্ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ	জেন্ডার, ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মিথষ্ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি।

জন্মসূত্রেই সমাজে কেউ নারী কেউ পুরুষ। শারীরিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে খুব সহজেই আমরা এই নারী-পুরুষ বিভাজনটাকে চিহ্নিত করতে পারি। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী পুরুষ বিভাজনের বিষয়টিকে লিঙ্গ বিভাজন বলা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জেন্ডার হলো সমাজসৃষ্ট। একারণে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে জেন্ডারের ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। নারী ও পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সমাজ যে বিভাজন রেখা টেনে দেয় তাকে জেন্ডার নামে আখ্যায়িত করা হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমরা বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি। বাঙালি সমাজে দুঃখ পেলেও জনসমক্ষে কোনো ছেলে সচরাচর কান্নাকাটি করে না। ধরে নেওয়া হয় এটা পুরুষ সুলভ আচরণ নয়। সমাজের ধারণা কান্নাকাটি করা মেয়েলি আচরণ। পুরুষ হবে কঠিন, নারী হবে কোমল হৃদয়ের। সমাজ মনে করে মেহেদী দিয়ে হাত সাজানো, নখপালিশ ব্যবহার–এসব মেয়েলি ব্যাপার। পুরুষেরা কখনো তাদের হাত পা এভাবে সাজায় না। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই উদাহরণগুলোতে নারী ও পুরুষের যে ভূমিকা তথা জেন্ডার ভূমিকা, শারীরিক, প্রকৃতিগত বা (Biological) নয়।

জেন্ডার স্তরবিন্যাসের সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

পৃথিবীর নানা প্রান্তের সমাজ বিশ্লেষণে দেখা গেছে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ, প্রভাব ও প্রাধান্য রয়েছে এমন সমাজই সবচেয়ে বেশি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্য প্রায় নেই বললেই চলে। সমাজবিজ্ঞানীরা এ বিষয়টির ব্যাখ্যা খুঁজতে চেয়েছেন বিভিন্নভাবে এবং দেখেছেন এর পেছনে সমাজ ও সংস্কৃতিই দায়ী। এরপরও সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে জেন্ডার বিশ্লেষণে ভিন্নমত পোষণ করেন।

ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি: ক্রিয়াবাদীরা মনে করে সমাজ হলো মানব দেহের মতো। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথা-নাক, কান, গলা, কিডনীর মতো সমাজেরও বিভিন্ন অংশ রয়েছে, যেমন-সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান ও সংঘ। মানবদেহের প্রত্যেকটা অংশ যদি নিজের কাজটি (Function) ঠিক মত করে তবে পূর্নাঙ্গ মানবদেহটি সুস্থ থাকে। ঠিক তেমনি সমাজের প্রত্যেকটি অংশ যদি নিজের কাজগুলো ঠিকমত করে তবে সমাজে শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। প্রত্যেকটা অংশের ক্রিয়া বা কাজকে কেন্দ্র করে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত বলে একে ক্রিয়াবাদ বলা হয়। ক্রিয়াবাদীরা মনে করে জেন্ডার বিভাজন সমাজকে স্থিতিশীলতা দান করেছে। অর্থ্যাৎ জেন্ডার বিভাজনের দরকার রয়েছে সমাজে স্থিতিশীলতা ধরে রাখার জন্য। সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স ও রবার্ট বেল্‌স (Talcott Parsons and Robert Bales, 1955) দেখিয়েছেন যে, পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যরা অবশ্যই বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নারী পুরুষ যখন পরিবার গঠন করে সেই পরিবারে পুরুষ ও নারী তার নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে পারিবারিক বন্ধন টিকিয়ে রাখবে। এই জেন্ডার ভূমিকা প্রত্যেক সমাজেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। প্রতিটা সমাজে এ ঐতিহ্য দীর্ঘসময় ধরে চলে আসছে। যদি কোনো কারণে এই জেন্ডার ভূমিকা পালন ব্যাহত হয় তাহলে পারিবারিক স্থিতিশীলতাও ব্যাহত হবে।

ক্রিয়াবাদীদের মতানুসারে নারী মানসিক সমর্থনের ভূমিকা গ্রহণ করবে, উৎসাহ যোগাবে। অন্যদিকে, পুরুষ সক্রিয় ভূমিকা নেবে। নারী তার পরিবারের সম্প্রীতি বজায় রাখতে চেষ্টা করবে, নারী হবে আবেগপ্রবণ, মানসিক আশ্রয় ও সমর্থনের উৎস।

ক্রিয়াবাদী মতানুসারে, নারীর এই ভূমিকা পুরুষকে স্বস্তি দেয় ও তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে উদ্বুদ্ধ করে। ক্রিয়াবাদীদের কথার অর্থ এই নয় যে এসব ঐতিহ্যবাহী জেন্ডার ভূমিকায় কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না, বরং তারা বলতে চেয়েছেন যে পরিবারের নারী-পুরুষের মধ্যকার শ্রম বিভাজনই হলো একটা কার্যকর পদ্ধতি যার সাহায্যে পরিবার একটি স্বতন্ত্র একক হিসেবে টিকে থাকতে সমর্থ হয়।

জেন্ডার সম্পর্কিত ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যা প্রথমদিকে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও পরবর্তীকালে সমালোচনার শিকার হয়। বলা হয়েছে যে, এই মতবাদ নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয়নি। এটি একটি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি। নারীকে ঘরের কাজ সামলাতে হবে এমন ধারণা সমাজসৃষ্ট, এর কোন প্রকৃতিগত বা জৈবিক ভিত্তি নেই।

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি: দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা অসম ক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে। ক্রিয়াবাদীরা এই অসম ক্ষমতা সম্পর্কের বিষয়টিকে কখনোই তুলে ধরেন না। নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন শ্রম বিভাজনের সাথে যে অসম পদমর্যাদার বিষয়টাও জড়িত সেটাও তারা বলেন না। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত নারী ও পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতা ও মর্যাদার দ্বান্দ্বিক বিষয়কে তুলে ধরে। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মতে, সমাজে জেন্ডার শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের কাজকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে তা নারীর মর্যাদাকে ছোট করে তুলে ধরে। পুরুষের কাজকে অধিকতর মূল্যায়ন করা হয়। পেশাগত কাজে নারী ও পুরুষ একইসাথে যুক্ত থাকলেও নারীর থেকে পুরুষের আর্থিক ও সামাজিক পুরস্কার তুলনামূলক বেশি।

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে, ঐতিহ্যগতভাবেই দীর্ঘ সময় ধরে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসম ক্ষমতার সম্পর্ক বিরাজ করছে। এ সম্পর্কের মধ্যে পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য ধরে রাখতে চায়, তার কারণ সে শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী, শারীরিক আকৃতিতেও প্রায়শই বড়, সন্তান ধারণের মত শারীরিক দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয় না। এসব শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সে সামাজিকভাবেও নিজের আধিপত্য জাহির করতে চায়। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও পুরুষশাসিত সমাজ তার এ ইচ্ছাকেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। যদিও সমসাময়িক সমাজে এ বিষয়টা ততটা গুরুত্বের চোখে দেখা হয় না। ঐতিহ্য, প্রথা, দীর্ঘ দিনের লালিত বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল নারী পুরুষের মধ্যকার এই সম্পর্ককে সহজভাবে মেনে নিতে শিখিয়ে চলেছে।

দ্বান্দ্বিক ব্যাখা মতে, জেন্ডার ভূমিকা পালনে যে পার্থক্যটা স্পষ্টভাবে দেখা যায় তা হলো– পরিবারে ও সমাজে একটা গোষ্ঠী আনুগত্যের ভূমিকা গ্রহণ করে (বিশেষত নারী) এর বিপরীতে একটা গোষ্ঠী আধিপত্যের ভূমিকা পালন করে (পুরুষ)। পুরুষের কাজকে আর্থিক পুরস্কার, সম্মান ও পদমর্যাদা দিয়ে পুরষ্কৃত করা হয়, পক্ষান্তরে নারীর কাজকে কখনো মূল্যায়নের প্রশ্নও উঠে না। নারীর ভূমিকা সমাজে অবমূল্যায়িত, অবহেলিত।

নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি: জেন্ডার এর দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যার একটা শাখা নিয়ে তৈরি হয়েছে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। যদিও এ নামকরণ সাম্প্রতিক কালের কিন্তু এই আলোচনার ধারা অনেক পুরোনো। এ সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা হিসেবে উল্লেখ করা যায়। যেমন: ১৭৯২ সালে প্রকাশিত মেরি উলস্টোনক্রাফাটের A Vindication of the Rights of Women, ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিল এর The Subjection of Women এবং ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর The Origin of the Family Private Property and the State. এঙ্গেলস তার গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, নারীর প্রতি অবমূল্যায়ন শুরু হয়েছে সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠার পরপরই। এর আগে এমনটি হয়নি। কুটির শিল্প আবিষ্কারের পর পুরুষ যখনই অবসর পেয়েছে তখন সে বিলাসে মেতেছে, নারীকে সে অবদমিত করে রেখেছে। মার্কস ও এঙ্গেল্‌স এর সূত্র ধরেই নারীবাদীরা বলেন যে, পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে শোষণ ও অবিচারের জন্ম হয়েছে এবং নারী এখানে শোষিত ও নির্যাতিত। কিছু নারীবাদী দাবি করেন, পুঁজিবাদী সমাজে নারীর এই পরিণতি অনিবার্য এবং সকল পুরুষ শাসিত সমাজেই এটা দেখা যায়। পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক বা যে কোনো সমাজ তা যদি পুরুষশাসিত হয় তাহলে সেখানে নারীকে এ পরিণতি মেনে নিতে হয়।

মিথষ্ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি: আমরা দেখি ক্রিয়াবাদী ও দ্বান্দ্বিক তাত্ত্বিকরা জেন্ডার সম্পর্ককে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে আলোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে, মিথষ্ক্রিয়াবাদীরা জেন্ডারকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা জেন্ডারভিত্তিক ও আচরণগত। আমরা দেখতে পাই আমাদের সমাজে পুরুষ সদস্যরা নিজেদের মতামতকে বেশি জাহির করে ও প্রাধান্য দিতে চায়, নারী সদস্যদের কথা তারা কম গুরত্ব দেয়। নারী যদি সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়, ভাল চাকরি করে– তারপরও নারীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রবণতা অনেক পুরুষেরই আছে। ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে তারা কেবল পুরুষকে ভাবে, নারীকে অধস্তন মনে করে। আমাদের দৈনন্দিন আচরণে এসব বাস্তবতা বিরাজমান।

শিক্ষার্থীর কাজ	জেন্ডার স্তরবিন্যাসের সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

জেন্ডার সামাজিকভাবে সৃষ্ট নারী ও পুরুষের অসমতা যেখানে নারীরা নানাভাবে পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক বাস্তবতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে জেন্ডারের ধারণাও ভিন্ন। সমাজে নারী ও পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে যে বিভাজন বিদ্যমান তাকে জেন্ডার নামে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ সমাজকর্তৃক বেঁধে দেওয়া নারী পুরুষের আলাদা আলাদা ভূমিকা পালনকেই জেন্ডার বলা হয়। ক্রিয়াবাদীরা মনে করে জেন্ডার বিভাজন সমাজকে স্থিতিশীলতা দান করেছে। অর্থাৎ জেন্ডার বিভাজনের দরকার রয়েছে সমাজে স্থিতিশীলতা ধরে রাখার জন্য। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত নারী ও পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতা ও মর্যাদার দ্বান্দ্বিক বিষয়কে তুলে ধরে। দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা অসম ক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। The subjection of women প্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয় ?

(ক) ১৮৫৯ (খ) ১৮৬৯

(গ) ১৮৭৯ (ঘ) ১৮৮৯

২। The origin of the family private property and the state প্রন্থটির রচয়িতা কে ?

(ক) মেরি উলস্টোনক্রাফাটের (খ) জন স্টুয়ার্ট মিল

(গ) ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (ঘ) সেলিনা হোসেন

৩। জেন্ডার বলতে মূলত কোনটিকে বুঝায় ?

(i) দৈহিক

(ii) সামাজিক

(iii) রাজনৈতিক

নিচের কোনটি

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i+ ii + iii

পাঠ-৮.৬ জেন্ডার বৈষম্যের সামাজিক প্রভাব
Social Impact of Gender Discrimination

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জেন্ডার বৈষম্যের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- জেন্ডার ও সামাজিকীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ	জেন্ডার বৈষম্য, সামাজিকীকরণ, সুযোগ সুবিধা, মালিকানা ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

জেন্ডার বৈষম্যের সমস্যাটি প্রায় মানব ইতিহাসের মতই পুরোনো। এ বৈষম্য দূর করতে কোনো সমাজই পুরোপুরি মাত্রায় সফল হয়নি। এ বৈষম্য একেক সমাজে একেক মাত্রায় বিরাজমান এবং এর চর্চা দৈনন্দিন জীবনের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে তার পুরোপুরি মূলোৎপাটন প্রায়শই দূরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশে এক সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের সংবিধানে সকলের অধিকারকে মূল্যায়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। গণতন্ত্রচর্চা এবং মানবাধিকারকে এদেশের গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। কিন্তু একই সাথে সমঅধিকার ঘোষণার পাশাপাশি এখানে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় জেন্ডার বৈষম্য বিদ্যমান। জাতিসংঘ প্রবর্তিত মানব উন্নয়ন সূচকের হিসাব মতে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ সত্ত্বেও সামাজিক বৈষম্য লক্ষণীয় মাত্রায় এখনো রয়ে গেছে। এসব সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে যেমন সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত অনিয়ম ও বিশৃংখলা, নারী-পুরুষ বৈষম্য ইত্যাদি।

জেন্ডার ও সামাজিকীকরণ

নারী-পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের বিষয়ে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যশা নিহিত রয়েছে বাঙালি সংস্কৃতিতে। এই প্রত্যশার ফলেই সমাজে জেন্ডার ভূমিকা পালনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ছেলেমেয়েদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বড়দের জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়। এর ফলে আমরা ছেলেকে ছেলের মত এবং এর সাথে মেয়েকে মেয়ের মত আচরণ শিখতে অনুপ্রাণিত করি। এ শিক্ষা তাদের সামগ্রিক জীবনে প্রভাব সৃষ্টি করে। সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ীই ছেলে মেয়ে তাদের শিশুকাল থেকে নিজেদেরকে তৈরি করে নেয় যা অবশিষ্ট জীবনে কাজে লাগে।

সমাজে জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাবসমূহ

জেন্ডার বৈষ্যমের নানামুখী প্রভাব সমাজে বিদ্যমান। এটি এমন এক পরিস্থিতি হিসেবে সমাজে বিরাজ করে যে এটি সমাজের সদস্যদের কাছে 'খুব স্বাভাবিক ব্যাপার' বলে বিবেচিত হয়।

জন্ম সংক্রান্ত জেন্ডার বৈষম্য ও তার প্রভাব: আমাদের সমাজে ছেলে শিশুর গুরুত্ব বেশি। এ কারণে গর্ভস্থ বাচ্চা ছেলে হবে কি মেয়ে হবে সেটি আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক শিক্ষিত দম্পতি জেনে নেয় এবং যদি মেয়ে হয় তাহলে তারা সন্তান পৃথিবীর মুখ দেখবে কিনা সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও বাংলাদেশে এমন প্রবণতা কমেছে কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজের এই প্রবণতা একেবারে দূর হয় নি। লিঙ্গভিত্তিক গর্ভপাত যদিও আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ-তার পরও গোপনে এমন ঘটনাগুলো মাঝে মধ্যেই ঘটে থাকে। ফলে মেয়ে শিশু গর্ভাবস্থাতেই জেন্ডার বৈষম্যের শিকার হতে পারে।

মৌলিক সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত সমতা: সমাজের সুযোগ সুবিধাগুলো নারী পুরুষ সমানভাবে পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরাই বঞ্চনার শিকার হয়। যদি মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে শুধু শিক্ষার কথাই ধরি তো আমরা দেখব যে স্কুলগুলোতে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি। এর মূলেও রয়েছে জেন্ডার ভিত্তিক পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। উদাহরণস্বরূপ আফগানিস্তানে মেয়েদের শিক্ষা কার্যক্রম অবৈধ। অর্থাৎ মেয়েরা লেখাপড়ায় অংশগ্রহণ করতে তথা স্কুলে যেতে পারবে না। মৌলিক চাহিদার আরেকটি বিষয় হিসেবে আমরা যদি খাদ্য ভাগের আলোচনা করি তো আমরা দেখতে পাব অনেক পরিবার রয়েছে যেখানে খাবারের ব্যাপারে ছেলেশিশু যত গুরুত্ব পায় মেয়ে শিশু ততটা পায় না। পরিবারের পুরুষ

সদস্যদের খাওয়া শেষ হলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই মা-মেয়ে ও পরিবারে বাকি নারী সদস্যরা ভাগ করে খায়। ফলে তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয় না। আমাদের সমাজে এ ব্যাপারটি এতটাই স্বাভাবিক যে, প্রায়ই বিষয়টা কারো নজরে আসে না। এর মূল কারণ নিহিত রয়েছে জেন্ডার ভিত্তিক পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা।

বিশেষ সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেঃ মৌলিক চাহিদা বিষয়গুলোর পরই আসে বিশেষ সুযোগ সুবিধার প্রশ্ন। এখানে নারীরা বৈষম্যের শিকার। উদাহরণস্বরূপ নারীকে উচ্চশিক্ষায় পরিবার থেকে খুব বেশি উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখা যায়। শিক্ষার হার ও উচ্চ শিক্ষায় নারীর উপস্থিতি দেখলেই এ তথ্য খুব সহজে চোখে পড়ে। উচ্চশিক্ষা, নানা পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে পরিবারের অনীহা-এটি আমাদের সমাজের প্রায় সর্বত্র চোখে পড়ে।

পেশাগত ক্ষেত্রেঃ শিক্ষিত নারী পুরুষ যখন শিক্ষা লাভের পর পেশা জীবনে প্রবেশ করে তখন নারী যেন বৈষম্যের আরেক স্তরে প্রবেশ করে। আগেই বলা হয়েছে জেন্ডার বৈষম্যের এসব চিত্রগুলো সমাজের সর্বত্র এক রকম নয়। তবে একথা বলা যায় যেখানে শিক্ষার হার কম সেখানে বৈষম্যের সম্ভাবনা বেশি। পেশাগত ক্ষেত্রে নারী সে সকল বাধার শিকার হয় তা হলো পুরুষের তুলনায় নারীর মজুরী কম, পদোন্নতির ক্ষেত্রে নারীর কম গুরুত্ব পাওয়া, চাকরি বা কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের উদাসীনতা, পরিবারের সদস্যদের অনীহা প্রভৃতি।

মালিকানার ক্ষেত্রেঃ অনেক সমাজ রয়েছে যেখানে সম্পদের মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে মারাত্মক বৈষম্য রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থাতেও এ পরিস্থিতি বিদ্যমান। পিতার সম্পদের সমান মালিকানা পুত্র-কন্যা পায় না। ছেলে বেশির ভাগ অংশ পায় এবং মেয়েরা বৈষম্যের শিকার হয়।

সামাজিক ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্যের যেসব প্রভাব আলোচনা করা হলো তা বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় খুব প্রাসঙ্গিক একটা ব্যাপার। বৈষম্য কমানোর ওপরে একটা অঞ্চলের উন্নয়ন ও প্রগতি নির্ভর করে। শিক্ষার হার ও প্রভাব কম থাকলে সেখানে নানা সামাজিক সমস্যা, পশ্চাৎপদতা, গোঁড়ামী, কুসংস্কার দানা বেঁধে ওঠে। আবার কিছু ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শিক্ষার হার বেশি এমন অঞ্চলেও এসব সমস্যাগুলো বিদ্যমান থাকতে পারে। জেন্ডার বৈষম্য ঠিক এমনই এক সামাজিক বাস্তবতা। শিক্ষাই পারে এ সামাজিক সমস্যা থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব সম্পর্কে লিখুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

নারী-পুরুষের নিজ নিজ ভূমিকা পালনের বিষয়ে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা নিহিত রয়েছে বাঙালি সংস্কৃতিতে। সমাজে এই প্রত্যাশার ফলেই সমাজে জেন্ডার ভূমিকা পালনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বৈষম্য কমানো অনেকটা সুষম অঞ্চলের উন্নয়ন ও প্রগতির উপর নির্ভর করে। শিক্ষার হার ও প্রভাব কম থাকলে সেখানে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা, পশ্চাৎপদতা, গোঁড়ামী, কুসংস্কার দানা বেঁধে ওঠে। আবার কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার হার অপেক্ষাকৃত বেশি এমন অঞ্চলেও এসব সমস্যাগুলো বিদ্যমান থাকতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি জেন্ডার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে?
(i) শিক্ষা ক্ষেত্রে
(ii) মৌলিক সুবিধার ক্ষেত্রে
(iii) বিশেষ সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক
(ক) i+ iii (খ) i+ ii (গ) ii + iii (ঘ) i+ ii + iii

পাঠ-৮.৭ বৈষম্যবাদ : ধারণা, ধরন ও দৃষ্টিভঙ্গি
Discrimination: Concept, Types and Perception

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বৈষম্যবাদ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- বৈষম্যবাদের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বৈষম্যবাদের বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ	বৈষম্যবাদ, শ্রেণি, পদমর্যাদা, অঞ্চল, স্যাটেলাইট, প্রভাব ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

বৈষম্যবাদ হচ্ছে অসমতাভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা এবং অসমতার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তুলনায় থেকে হেয় প্রতিপন্ন করে তার প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা। অন্য গোষ্ঠীর সদস্যকে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে সাধারণত একটি শক্তিশালী দল বা গোষ্ঠী অনায়াসে পেয়ে থাকে। এখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা বা অন্যান্য বিষয়গুলো কোনো যৌক্তিক বা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতের উপর নির্ভর করে।

বৈষম্যবাদ কী

বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সাধারণত সমাজের প্রচলিত ঐতিহ্য, নীতিমালা, মতবাদ, অনুশীলনসমূহ প্রতিষ্ঠান এবং আইনের ভিত্তিতে ধারণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি নীতিমালাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে মনে করা হয় যেটি চাকরিজীবী বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অনুসন্ধান করতে আগ্রহী করে। যেমন: আফ্রিকান-আমেরিকান বা মহিলারা দীর্ঘসময় ধরে আমেরিকায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

'বৈষম্য' শব্দটি ১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজি ভাষায় "Discrimination" হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত এসেছে ল্যাটিন শব্দ "Discriminat" শব্দ থেকে। যার অর্থ হচ্ছে দুটি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়কাল থেকে ইংরেজি "Discrimination" শব্দটি সাধারণত ইংরেজি শব্দ ভান্ডারে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করছে ব্যক্তির বর্ণভেদে তার চিকিৎসা পদ্ধতি বোঝার ধারক হিসেবে। বৈষম্যবাদ শব্দটি এসেছে "Discrimire " মানে হচ্ছে পার্থক্য করা, স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত করা এবং পৃথকীকরণ করা। অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী বৈষম্যকে অসুবিধাপূর্ণ বিবেচনা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। বৈষম্যবাদ হচ্ছে একটি তুলনামূলক সংজ্ঞায়ন। একজন বৈষম্যকারী ব্যক্তি কখনোই বৈষম্যের শিকার ব্যক্তির কাছে কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখিন হয় না। বৈষম্যের শিকার ব্যক্তি শুধু কিছু কারণে তারা সমাজে অন্যদের তুলনায় খারাপ বা নিচু প্রতিপন্ন হয়।

বৈষম্যের প্রকারভেদ

বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য সমাজে দেখা যায়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১) **বয়স:** বয়স ভিত্তিক বৈষম্য সমাজে একটি বড় ধরনের সমস্যা। সাধারণত: কম বয়সীরা সংখ্যানুসারে বয়স্কদের তুলনায় বেশি থাকলেও তারা যথাযথ পদমর্যাদা পায় না। এছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কম বয়সীদের সিদ্ধান্ত যদি যথাপোযুক্তও হয় তাও তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাযথ চোখে দেখা হয় না।

২) **শ্রেণি:** শ্রেণি বৈষম্যে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইউনিসেফ ও মানবাধিকার সংস্থার অনুসারে সারা বিশ্বে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন মানুষ শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। ইউনিসেফ এর তথ্যানুযায়ী শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্য সাধারণত এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশ। যেমন- ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, চীন, পাকিস্তান, নেপাল, জাপান, আফ্রিকা মহাদেশ ও অন্যান্য জায়গায় দেখা যায়। সাধারণত পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়, কর্তৃত্ব, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি অনুযায়ী সামাজিক শ্রেণি নির্ধারিত হয়।

৩) **প্রতিবন্ধী:** প্রতিবন্ধীরা সমাজে বিভিন্নভাবে বঞ্চনা বা বৈষম্যের শিকার হয়। প্রতিবন্ধীরা এমন এক ধরনের বৈষম্যের শিকার যারা সমাজের বিভিন্ন সরকারি বা প্রাইভেট কর্মক্ষেত্রে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধার সম্মুখিন হয়। সমাজে শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকরি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ বলে বিবেচিত হয়।

৪) **চাকরি:** চাকরি ক্ষেত্রে একজন পুরুষের তুলনায় একজন নারী, একজন সাদা ব্যক্তির তুলনায় একজন কালো ব্যক্তি, একজন বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় একজন কম বয়স্ক ব্যক্তি বেশি বৈষম্যের শিকার হয়। কর্মক্ষেত্রে বয়স, প্রতিবন্ধকতা, সম্প্রদায়, লিঙ্গ পরিচিতি, উচ্চতা, জাতীয়তা, ধর্ম, গায়ের রং, ওজন ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য হয়ে থাকে।

৫) **বর্ণবাদ বা সম্প্রদায়:** বর্তমান বিশ্বে বর্ণবাদের ভিত্তিতে বৈষম্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় বৈষম্য । সাধারণত: শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রো জনগোষ্ঠীকে একটা ঘৃণার চোখে দেখে। তাদের সব ধরনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বর্ণ বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

৬) **অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য:** আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেও বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়। একজন মানুষ বা ব্যক্তি যে যেখানে জন্মগ্রহণ করে তার ভিত্তিতে সমাজে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সাধারণত এই ধরনের বৈষম্য সাংস্কৃতিক বৈষম্য, পারিভাষিক বৈষম্য, ধর্মীয় বৈষম্য ইত্যাদি ভিত্তিতে তৈরি হয়।

৭) **ধর্মীয় বিশ্বাস:** ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেও বৈষম্যের শিকার হয়। সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় বিশ্বাসের দেশে তুলনামূলক সংখ্যালঘু ধর্মীয় বিশ্বাসের অধিকারীরা প্রতিনিয়ত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

বৈষম্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে বৈষম্যবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন:

কার্ল মার্কস এবং বৈষম্যবাদ: কার্ল মার্কস এর মতে, বৈষম্যবাদ নির্ভর করে উৎপাদনের উপকরণ এবং মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের উপর। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণি উৎপাদনের উপকরণগুলোর নিয়ন্ত্রক ফলে শ্রমিক শ্রেণি শুধু তাদের শ্রম বিনিয়োগ করে যা আবার শোষণমূলক। বুর্জোয়ারা পদমর্যাদা ও শক্তির অধিকারী হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক শ্রেণি লভ্যাংশ পায় না ফলে শোষণের মাধ্যমে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায়ও জমির মালিক ও সাধারণ কৃষকের মধ্যে বৈষম্যের উপস্থিতি ছিল।

ম্যাক্স ওয়েবার এবং বৈষম্যবাদ: ক্লাসিকাল সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার কার্ল মার্কস এর মতবাদ দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মার্কসের মতবাদকে প্রত্যাখান করেন। তিনি মনে. করেন পুঁজিবাদী সমাজে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের পাশাপাশি অন্যান্য উপাাদানসমূহ ও বৈষম্যের নিয়ামক, যেগুলো নিম্নরূপ-

(১) শ্রেণি (২) সম্মান এবং (৩) ক্ষমতা

উপরোক্ত তিনটি দ্বান্দ্বিক উপাদান মানুষের বৈষম্যকে প্রভাবিত করে। ওয়েবার মনে করেন সমাজে মানুষ ওপরের এই তিন ধরনের উপাদান পরিপূর্ণ করার জন্য সকল প্রকার বৈষম্যে লিপ্ত হয়। যদি এই তিন ক্ষেত্রে সমতা আনা যায় তাহলেই সমাজ থেকে বৈষম্য দূরীকরণ করা সম্ভব।

ডুর্খেইম এবং বৈষম্যবাদ: ডুর্খেইম ম্যাক্স ওয়েবারের সমসাময়িক তবে ওয়েবার যেখানে যৌক্তিকতার উপর বেশি জোর দিয়েছেন সেখানে ডুর্খেইম শ্রমের বিভাজনের উপর জোর দিয়েছেন এবং একই সাথে তিনি সমাজে সংহতিবোধ এর উপর জোর দিয়েছেন। ডুর্খেইম মনে করেন সামাজিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বৈষম্যবাদের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে লিখুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বৈষম্যবাদ শব্দটি এসেছে "Discrimire" মানে হচ্ছে পার্থক্য করা, স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত করা এবং পৃথকীকরণ করা। সামাজিক দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা ও সামাজিক পরিচিতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে Rubin I Hewstone তিন ধরনের বৈষম্যকে আলোকপাত করেছেন। যথা-বাস্তবিক প্রতিযোগিতা, সামাজিক প্রতিযোগিতা এবং Consensual বৈষম্য। বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সাধারণত: সমাজের প্রচলিত ঐতিহ্য, নীতিমালা, মতবাদ, অনুশীলনসমূহ প্রতিষ্ঠনি এবং আইনের ভিত্তিতে ধারণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি নীতিমালাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে মনে করা হয় যেটি চাকরিজীবী বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে অনুসন্ধান করতে আগ্রহী করে। যেমন: আফ্রিকান-আমেরিকান বা মহিলারা দীর্ঘসময় ধরে আমেরিকায় বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা কে করা ভাগে করা যায় ?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৬টি

২। 'সংহতি বোধ' ধারনাটি কার ?

(ক) কার্ল মার্ক্স (খ) ম্যাকস ওয়েবার

(গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) রবিনসন

পাঠ-৮.৮ সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা এবং মাধ্যম
Concept and Means of Social Safety

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা আলোচনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	সামাজিক নিরাপত্তা, পরিকল্পনা, দারিদ্র্য সীমা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

একটা দেশে বসবাসরত মানুষের আর্থিক অবস্থা একই রকম হয় না। একটা অংশ আর্থিকভাবে খুব সচ্ছল হতে পারে আবার কোনো অংশ হয়ত আর্থিক বিবেচনায় খুব অসচ্ছল। অসচ্ছল জনগোষ্ঠী তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে না। এ কারণে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য সবদেশের সরকারই কিছু না কিছু পরিকল্পনা থাকে। এ ধরনের একটা পরিকল্পনার নাম হলো সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা।

সামাজিক নিরাপত্তা

সম্প্রতি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক মানদন্ডে এবং জীনযাপনের মানদন্ডের সাধারণ মানুষের বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে দেশের মোট জনবসতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে। এসব দরিদ্র এবং হতদরিদ্র মানুষদের সহায়তাদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নানামুখী পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা (Social Safety Net) চালু রয়েছে সেগুলোকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় (১) নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি; (২) দুর্যোগ এবং অন্যান্য বিপত্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেবার মত পরিকল্পনা; (৩) সন্তানের শিক্ষা প্রদানে সহায়তা করার জন্য পিতামাতাদেরকে প্রদেয় সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থা; (৪) পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্যে সরকারি ভর্তুকি কার্যক্রম। সাহায্য প্রদানের ধরন অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তাকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে– (ক) সরাসরি নগদ টাকা প্রদান করা এবং (খ) খাদ্য প্রদান করা।

সরকারি এই প্রচেষ্টার ফলে দেখা গেছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। শিক্ষায় জেন্ডার পার্থক্য কমেছে, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে, বিভিন্ন দুর্যোগে খাদ্য সহায়তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে, মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা বেড়েছে, সরকারের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বঞ্চিত মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা–যাতে তারাও এক সক্ষম জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হতে পারে।

১৬ কোটির অধিক মানুষের এই ছোট দেশে সব মানুষের সুযোগ সৃষ্টি করা সহজ কাজ নয়। এ জন্য দরকার এক শক্তিশালী অর্থনীতির, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাংলাদেশে এখনো পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। আবার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে বলে তারা অর্থনীতিতে শক্ত কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এই দুর্বলতম অংশকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনাগুলো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

সীমিত সম্পদ এবং সীমিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে বাড়তি জনসংখ্যার চাপকে প্রায়শই সামাল দেওয়া সম্ভব হয় না। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, নদীভাঙন ইত্যাদি নানা কারণে গ্রাম থেকে বহুমানুষ জীবিকার আশায় শহরমুখী হয়। একারণে শহরে বস্তি গড়ে উঠছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগই শহরবাসী অথচ বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করাও সব সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। গ্রামের মানুষকে গ্রামে ধরে রাখার জন্য এবং উৎপাদন বাড়াবার জন্য সরকার কৃষিতেও ভর্তুকি দিচ্ছে। দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের ভিত্তিতে ১৯৮৮-৮৯ সময়ে দারিদ্রের হার ছিল শতকরা ৪৭ ভাগ। সরকারের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার ফলে গ্রামীণ ও শহুরে দারিদ্র্য উভয়েই কমানো সম্ভব হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা

বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে দারিদ্র দূরীকরণে উন্নয়ন পরিকল্পনার শীর্ষে ঠাঁই দিয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রের মাত্রা শতকরা ১৫ ভাগে নামিয়ে আনা। এক্ষেত্রে ধারণা করা হচ্ছে অবকাঠামোগত বিনিয়োগ, যেসব মৌসুমে কাজ থাকে না সেসব মৌসুমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং সেই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে দারিদ্রের হার লক্ষণীয় মাত্রায় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে তাদেরকে যারা চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে, দরিদ্র নারীদেরকে, ভূমিহীন এবং অন্যান্য বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে। একটি শক্তিশালী এবং বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনাই পারে দারিদ্র্যকে পুরোপুরি নির্মূল করতে। সরকারের লক্ষ্য সেটাই।

সরকারের অর্থবাজেট ও পরিসংখ্যানে তাই সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Net) র আওতায় চার ধরনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে: (১) সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা, যাতে করে গরীব ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী দারিদ্রকে ভালভাবে সামাল দিতে পারে; (২) ক্ষুদ্রঋণ এবং অন্যান্য তহবিল গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্র ও চাকুরির নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা; (৩) খাদ্য নিরাপত্তাভিত্তিক কার্যক্রম-যাতে করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সমস্যাদি অঞ্চলভেদে তারা নিজেরাই সমাধান করতে পারে এবং (৪) শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ট্রেনিং এর পরিধি বাড়ানো যাতে নতুন প্রজন্মকে আরো বেশি করে সক্ষম এবং স্বনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।এর আওতায় এ টাকা ব্যয় হবে কয়েকটি ক্ষেত্রে, এর মধ্যে রয়েছে Food For Works (FFW) বা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, Vulnerable Group Feeding (VGF), Gratuitious Relief (G R Food), এবং চট্রগ্রামে পাহাড়ী অঞ্চলে খাদ্য সহায়তা প্রদান। বয়স্কভাতার পরিধিও বাড়ানো হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উদ্যোগ, পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক নির্বাচিত সরকারই করে থাকে। এর লক্ষ্য থাকে সামাজিক ঝুঁকি মোকাবিলা, দারিদ্র দূরীকরণ এবং দুর্বলতম জনগোষ্ঠীকে সক্ষমতার পথ দেখিয়ে তাদেরকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

দরিদ এবং অসচ্ছল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনার নাম হলো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। দরিদ্র এবং হতদরিদ্র মানুষদের সহায়তাদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নানামুখী পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারি এ পরিকল্পনার ফলে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বঞ্চিত মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা– যাতে তারাও এক সক্ষম জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা কে করা ভাগে করা যায় ?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৬টি

২। নিচের কোনটি Social Safety Net নয়

(i) Food For works

(ii) Vulnerable group Food

(iii) Gratuitous Relief

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) ii + iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। কোন ক্ষেত্রে অসমতা নেই ?

(ক) রাজনীতি (খ) আয় ও সম্পদ

(গ) জাতি (ঘ) কোনোটিই নয়

২। হাম্বুরাবির আইন অনুসারে দাসপ্রথা-

(ক) বৈধ (খ) অবৈধ

(গ) শুধু নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য (ঘ) শুধু নির্দিষ্ট পেশার জন্য প্রযোজ্য

খ) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩। 'Dominant Ideology'-র ধারক-বাহক কোনটি?

(i) ধর্ম

(ii) শিক্ষা

(iii) গণমাধ্যম

সঠিক উত্তর কোনটি?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

ময়মনসিংহ জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে রতনের বাড়ি। সে পেশায় কৃষক। তার অনেক জমি ছিল। গ্রামের মোড়লের ধার শোধ দিতে না পারায় মোড়ল রতনের সকল জমি দখল করে নেয়। এখন সে মোড়লের অধীনে কাজ করে। মোড়ল যখন যা বলে রতন তা শুনতে বাধ্য থাকে।

১) সামাজিক স্তরবিন্যাস কী?

২) সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন কয়টি ও কী কী?

৩) উদ্দীপকটি সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন ধরনকে সমর্থন করে?

৪) উদ্দীপকের রতন ও মোড়লের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সামন্ত প্রথার কোন দুই চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে? মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ ঃ ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ ঃ ১। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ ঃ ১। খ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ ঃ ১। গ ২। গ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও গতিশীলতা
Social Control and Mobility

ইউনিট ৯

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। সমাজে সকল মানুষকেই কতকগুলো বিধিবদ্ধ আইন-কানুন ও প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। সমাজের প্রচলিত আইন-কানুন ও রীতিনীতি মেনে চললে সমাজের শান্তি-শৃংখলা, মূল্যবোধ বজায় থাকে। সমাজে বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা অর্থাৎ সবার সাথে সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তা বজায় রাখার মধ্যে শান্তি-শৃংখলা নিহিত থাকে। আর এসব কাজ করতে যেসব আইন-কানুন মানতে হয়, সাধারণ কথায় তাকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে। আমাদের সমাজে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক নামে দু'ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ বিশেষ বাহন কাজ করে থাকে। যেমন: জনমত, গণমাধ্যম, রাষ্ট্র, আইন, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি, পরিবার, ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি। অন্যদিকে, সামাজিক গতিশীলতা হলো সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের এক ধরনের পদমর্যাদা থেকে অন্য ধরনের পদমর্যাদায় রূপান্তর। সমাজে নানা পেশা ও বর্ণের মানুষ বাস করে। এদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা থাকে পদমর্যাদার উন্নয়ন। দু ধরনের সামাজিক গতিশীলতা রয়েছে, যথা: উলম্ব সামাজিক গতিশীলতা এবং সমান্তরাল সামাজিক গতিশীলতা। স্থানান্তর গমন বলতে একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে দূরে কোনো এলাকায় স্থায়ীভাবে চলে যাওয়াকে বোঝায়। একই এলাকার এক প্রান্ত থেকে বসতি উঠিয়ে ঐ এলাকার অন্য প্রান্তে বসতি স্থাপন করাকে স্থানান্তর গমন বলে না।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৯.১: সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ- ৯.২: সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ
পাঠ- ৯.৩: সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবার ও ধর্মের ভূমিকা
পাঠ- ৯.৪: সামাজিক গতিশীলতা
পাঠ- ৯.৫: স্থানান্তর গমন: ধারণা, প্রক্রিয়া ও প্রভাব

পাঠ-৯.১ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
Definition and Cahracteristics of Social Control

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

মৌলিক ধারণা

সমাজ জীবনে মানুষ পুরোপুরি স্বাধীন নয়, বরং তাকে অনেক আইন-কানুন মেনে সমাজে বসবাস করতে হয়। 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থে রুশো যেমনটি বলেছেন- 'মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মায় কিন্তু সর্বত্র সে শৃংখলে আবদ্ধ।' এ শিকল মূলত শৃংখলা বজায় রাখার জন্য, মানুষকে বিশৃংখল হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য। এসব নিয়মকানুনের একটা দিক মানুষ এমনিতেই মেনে চলে যেমন শিক্ষকদের সম্মান করা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো মানুষ তার সংস্কৃতি থেকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখে থাকে। অন্যদিকে, কিছু নিয়মকানুন মানুষ ভীতি বোধ থেকে মেনে চলে। যেমন- আইন-আদালতের শাস্তি। যে প্রক্রিয়ায় সমাজের মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা হয় তাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন:

"সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো সে সব পদ্ধতির সমাহার যেগুলোর মাধ্যমে সমাজ মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় এবং একটা শৃংখলা বজায় রাখতে সমর্থ হয়।" - ম্যানহেইম

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় শৃংখলা বজায় রাখার জন্য ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন ধরে রাখার জন্য সমাজ যে বিধি নিষেধগুলো আরোপ করে।" - অগবার্ন ও নিমকফ।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া ও কৌশল যার মাধ্যমে সমাজে বসবাসকারী মানুষদেরকে প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণযোগ্য আচরণের নিয়মকানুন মেনে চলে একত্রে মিলেমিশে থাকতে শেখায়"- ই.এ.রস।

অর্থাৎ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে, মানুষকে আইনের প্রতি ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখায়। মানুষকে একত্রে মিলেমিশে থাকতে শেখায় এবং সমাজের শৃংখলা মেনে চলতে শেখায়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা। এছাড়া সমাজের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক সংহতি সৃষ্টিও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিম্বল ইয়ং- এর মতে, সমাজের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি এবং শৃংখলা ধরে রাখার জন্য সমাজ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হল:

- সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রধানত দু ধরনের হয়ে থাকে- (১) আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও (২) অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ। সমাজের মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের তাগিদে ও আচরণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উৎসাহ দানের জন্য দুই ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণই প্রচলন থাকে।

- সামাজিক নিয়ন্ত্রণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এটি কেবল বিশেষ একটি সময়ের জন্য কার্যকর নয়। ব্যক্তি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানিক আইন-কানুনের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনগুলো সম্পর্কে জানতে পারে।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনগুলো শুধু কোনো বিশেষ সমাজের জন্য প্রযোজ্য নয় বরং এটি সকল সমাজের জন্য প্রযোজ্য। শুধু দেশ-কাল-সময়ভেদে বাহনগুলোতে আংশিক পরিবর্তন হতে পারে মাত্র।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আনুষ্ঠানিক বাহনগুলো সাধারণত কঠোরভাবে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন: আইন, আদালত। আইনে নির্দিষ্ট আচারণ লংঘনের দায়ে কঠোর শাস্তি হতে পারে।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো অপেক্ষাকৃত কম কঠোর। মানব আচরণের অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো যেমন শিষ্টাচার, আদব-কায়দা ইত্যাদি ভঙ্গের কারণে আদালতের মতো কঠোর শাস্তি পেতে হয় না।
- প্রত্যেক সমাজে অনানুষ্ঠানিক সমাজ নিয়ন্ত্রণের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব সৃষ্টিকারী মাধ্যম থাকতে পারে। এগুলোর মধ্যে জনমত, গণমাধ্যম, নেতৃত্ব, ধর্মীয় অনুশাসন, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত উল্লেখযোগ্য।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মানব সমাজের মতোই প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। মানুষের এমন সমাজ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, যে সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কোনো ধারণা নেই।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব সার্বজনীন। অর্থাৎ যেখানে মানুষের সমন্বয় ঘটেছে, সমাজ তৈরি হয়েছে সেখানেই এর প্রভাব ফুটে উঠেছে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সমাজের আইন-কানুন মেনে চলা ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বজায় রাখতে সহায়তা করা কে বোঝানো হয়। সমাজে বসবাসকারী সকল সদস্য এটা মেনে চলবে-এমনটাই তার কাছ থেকে সমাজ প্রত্যাশা করে। এর ব্যত্যয় ঘটলে সমাজের কঠোর রূপ দেখতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজজীবনে শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য মানুষ বিভিন্ন প্রথা, মূল্যবোধ, আইন-কানুন ইত্যাদি মেনে চলে। এ বিষয়গুলো মানুষ তার সংস্কৃতি থেকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে। মানুষকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে, একত্রে মিলেমিশে থাকতে এবং সমাজের শৃখলা মেনে চলতে শেখায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নৈর্বাচনিক প্রশ্ন :

১। কোনটি সমাজ নিয়ন্ত্রণের প্রভাব ?
(ক) তাৎক্ষণিক (খ) ব্যক্তিগত (গ) সর্বজনীন (ঘ) কোনোটিই নয়।

২। কোনটি সৃষ্টি করা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ?
(ক) জনমত (খ) আইন (গ) সংবাদমাধ্যম (ঘ) সংহতি।

৩। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ একটি ---- প্রক্রিয়া।
(ক) উদ্দেশ্যমূলক (খ) স্থবির (গ) চলমান (ঘ) জটিল

৪। কোন সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর নয় ?
(ক) এশীয় (খ) ইউরোপীয়ান (গ) আফ্রিকান (ঘ) কোনোটিই নয়।

পাঠ-৯.২ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ
Agents of Social Control

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন, আনুষ্ঠানিক বাহন, অনানুষ্ঠানিক বাহন ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজকে একই সাথে যেমন অগ্রগতির দিকে নজর রাখতে হয় আবার সেই অগ্রগতির পথে যাতে আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকেও নজর রাখতে হয়। আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে সমাজ নিয়ন্ত্রণ এক অপরিহার্য বিষয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অনেকভাবে সম্ভব হতে পারে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ

যে সব উপায়কে অবলম্বন করে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় সে সব উপায়কে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন বলা হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনেক বাহন রয়েছে। এ বাহনগুলোকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা: ১) বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক বাহন এবং ২) অভ্যন্তরীণ বা অনানুষ্ঠানিক বাহন। আনুষ্ঠানিক বাহনের মধ্যে রয়েছে আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ধর্মীয় পুরোহিত, শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, পুলিশ ও সামরিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। আর অনানুষ্ঠানিক বাহনের মধ্যে আছে এমন সব উপাদান যা মানুষকে তার আভ্যন্তরীণ তাড়না থেকেই নিজেকে সংযত আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং বিচ্যুত আচরণ করতে নিরুৎসাহিত করে। সমাজের মানুষ মনে করে সংযত আচরণ করাই হল তার নিকট সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করা। অনানুষ্ঠানিক বাহনের মধ্যে রয়েছে তার মূল্যবোধ, নীতি ও নৈতিকতাবোধ, শিক্ষা, কৃষ্টি সমাজের থেকে শেখা নিজস্ব মতামত ইত্যাদি।

১) জনমত: জনমত সমাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যমত কার্যকর বাহন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রথম যিনি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন তিনি হচ্ছেন সমাজবিজ্ঞানী E.A .Ross। রস জনমতকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম শক্তিশালী বাহন হিসেবে উল্লেখ করেন। জনমতের ভয় কে না করে? ব্যক্তির ভাব-ভঙ্গি, চলাফেরা, কাজকর্ম তথা তার আচার-আচরণ সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের জানা থাকে। জনমত হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের একটি সাধারণ বিচারবোধ (Judgement)। ব্যক্তি জনমতের ভয়ে ও লজ্জায় তার আচরণকে সংশোধন করে নেয় এবং তাকে সমাজ নিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করে। সমাজে সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় জনমতের ভূমিকা বেশ ব্যাপক।

প্রথমত, জনমত দ্বারা ব্যক্তি চরিত্র সংশোধিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
দ্বিতীয়ত, জনমত কোনো সংঘ, গোষ্ঠী, এমন কি, রাজনৈতিক দলের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে।
তৃতীয়ত, জনমত কোনো প্রচার মাধ্যমকে যেমন রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কেননা জনমত কর্তৃক সমালোচিত বা উপেক্ষিত হবে এমন অনুষ্ঠান বা সংঘবদ্ধ প্রচার থাকে ঐসব প্রচারে গণমাধ্যম বিরত থাকে।
চতুর্থত, জনমত সরকারকেও নিয়ন্ত্রণ করে। গণতান্ত্রিক দেশের সরকার জনমত বা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকে। অধিকন্তু, সরকার কখনো কোনো পরিকল্পনা গ্রহণের প্রাক্কালে জনমত যাচাই করে নেয়।
পঞ্চমত, জনমত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকেও নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রামীণ সমাজ নিয়ন্ত্রণে জনমতের ভূমিকা খুবই কার্যকর। কেননা সেখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। সমাজে অতি নিন্দনীয় কাজ করলে সেখানে জনগণ তাকে বয়কট করতে পারে। বস্তুত, সামাজিক বয়কট এক বেদনাদায়ক শাস্তি। শহুরে সমাজে জনমতের গুরুত্ব অবশ্য কম নয়। তবে তা নির্ভর করে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং পরিস্থিতির উপর।

২) গণমাধ্যমের ভূমিকা: সমাজ নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা বেশ ফলপ্রসূ হতে পারে। গণমাধ্যম সমাজের গলদ, অন্ধবিশ্বাস, অনিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেতার, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, ছায়াছবি ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

৩) রাষ্ট্র: রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারই দেশ পরিচালনা করে। দেশের সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কাজ-কর্ম চালিয়ে যায়। আইনের শাসন সুনিশ্চিত করলে এবং জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করলে সমাজ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। রাষ্ট্রের কর্তব্যই হলো জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে তার নিয়ন্ত্রণ মূলক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। রাষ্ট তিনটি উপায়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। যথা: পুলিশ, আদালত এবং কারাগার। পুলিশের কাজ হচ্ছে আইন- শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এ কাজ করতে গিয়ে সন্দেহজনক ব্যক্তি বা বিপথগামীদের পুলিশ গ্রেফতার করে এবং প্রাথমিক রির্পোট প্রদান করে। আদালতের কাজ হলো গ্রেফতারকৃত বা অভিযুক্ত ব্যক্তিটি মূলত বিপথগামী বা অপরাধী কিনা তা পুংখানুপুংখরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করা। আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ মনে করলে মুক্তি দেবে নতুবা আইনানুযায়ী শাস্তি প্রদান করবে। এর পরই আসে কারাগারের কথা। কারাগার অপরাধীর জন্য মূলত একটি শাস্তিনিবাস। তবে কোনো কোনো সমাজ অপরাধীর চারত্রিক সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এভাবে রাষ্ট্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি বলিষ্ঠ বাহন হিসেবে কাজ করে থাকে।

৪) আইন: আইন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বাহন। আইনের দু'টি আবেদন রয়েছে। যথা: ১) আইন জনসাধারণকে বেআইনি কিছু করা থেকে বিরত থাকতে আবেদন জানায় এবং ২) আইন কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে জনসাধারণকে অসামাজিক কিছু করা থেকে বিরত থাকতে আবেদন জানায়। এভাবে আইন বিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকা এবং আইনুযায়ী কর্তব্য পালন করে যাওয়াই আইনের শিক্ষা। সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আইন তাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আইনকে যদি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসেবে কাজ করতে হয় তাহলে কতিপয় শর্ত পালন করতে হবে। যেমন:

১. আইনের বিধান সম্পর্কে জনসাধারণকে অভিহিত করতে হবে। কেননা অনেকেই আইন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উদাসীন। ফলে জনসাধারণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য সর্ম্পকে ধারণা অর্জন করতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন এলাকায় আইন সম্পর্কে আলোচনার আয়োজন করা।
২. জনসাধারণের একটি অংশ বা কোনো ব্যক্তি যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় সে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। কেননা আইন যদি ব্যক্তির হাতের পুতুলে পরিণত হয় তবে জনসাধারণ আইনের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা হারাবে।
৩. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। মূলত, এই তিনটি শর্ত পালন রাষ্টীয় উদ্যোগের অপরিহার্য অংশ।

৫) প্রথা, ধর্ম ও নৈতিকতা: ধর্ম তাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম শক্তিশালী বাহন। কারণ-

প্রথমত, ধর্ম পার্থিব জীবনে ব্যক্তিকে সৎ, কর্তব্যপরায়ণ, সত্যবাদী ও বিনয়ী হবার শিক্ষা দেয়। ফলে ধর্মের সামাজিক ভূমিকাকে কেউ, এমন কি অভয়বাদী ব্যক্তিও উপেক্ষা করতে পারে না ।

দ্বিতীয়ত, ধর্ম কেবল সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ হবার শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না। অসৎ পথে জীবনযাপন করলে যে মহা শাস্তি ভোগ করতে হবে সে সম্পর্কেও ধর্ম মানুষকে সাবধান করে দেয়।

তৃতীয়ত, ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ জানে যে তার কাজকর্ম বা আচার-আচরণ সমাজের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লক্ষ না করলেও সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে সে নিজেই নিয়ন্ত্রিত হয়।

চতুর্থত, ধর্ম হচ্ছে একটি জীবন দর্শন। ধর্ম মানুষকে একটি আদর্শ জীবনের শিক্ষা দেয়।

পঞ্চমত, ধর্মের অখন্ড আবেদন রয়েছে। কেননা ধর্ম পার্থিব জগতের পরেও পারলৌকিক জগৎ সম্পর্কে ধারণা দেয়।

৬) পরিবার: পরিবার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাহন। পরিবারের অন্যতম কাজ হলো সন্তান-সন্ততিকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ কাঙ্খিতভাবে সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা। পরিবারে ব্যক্তি শৃঙ্খলা দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা পায়। সে কারণে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকাকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা চলে না।

প্রথমত, পরিবারই ব্যক্তিকে সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শানুযায়ী সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে তুলে।

দ্বিতীয়ত, পরিবারের গন্ডিতে বসবাস করতে গিয়ে শৃঙ্খলা ও সংহতিবোধের প্রয়োজন হয়।

তৃতীয়ত, পরিবার এমনই একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান, সাময়িকভাবে বিপথগামী ও সমাজবিরোধী পারিবারিক সদস্যকে সংশোধন করতে পারে।

চতুর্থত, প্রতিটা পরিবারের রয়েছে একটা নিজস্ব আত্মসম্মানবোধ। কেউ ব্যক্তিগত বদনামের ভাগী হলেও নিজের পরিবার সম্পর্কে ঢালাও বদনাম গ্রহণে বাধ্য নয়। তাই পরিবার তার নিজস্ব মান-মর্যাদার কথা চিন্তা করে পরিবারের সবার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
পঞ্চমত, পারিবারিক পরিবেশই ব্যক্তির মনোভাব ও ব্যক্তিত্বের মৌল কাঠামো গড়ে উঠে। এই মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ীই সমাজ মানুষ আচরণ করে।

৭) উৎসব: সামাজিক নিয়ন্ত্রণে উৎসব অনুষ্ঠানের ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের জীবন কাটে নানাবিধ উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্য নিয়েই। উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যখন কেউ কোনো কিছু গ্রহণ করে বা কাজ করে তখন সে সব কাজকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেননা আচার অনুষ্ঠানে থাকে কিছু নিয়ম, রীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি। কোনো কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ হবার সময় ঐ সব নিয়ম, রীতি, মূল্যবোধের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি বেড়ে যায় যা তার আচরণের উপর প্রভাব রাখে এবং এভাবে সে সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়।

৮) শিল্পকলা: শিল্পকলা নানাভাবে জাতির পরিচয় তুলে ধরে। ছবি, চিত্র, নকশা ইত্যাদির মাধ্যমে শিল্পী বিদ্যমান সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এসব শিল্প-কলা সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটি সাধারণ আবেগ ও চেতনা প্রকাশ করে। কোন দুর্ভিক্ষের চিত্র, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র, গণহত্যা বা যুদ্ধের চিত্র যেমন মানুষকে ব্যথিত করে, উদার ও আত্মত্যাগী হবার অনুপ্রেরণা যোগায়, তেমনি জাতীয় জীবনের কোনো বিজয় বা আনন্দের দৃশ্যনির্ভর অংকিত চিত্র মানুষকে গর্ব করতে শেখায়। এতে জাতীয় জীবনে সংহতি বৃদ্ধি পায়, যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম লক্ষ্য।

৯) পৌরাণিক কাহিনী: সাধারণত পৌরাণিক কাহিনী হচ্ছে কল্পনাশ্রয়ী গল্প। পৌরাণিক কাহিনী বানোয়াট হলেও তাতে উপদেশ, নীতিবাক্য, পাপীর দুর্গতি, পুণ্যবানের সৌভাগ্য, মিথ্যার পরাজয়, সত্যের জয় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক শিক্ষণীয় উপাদান রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী অবললম্বনে নাটক ও ছায়াছবি প্রণীত হয়। সুয়োরাণী-দুয়োরানী, বেহুলা, লাইলী মজনু, সাত-ভাই চম্পা ইত্যাদি কাহিনীতে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদির ধারণা রয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকেরা ন্যায়, সত্য ও পুণ্যের জয় দেখে আনন্দে হাত তালি দেয়। আবার এসব অন্যায়, অসত্য ও পাপের প্রতি তাদের মনে ঘৃণা জাগিয়ে তুলে।

১০) প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতি: সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতি সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতি মেনে চলতে হয় এবং এ শিক্ষা সে বাল্যকাল থেকেই পেয়ে থাকে। বস্তুত, প্রথা, লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতির বিরুদ্ধাচরণ করে সমাজে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রথা, লোকাচার, লোকরীতি, আদব-কায়দা ইত্যাদি সামাজিক ঐক্য ও সংহতিকে জোরদার করে।

১১) নিষেধাজ্ঞা বা ট্যাবু: ট্যাবু বলতে বোঝায় কোনো কিছু করার উপর নিষেধ আরোপ। ট্যাবুর পেছনে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের প্রশ্ন জড়িত। আদিম সমাজে ট্যাবুর ভূমিকা ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিচিত্র ধর্ম বিশ্বাসের অনুসারী আদিম জনগোষ্ঠী যখন বিশ্বাস করত যে, এসব কাজ করলে রোগ মহামারীতে জীবন নাশ হবে, ফসলের ক্ষতি হবে কিংবা গোষ্ঠী হিসেবে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে তখন তারা ঐসব কাজের উপর ট্যাবু আরোপ করতো। এভাবে ট্যাবু ব্যক্তির আচার -আচরণ নিয়ন্ত্রণ তথা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতো।

১২) ব্যক্তিত্ব: বিশিষ্ট ব্যক্তি জীবনাদর্শ সমাজ নিয়ন্ত্রণে খুবই কার্যকর এবং সাধারণ মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে। আদর্শ ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, ধর্মীয় নেতা সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে অনুকরণীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য। ন্যায়-নীতি ও আদর্শের প্রতীক ঐ সব ব্যক্তির জীবন-দর্শন মডেলে পরিচালিত করে, যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে খুবই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) এক ধরনের নেতাদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন (Charismatic leader) বলে আখ্যা দিয়েছেন । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নেলসন মেন্ডেলা, মহাত্মা গান্ধী এ ধরনের ব্যক্তিত্বের উদাহরণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এক অপরিহার্য বিষয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অনেকভাবে সম্ভব হতে পারে। সে সব উপায়কে সমাজ অবলম্বন করে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় সে সব উপায়কে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন বলা হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনেক বাহন রয়েছে। আনুষ্ঠানিক বাহনের মধ্যে রয়েছে যেমন আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ধর্মীয় পুরোহিত, শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, পুলিশ ও সামরিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। আর অনানুষ্ঠানিক বাহনের মধ্যে আছে এমন সব উপাদান যা মানুষ কে তার আভ্যন্তরীণ তাড়না থেকেই নিজেকে সংযত আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং বিচ্যুত আচরণ করতে নিরুৎসাহিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সাামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনানুষ্ঠানিক বাহন এর সাথে জড়িত নিচের কোনটি ?

(ক) আইন ও বিচার ব্যবস্থা (খ) ধর্মীয় পুরোহিত

(গ) মূল্যবোধ (ঘ) পুলিশ ও সামরিক ব্যবস্থা

২। `Charismatic leader' সম্পর্কে ধারণা দেয় কোন বাহনটি ?

(i) জনমত

(ii) ধর্ম

(iii) ব্যক্তিত্ব

(ক) i+ iii (খ) ii (গ) iii (ঘ) i+ ii + iii

পাঠ-৯.৩ সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবার ও ধর্মের ভূমিকা
Role of Family and Religion in Social Control

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন;
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ধর্ম, পরিবার, পরিবেশ, সংস্কৃতি, সমাজ, ইন্টারনেট, ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সমাজ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সমাজের শৃঙ্খলা ধরে রাখার জন্য কিছু কিছু নিয়ম কানুনেরও সৃষ্টি হয়েছে। যেগুলো মেনেই আমাদেরকে সমাজে বসবাস করতে হয়। সমাজে আমরা ইচ্ছে-খুশি মত আচরণ করতে পারি না। সমাজের নিয়মকানুনগুলোই আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজের প্রত্যেক সদস্য এসব নিয়ম সম্পর্কে অবগত হয় ও মেনে চলে। এভাবেই মানব সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো সমাজের মানুষের বিচ্যুতিমূলক যাবতীয় আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি ও পন্থা।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভূমিকা

অতিপ্রাকৃত শক্তিতে মানুষের প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয় ধর্মের। ধর্মের ধারণাই হলো মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। মানুষের যেসব আচরণ স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ধরে রাখতে সাহায্য করে তাকে ধর্মীয় আচরণ বলা হয়। সমাজের ধর্মীয় আচরণগুলো সমাজের সাথে সবর্দা সংগতিপূর্ণ হয়ে থাকে। ধর্মীয় আচরণের বিধিমালা অনুসরণ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে মানুষ সামাজিক শৃঙখলাকেই ধরে রাখে। ধর্মীয় আচারণবিধির মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে ভাল, অনুগত, সংবেদনশীল ও সহায়তাকারী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। সমাজের উদ্দেশ্যও একই। ধর্ম মানুষের বিচ্যুতিমূলক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে ইহজগত ও পরজগতের পুরস্কারের আশা দেখিয়ে। যেমন: চুরি না করা, মিথ্যা কথা না বলা, হত্যা না করা ইত্যিাদি। সমাজও এসব বিচ্যুতিমূলক আচরণকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, তবে শাস্তির ভয় দেখিয়ে। এসবের ফলে মানুষ বিচ্যুতিমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকলে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। ধর্মের রয়েছে পুরষ্কার (স্বর্গ) ও শাস্তির (নরক) ধারণা। মানুষ পার্থিব ও অপার্থিব পুরষ্কারের আশায় বিচ্যুতিমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে, ভাল থাকার চেষ্টা করে ও স্রষ্টার আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করে। মানুষের ভাল কাজ করার প্রবণতা সমাজকে আরো সংহত করে। স্রষ্টা তথা অতিপ্রাকৃত শক্তির বিরোধিতা করাকে সে রীতিমত ভয় পায়। এই ভয়েও তাকে ধর্মীয় রীতিনীতি লঙ্ঘন করতে নিরুৎসাহিত করে। এদিক দিয়ে ধর্ম সমাজ নিয়ন্ত্রণের দারুণ এক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ধর্ম বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য নিরূপিত হয় ধর্মীয় বিধান দ্বারা। মা-বাবার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির সর্ম্পক নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাবে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নীতিও ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত। ধর্ম উত্তরাধিকার নীতি রাষ্ট্রের দ্বারাও স্বীকৃত। এভাবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নির্ণীত হয় ধর্মীয় শিক্ষানুযায়ী। এখনও ধর্ম বিরোধী আচরণ করলে সমাজচ্যুত বা বয়কট করা হয়। একটি অবস্থায় ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকা

পরিবারকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম বলে মনে করা হয়। এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। যেমন:
প্রথমত, পরিবার থেকে মানুষ অন্যদের সাথে মিলেমিশে চলার শিক্ষা পায়, নিজের ছাড়াও অন্যদের বিষয়ে ভাবতে শেখে, শৃঙ্খলা ও সংহতিবোধের শিক্ষা পরিবার থেকেই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, পরিবার আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে। সে কারণেই মানুষ পরিবারের কাছেই মন খুলে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। পরিবার মানুষের মানসিক আশ্রয়।

তৃতীয়ত, পরিবার শিশুকে যে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য, নীতিবোধের শিক্ষা দেয় তা তার মধ্যে সারাজীবন কাজ করে। কোনো বিচ্যুত আচরণের জন্য পরিবারের কোনো সদস্য হয়ত কড়াভাবে শাসন করেন। এ শিক্ষাটি তার মধ্যে কাজ করে। সে কারণে কোনো ব্যক্তি বিচ্যুত আচরণ করতে চাইলেও পারিবারিক শিক্ষা তাকে বাধা দেয়।

চতুর্থত, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমরা দেখি, ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষা পরিবার থেকেই শুরু হয়। ধর্মের মূলনীতিসমূহ মেনে চললে সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরির সুযোগ থাকে না। ধর্মীয় গোঁড়ামীর স্থলে ধর্ম উদারনীতিকেই সমর্থন করে। এটা ব্যক্তির উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব তৈরি করে।

পঞ্চমত, প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক টানও রয়েছে। কোন কাজ করলে পরিবারের সদস্যরা অসম্মানিত হবেন অথবা পরিবারের সদস্যরা আঘাত পাবেন এমন কাজ থেকে ব্যক্তি বিরত থাকার চেষ্টা করে। এটাও সমাজ নিয়ন্ত্রণের এক শক্তিশালী মাধ্যম।

ষষ্ঠত, পারিবারিক শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ যে শিক্ষা তাকে দেওয়া হয় ফিরে ফিরে আসে শিশুর আচরণের মধ্য দিয়ে।

সপ্তমত, পরিবার থেকে শিশুকে যত ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম জরুরি বিষয় হলো গণতান্ত্রিকতার শিক্ষা। আইনের চোখে সবাই সমান, সকল পরিবার একই মর্যাদার অধিকারী, ধনী-গরীব কারো জন্যই আইন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে না। এ ধরণের শিক্ষা শিশুর মধ্যে অন্যদের সম্পর্কে মূল্যবোধের জন্ম দেয় এবং পরিবারের মানুষের চোখে 'ভালো মানুষ' হয়ে উঠতে চেষ্টা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভুমিকা সম্পর্কে লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজের ধর্মীয় আচরণগুলো সমাজের সাথে সবর্দা সংগতিপূর্ণ হয়ে থাকে। ধর্মীয় আচরণের বিধিমালা অনুসরণ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে মানুষ সামাজিক শৃঙখলাকেই ধরে রাখে। ধর্মীয় আচারণবিধির মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে ভালো, অনুগত, সংবেদনশীল ও সহায়তাকারী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিবার একটা অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। জন্মের পর থেকেই শিশুর মধ্যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবার সমাজের নীতিশিক্ষা, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, প্রথা পদ্ধতি গ্রোথিত করে দেয়। পরিবার থেকে শিশু তার ব্যক্তিত্ব, কর্তব্য, দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলার শিক্ষা পায় এবং সে অনুযায়ীই সে বেড়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রন বলতে কী বুঝায় ?

(ক) লিখিত আইন নেই (খ) কর্তৃপক্ষ নেই

(গ) লিখিত নিয়ম অনুসারে (ঘ) সামাজিক শাস্তি

২। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হলো শৃঙ্খলা এবং প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন বজায় রাখার জন্য যত ধরনের চাপ তৈরি করে"- উক্তিটি কার ?

(ক) ম্যানহেইমের (খ) অগবার্ন ও নিমকফের

(গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) ম্যাকস ওয়েবার

পাঠ-৯.৪ সামাজিক গতিশীলতা
Social Mobility

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক গতিশীলতার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী গতিশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- সামাজিক গতিশীলতার ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক গতিশীলতা, পদমর্যাদা, উলম্ব, সমান্তরাল, ব্যক্তি, গোষ্ঠী ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

আমরা যারা সমাজে বসবাস করি আমাদের প্রত্যেকেরই একেক ধরণের সামাজিক মর্যাদা রয়েছে। পরিবার আমাদের প্রতি কী ধরণের মর্যাদা দিয়েছে কিংবা আমরা সমাজে কী ধরণের ভূমিকা পালন করি তার উপর ভিত্তি করে এই সামাজিক মর্যাদা তৈরি হয়। জন্মসূত্রে পরিবার আমাদেরকে যে ধরণের সামাজিক মর্যাদা প্রদান করে তাকে আরোপিত মর্যাদা বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কৃষকের ছেলে, জমিদারের নাতি। পরিবার সূত্রেই এ পদমর্যাদা তৈরি হয়েছে। পক্ষান্তরে আমরা আমাদের কর্মের মাধ্যমে নতুন যে মর্যাদা অর্জন করি তাকে বলা হয় অর্জিত মর্যাদা।

সামাজিক গতিশীলতা

আমাদের সমাজ স্থবির নয়, বরং তা গতিশীল। এ গতিশীল সমাজের ঘটনা পরম্পরা ব্যক্তি জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ব্যক্তি জীবনেও তাই উত্থান-পতনের খেলা চলে। মানুষের সামাজিক পদমর্যাদাতেও আসে ব্যাপক পরিবর্তন। মানুষ সবসময় তার মর্যাদা বাড়াতে সচেষ্ট থাকে এবং তার বর্তমান পদমর্যাদা থেকে আরো উঁচু পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার সাধারণ অবস্থা, সাধারণ মানের মর্যাদা, ক্ষমতা ও আর্থিক অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থা, উঁচু সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সামাজিক গতিশীলতা বলে। সহজ কথায় সামাজিক গতিশীলতা হলো সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তন।

*"সামাজিক গতিশীলতা হলো ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের একধরণের পদমর্যাদা থেকে অন্যধরণের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া।" ("*Social mobility is the movement of a person or person from one social status to another.*")* Wallace & Wallace, Sociology; P-275

সামাজিক গতিশীলতা বলতে বোঝায় *"একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এক ধরণের সামাজিক শ্রেণি বা স্তরে রূপান্তরিত হওয়া।"* (Social mobility refers to "the movement of an individual or group from one social class or stratum to another.") -W.P. Scott, Dictionary of Sociology, P-260

ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী গতিশীলতা

সামাজিক গতিশীলতা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পর্যায়ের হতে পারে। এটা একদিকে যেমন ব্যক্তি পর্যায়ের হতে পারে, অন্যদিকে তেমনি পারিবারিক, গোষ্ঠীগত বা সমাজভিত্তিকও হতে পারে। ব্যক্তি পর্যায়ের গতিশীলতা হলো সেটাই যেখানে ব্যক্তির সামাজিক পদমর্যাদা নিম্নস্তর থেকে উঁচুস্তরে উন্নীত হয়। যেমন: একজন কৃষকের ছেলে ভালো পড়ালেখা করে ব্যাংকের ম্যানেজার হলো। এতে তার আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে সামাজিক মর্যাদাও বাড়ল। জিমি কার্টার একজন বাদাম চাষী পরিবারের ছেলে, পরবর্তীকালে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। এ.পি.জে. আব্দুল কালাম দারিদ্র্যের চাপে ছোটবেলায় খবরের কাগজ বিক্রি করতেন, পরবর্তীকালে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এগুলো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের পদমর্যাদা পরিবির্তন করা ।

ব্যক্তিগত গতিশীলতার মতোই যদি কোনো গোষ্ঠী একত্রে তাদের সামাজিক মান-মর্যাদা উন্নীত করতে সক্ষম হন তাহলে তাকে গোষ্ঠী গতিশীলতা বলা হয়ে থাকে। যেমন: আমেরিকায় ইহুদীরা একটা ছোট সম্প্রদায় হলেও ঐ সমাজে তারা উঁচু

মর্যাদার অধিকারী। ভারতে নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন অসমতার শিকার হওয়া থেকে মুক্তির জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস প্রথা পদ্ধতিকে গ্রহণ করে। যাতে তারা সমাজে বাড়তি সম্মান পেতে পারে। এগুলো হলো গোষ্ঠী গতিশীলতার উদাহরণ।

সামাজিক গতিশীলতার প্রকারভেদ

রাশিয়ার বংশোদ্ভুত আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী পি.এ সরোকিন দু'ধরনের সামাজিক গতিশীলতার উল্লেখ করেছেন। যথা: (১) সমান্তরাল সামাজিক গতিশীলতা এবং (২) উলম্ব সামাজিক গতিশীলতা ।

১) **সমান্তরাল সামাজিক গতিশীলতা:** যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন হয় কিন্তু মর্যাদা একইরকম থাকে, অর্থাৎ মর্যাদার তারতম্য ঘটে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে- রসায়ন শাস্ত্রের একজন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট শিক্ষা শেষে ক্যামিক্যাল কোম্পানীতে গবেষক হিসেবে নিয়োগ পেল। প্রায় এক বছর কাজ করার পর কোনো কারণে তার গবেষণা ভাল লাগলো না বলে সে কলেজে রসায়নের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলো। পেশাগত পরিবর্তনের ফলে তার সামাজিক অবস্থানে একটু পরিবর্তন এসেছে ঠিকই কিন্তু এতে তার সামাজিক মর্যাদার কোনো পরিবর্তন আসেনি। তার কারণ হলো এই দুই পেশাকে সমাজ প্রায় একই মর্যাদার বলে মনে করে। এটাই সমান্তরাল সামাজিক গতিশীলতা।

২) **উলম্ব সামাজিক গতিশীলতা:** যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক পদমর্যাদা বর্তমান অবস্থা থেকে উন্নত বা অবনত হয়। এখানে শ্রেণি, পেশা বা ক্ষমতা কাঠামোতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মর্যাদার উত্থান পতন ঘটতে পারে। এটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবন কালের যে কোনো পর্যায়ে ঘটতে পারে। উলম্ব সামাজিক গতিশীলতার অনেকগুলো ধরণ রয়েছে। এগুলো হল:

(ক) ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা
(খ) নিম্নমুখী গতিশীলতা
(গ) আন্ত:প্রজন্ম গতিশীলতা
(ঘ) অন্তস্থ প্রজন্ম গতিশীলতা এবং
(ঙ) কাঠামোগত গতিশীলতা

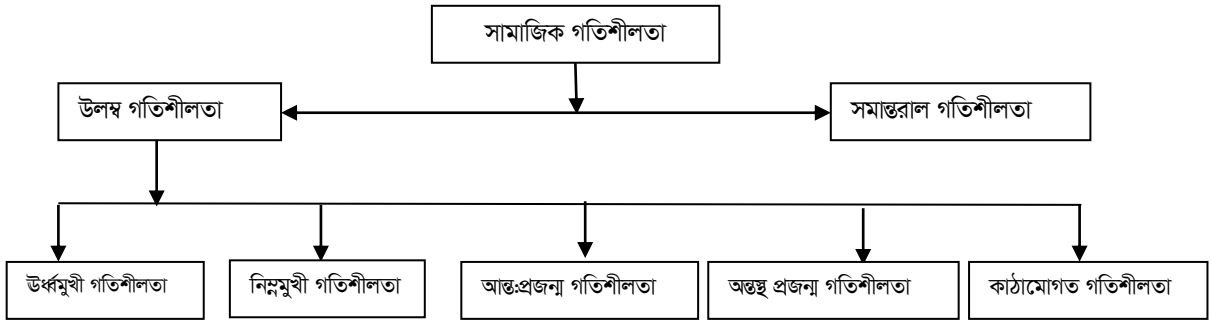

চিত্র: সামাজিক গতিশীলতার প্রকারভেদ

ক) ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা: ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা হলো সামাজিক পদমর্যাদার ক্রমোন্নতির নিরিখে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিম্ন সামাজিক পদমর্যাদা থেকে অপেক্ষাকৃত আরো উচ্চতর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হওয়া। অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিম্ন সামাজিক পদমর্যাদা থেকে উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী হয় তখন তাকে ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা বলে। যেমন: রাজমিস্ত্রীর ছেলে উচ্চশিক্ষা শেষে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন তাহলে তার পদমর্যাদা উন্নতর পদমর্যাদায় উন্নীত হয়। এটা ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা।

খ) নিম্নমুখী গতিশীলতা: নিম্নমুখী গতিশীলতা হলো সামাজিক পদমর্যাদার ক্রমোন্নতির নিরিখে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদা থেকে অপেক্ষাকৃত আরো নিম্নতর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হওয়া। অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদা থেকে নিম্ন সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী হয় তখন তাকে নিম্নমুখী গতিশীলতা বলে।

যেমন: কোনো শীর্ষ কর্মকর্তা যদি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হন ও দুর্নীতির দায়ে সাজা ভোগ করেন, তখন তার উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। এটা নিম্নমুখী গতিশীলতা।

গ) আন্তঃপ্রজন্ম গতিশীলতা: সামাজিক গতিশীলতায় সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। একটি শিশু জন্মের পরপরই পরিবার তাকে যে মর্যাদা প্রদান করে, প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় সে হয়ত নতুন মর্যাদা অর্জন করে। নতুন পদমর্যাদা অর্জনের পর শিশুর পিতামাতার পদমর্যাদার সাথে অনেক পার্থক্য ঘটে। অর্থাৎ পদমর্যাদার নিরিখে যখন এক প্রজন্ম (বাবা-মা) অপেক্ষা পরবর্তী প্রজন্ম (সন্তান) এগিয়ে যায় তখন তাকে আন্তঃপ্রজন্ম গতিশীলতা বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সামান্য কাঠমিস্ত্রি পিতার সন্তান হয়ে বিল গেট্স সমসাময়িক পৃথিবীর শীর্ষ ধনী হয়েছেন। এটি আন্তঃপ্রজন্ম গতিশীলতা।

ঘ) অন্তস্থ প্রজন্ম গতিশীলতা: আন্তঃপ্রজন্ম গতিশীলতায় কমপক্ষে দুই প্রজন্মের মধ্যকার পদমর্যাদায় তুলনা থাকে। পক্ষান্তরে, অন্তস্থ প্রজন্ম গতিশীলতায় শুধু একটি প্রজন্মের মধ্যকার পদমর্যাদার উত্থান-পতনের তুলনা থাকে। একজন ব্যক্তির সমগ্র জীবনকালের মধ্যে মর্যাদার উত্থান-পতনকে অন্তস্থ প্রজন্ম গতিশীলতা বলা হয়। জন্মসূত্রে সাধারণ পদমর্যাদার অধিকারী হলেও বিল গেট্সের উন্নতি ও সামাজিক পদমর্যাদা বেড়েছে ধাপে ধাপে। তাঁর জীবনকালের এই পদমর্যাদার ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়কেই বলা হচ্ছে অন্তস্থ প্রজন্ম গতিশীলতা।

ঙ) কাঠামোগত গতিশীলতা: কাঠামোগত গতিশীলতা এমন এক ধরণের গতিশীলতা যা মূলত স্তরবিন্যাসের কাঠামো পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়। এর ফলে নতুন কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণি অন্যদের থেকে বেশি গুরুত্ব পায়। সমাজে কাঠামোগত পরিবর্তন হলে হঠাৎই নতুন কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণি বেশি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। যেমন: যুদ্ধের পরিস্থিতিতে মিলিটারি অফিসারদের কদর স্বাভাবিক অবস্থার থেকে অনেক বেড়ে যায়। কিছুদিন আগেও বিজ্ঞানী ও এ্যাডভোকেটেরা সমাজের চোখে অনেক উচু মর্যাদার অধিকারী ছিল। কিন্তু কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদরা অনেক উচু মর্যাদার জায়গাটা দখল করেছে, যেটা একসময় বিজ্ঞানী ও এ্যাডভোকেটেরা দখল করেছিল। সমাজে কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলেই এভাবে নতুন গোষ্ঠী বা শ্রেণি অন্যদের থেকে বেশি প্রাধান্য পায়। এটাই কাঠামোগত গতিশীলতা।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক গতিশীলতার ধরনগুলো লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার সাধারণ অবস্থা, সাধারণ মান মর্যাদা, ক্ষমতা ও আর্থিক অবস্থা থেকে উন্নতর অবস্থা, উঁচু সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সামাজিক গতিশীলতা বলে। সহজ কথায় সামাজিক গতিশীলতা হলো সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তন। সামাজিক গতিশীলতা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পর্যায়ের হতে পারে। এটা একদিকে যেমন ব্যক্তি পর্যায়ের হতে পারে, অন্যদিকে তেমনি পারিবারিক, গোষ্ঠীগত বা সমাজভিত্তিকও হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজ বিজ্ঞানী পি এ সরোকিন কোন দেশের বংশোদূত?

(ক) আমেরিকান (খ) জার্মান

(গ) রাশিয়ান (ঘ) ব্রিটিশ

২। কোনটি উলম্ব গতিশীলতার প্রকাভেদ নয়?

(ক) উর্ধ্বমুখী গতিশীলতা (খ) নিম্নমুখী গতিশীলতা

(গ) সমান্তরাল গতিশীলতা (ঘ) কাঠামোগত গতিশীলতা

পাঠ-৯.৫ স্থানান্তর গমন : ধারণা, ধরন ও প্রভাব
Migration: Concept, Types and Impact

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- স্থানান্তর গমন কী তা বলতে পারবেন;
- স্থানান্তর গমনের ধরন সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- স্থানান্তর গমনের প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্থানান্তর গমন, বসতি স্থাপন, জটিলতা, অর্থনৈতিক সংকট, জীবনযাত্রা, ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

সমাজে বসবাস করতে গিয়ে যখন মানুষ নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হয় তখন তার থেকে মুক্তি পেতে মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে এবং নতুন করে তার জীবনধারণের ব্যবস্থা করে। কেউ কেউ নতুন সুযোগ-সুবিধার খোঁজও একস্থান ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে। যেমন: গ্রামের মানুষ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাপনের জন্য, নতুন নতুন পেশার খোঁজে কিংবা শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির আশায় শহরে চলে যায় এবং নতুন করে জীবনযাপন শুরু করে।

স্থানান্তর গমন কী

সমাজবিজ্ঞানে জনসংখ্যার আলোচনায় বলা হয় কোনো এলাকার বা দেশের জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি মূলত: তিনটি নিয়ামকের ওপর নির্ভর করে–জন্মহার, মৃত্যুহার এবং স্থানান্তর গমনের হার। অর্থাৎ স্থানান্তর গমনের ফলে কোনো এলাকার জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে। স্থানান্তর গমন বলতে বাসস্থান পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অন্যত্র অস্থায়ী কিংবা স্থায়িভাবে চলে যাওয়া ও বসতিস্থাপন করাকে বোঝায়। এই স্থানান্তর গমন বলতে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে দূরে কোনো এলাকায় স্থায়িভাবে চলে যাওয়াকে বোঝায়। যদি কেউ অস্থায়ী গমনের মাধ্যমে ছয় মাসের অধিক অন্যত্র অবস্থান করে তাকেও স্থানান্তর গমন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সামাজিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে স্থানান্তর গমনের বিষয়টি একটা জটিলতার সৃষ্টি করে থাকে। মানুষের স্থানান্তর গমনের পেছনে এক বা একাধিক নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে অন্যতম জটিল পরিস্থিতি হলো বসতি এলাকায় বা দেশে তীব্রভাবে অর্থনৈতিক ধস বা সংকট সৃষ্টি হওয়া। এর ফলে মানুষ অধিকতর অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা আছে এমন কোনো দেশে বা এলাকায় স্থানান্তর গমন করে থাকে। ২০১৫ সালের শেষ দিকে ইউরোপে যে ব্যাপক স্থানান্তর গমনের পরিস্থিতি দেখা যায় তার মূলে ছিল তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। কোনো দেশই তাদেরকে পুরোপুরি গ্রহণ করে নিজেদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনতে চায়নি।

স্থানান্তর গমন প্রক্রিয়ায় দুটি নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর একটি হলো Push factor চাপ প্রয়োগকারী নিয়ামক এবং অন্যটি হলো Pull factor আকর্ষণ সৃষ্টিকারী নিয়ামক। অর্থনৈতিক সংকট ও জীবনযাত্রা নির্বাহের জটিলতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সংঘর্ষ, নৃগোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব ও হামলা, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরাধীনতা, রাজনৈতিক অসন্তোষ, সামাজিক পশ্চাৎপদতা ইত্যাদির কারণে যে অসন্তোষ ও চাপের সৃষ্টি হয় তা থেকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্থানান্তর গমনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই নিয়ামকগুলোকেই বলা হচ্ছে Push factor বা চাপ প্রয়োগকারী নিয়ামক। পক্ষান্তরে, মানুষ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন যাপনের খোঁজে, কিংবা চাপপ্রয়োগকারী নিয়ামক দ্বারা তাড়িত হয়ে উন্নততর জীবন যাপনের জন্য নতুন কোনো এলাকা বা জেলাকে বেছে নেয়। এক্ষেত্রে নতুন এলাকার সুযোগ সুবিধা তাকে টানে। এটাই Pull factor বা আকর্ষণ সৃষ্টিকারী নিয়ামক।

স্থানান্তর গমনের ধরন

স্থানান্তর গমন দু'ধরনের হতে পারে। যেমন: (ক) আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমন এবং (খ) আন্ত:স্থানান্তর গমন। বিভিন্ন নিয়ামক বিবেচনায় এনে যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী একদেশ থেকে অন্যদেশে স্থায়িভাবে চলে যায় তখন তাকে আন্তর্জাতিক স্থানান্তর গমন

বলে। পক্ষান্তরে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন একই দেশের অভ্যন্তরস্থ অন্য কোনো এলাকায় স্থায়ীভাবে চলে যায় তখন তাকে আন্তঃ স্থানান্তর গমন বলে। যেমনঃ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাপনের আশায় মানুষ গ্রাম থেকে নিকটবর্তী শহরে স্থানান্তরিত হতে পারে না এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত হতে পারে ও স্থায়ী বসবাস শুরু করতে পারে।

স্থানান্তর গমনের প্রভাব

স্থানান্তর গমনের প্রভাব নানামুখী। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাবই রয়েছে। যেসব দেশ থেকে মানুষজন স্থানান্তর গমন করে অন্য দেশে গমন করে এবং যেসব দেশে অন্যান্য দেশে মানুষজন প্রবেশ করে ও স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে- এই উভয় দেশের জন্যই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন রকম।

যেসব দেশ থেকে মানুষ স্থানান্তরিত হয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কিছু সুবিধা তৈরি হয় যেমনঃ
এতে দেশটির কাঁধে জনাধিক্য এর অধিক দায়িত্বের বোঝাটা একটু হালকা হয়। অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও অন্যান্য সুযোগের ব্যবস্থা করতে হয়। চলে যাওয়া মানুষেরা তাদের পূর্বেকার দেশের মানুষের কাছে টাকা-পয়সা ইত্যাদি পাঠায়। এতে দেশীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্থানান্তর গমনের প্রভাব সম্পর্কে লিখুন।	**সময়ঃ ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মানুষ নানাবিধ সমস্যার থেকে মুক্তি পেতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে এবং নতুন করে জীবনধারনের ব্যবস্থা করে। কেউ কেউ নতুন সুযোগ-সুবিধার খোঁজও একস্থান ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে। স্থানান্তর গমন বলতে বাসস্থান পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অন্যত্র ছয় মাসের অধিক অস্থায়িভাবে কিংবা স্থায়িভাবে চলে যাওয়া ও বসতিস্থাপন করাকে বোঝায়। এই স্থানান্তর গমন বলতে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে দূরে কোনো এলাকায় অস্থায়ী বা স্থায়িভাবে চলে যাওয়াকে বোঝায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন এলাকার বা দেশের জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি মূলত নির্ভর করে কোন বিষয়ে উপর ?

(i) জন্মহার
(ii) মৃত্যুহার
(iii) স্থান্তরগমন হার
(ক) i (খ) ii + iii (গ) i + iii (ঘ) i+ ii + iii

২। 'স্থানন্তর-গমন' কয় ধরনের হয় ?

(ক) ২ ধরনের (খ) ৩ ধরনের
(গ) ৪ ধরনের (ঘ) ৫ ধরনের

৩। কোনটি Push factor এর সাথে জড়িত

(ক) সামাজিক স্থিতিশীলতা (খ) প্রগতিশীল মানসিকতা
(গ) উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা (ঘ) অর্থনৈতিক সংকট

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। কোনটি রাজনৈতিক কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে ?

(ক) জনমত (খ) পরিবার

(গ) গণমাধ্যম (ঘ) ক ও খ উভয়ই

২। 'ট্যাবু' শব্দের সাথে কোন বিষয়টি জড়িত?

(ক) আবেগ-অনুভূতি (খ) জোর করে চাপিয়ে দেয়া

(গ) রাষ্ট্রীয় নিয়ম-নীতি (ঘ) নিষেধাজ্ঞা

খ) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩। 'কৃষকের ছেলে ব্যাংকের অফিসার হলো'- এটি কোন ধরনের গতিশীলতা?

(i) উলম্ব

(ii) আন্তঃপ্রজন্ম

(iii) কাঠামোগত

সঠিক উত্তর কোনটি?

(ক) i ও iii (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

উদ্দীপকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

আবির ও আসিফ সম্পর্কে চাচাতো ভাই। দু জনে ছোটবেলা থেকে একসাথে পড়াশোনা করে। পড়াশোনা শেষে আবির ব্যাংকের অফিসার পদে চাকরি পেয়ে যায়। কিন্তু আসিফ চাকরি পায় না। পড়াশোনার পেছনে তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি আগেই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আসিফ হতাশ হয়ে গ্রামে ফিরে আসে এবং কৃসিকাজ করতে থাকে।

১) সামাজিক গতিশীলতা কী?

২) সামাজিক গতিশীলতার প্রকারভেদ লিখুন।

৩) উদ্দীপকের আবিরের অবস্থা কোন গতিশীলতার সাথে মেলে বলে আপনি মনে করেন?

৪) উদ্দীপকের আবিরের বর্তামন অবস্থার সাথে আসিফের বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ ঃ ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ ঃ ১। গ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ ঃ ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ ঃ ১। ঘ ২।ক ৩। ঘ

ইউনিট
১০

সমাজ ব্যবস্থা
Social system

সমাজ একটি বিমূর্ত প্রত্যয়। সমাজ হচ্ছে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন বহু ব্যক্তি সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে। বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। সমাজ ব্যবস্থাই সামাজিক কাঠামো নির্ধারণ করে। বস্তুত সমাজ সক্রিয় থাকে এর বিভিন্ন প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার মাধ্যমে। সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সমাজ সক্রিয় এবং গতিশীল থাকে। বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। তাই সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। মূলত সমাজে বিদ্যমান সব ধরনের প্রতিষ্ঠানই সামাজিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সমাজে এগুলোর ভূমিকা এবং কার্যক্রমও স্বতন্ত্র। সমাজস্থ মানুষ এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকার মাধ্যমেই মানুষ সামাজিক সুবিধা পেয়ে থাকে। এই ইউনিটে সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১৩ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১০.১: সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
পাঠ ১০.২: সম্পত্তি
পাঠ ১০.৩: সম্পত্তির বিবর্তন
পাঠ ১০.৪: শিক্ষা
পাঠ ১০.৫: শিক্ষার শ্রেণি বিভাগ ও ভূমিকা
পাঠ ১০.৬: শিক্ষা মতবাদ
পাঠ ১০.৭: ধর্ম
পাঠ ১০.৮: ধর্মের উৎপত্তি
পাঠ ১০.৯: নৈতিকতা
পাঠ ১০.১০: রাষ্ট্র
পাঠ ১০.১১: রাষ্ট্রের উৎপত্তি
পাঠ ১০.১২: ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব
পাঠ ১০.১৩: কর্তৃত্বের ধরন, উপাদান ও প্রভাব

পাঠ-১০.১ সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
Economic system of society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী (What is economic system)

মানবজীবন ও সমাজের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক আজন্ম এবং শাশ্বত। জীবিকার তাগিদে মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, ফলমূল সংগ্রহ কিংবা পশু ও মৎস্য শিকার করে খাদ্যাভাব পূরণ করত, সে সময় থেকেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা। মৌলিক অর্থে অর্থনীতির গোড়াপত্তন হয়েছে আজ হতে প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে। খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল। এ সময় ব্যক্তিগত মালিকানারও সূচনা হয়, যা অর্থনীতিকে দ্রুত শক্তিশালী করে তোলে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে মূলত উৎপাদন ব্যবস্থা, ভোগ, বণ্টন তথা এগুলোর সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। এক্ষেত্রে সম্পত্তি, সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত মানুষ তার প্রয়োজন ও অভাব পরিপূরণের জন্য উপযোগ সমৃদ্ধ পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic system)। Dalton-এর মতে, "অর্থনীতি হচ্ছে কিছু প্রতিষ্ঠিত কার্যক্রম, যা প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের শ্রম এবং প্রযুক্তির সংমিশ্রণে পণ্য অর্জন, উৎপাদন এবং বণ্টন করে।" (An economy is a set of institutionalized activities which combine natural resources, human labour and technology to acquire, produce and distribute goods...)।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি নির্দিষ্ট স্থানে থেমে থাকেনি। মানুষ সর্বদা নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকে। তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বিবর্তিত হয়ে উন্নতি লাভ করেছে। মানুষের মেধা, মনন, সভ্যতা যেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি অর্থনীতিও মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব (Importance of economic system)

আদিম সমাজে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। কিন্তু মানুষের জীবন-জীবিকা ছিল। মানব জীবনের এ স্তরে শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল। পর্যায়ক্রমে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ এবং সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। মানব জীবন, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রভাব অনেকখানি। এখানে সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

১) জীবিকার উৎস: যেকোনো সময়, সমাজ ও স্থানে জীবিকার উৎস হচ্ছে এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবিকা নির্ধারিত হয়। কৃষি কিংবা শিল্প, সামন্ত কিংবা পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা-ই হোক না কেন তা মানুষের জীবিকার উৎস হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেউ শ্রমজীবী আবার কেউ মালিক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু সবার প্রধান লক্ষ্য থাকে সেখান থেকে জীবিকা নির্বাহ করা।

২) সভ্যতা বিকাশের হাতিয়ার: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সভ্যতা বিকাশের প্রধান হাতিয়ার। কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সভ্যতার সূচনা ও বিকাশে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ব্যবস্থাই শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সভ্যতার আরো উৎকর্ষ দান করেছে। রাষ্ট্র কাঠামো, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে সমৃদ্ধিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

৩) **সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাসের অন্যতম নিয়ামক:** অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে সম্পত্তির মালিকানা। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাস সৃষ্টি করেছে। সমাজে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ, অসমতা ও স্তরবিন্যাসের মূলে মালিকানা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তির ভূমিকা বিশেষভাবে কাজ করে। সম্পত্তিতে যখন ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শ্রমবিভাজন ছিল না তখন সমাজও ছিল সমতাভিত্তিক। সুতরাং সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাসের মূলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকা অন্যতম।

৪) **সামাজিক শ্রেণি কাঠামো নির্ধারণ করে:** অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের শ্রেণি কাঠামো র্নিধারণ করে। সম্পদের মালিকানা, উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমিকা ও শ্রমবিভাজন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির বিকাশ ঘটায়। সরল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক শ্রেণি ও পেশাজীবীর সংখ্যা খুব সীমিত। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের মাধ্যমে সমাজে নানা পেশাজীবী শ্রেণির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ভূমিমালিক-ভূমিহীন, মালিক-শ্রমিক, বিত্তশালী-বিত্তহীন, ধনী-দরিদ্র, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-বিত্তহীন ইত্যাদি শ্রেণির মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

৫) ক্ষমতা কাঠামোর প্রধান শক্তি: ক্ষমতা কাঠামোর প্রধান শক্তি বা উপাদান হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সম্পত্তির মালিকানা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষমতা কাঠামো নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ সমাজে ভূমির মালিকানা, সার-কীটনাশকের ডিলারশিপ, সেচ ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমশক্তি সরবরাহের সক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির পূর্বশর্ত। আধুনিক নগর জীবনেও শিল্প-মালিকানা, নগদ অর্থের প্রাচুর্য, শ্রমিক সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করে।

৬) নিরাপদ জীবনের অবলম্বন: নিরাপদ জীবনের জন্য চাই অর্থ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিত করা না গেলে নিরাপদ জীবন অর্থহীন। উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ই মানুষের নিরাপদ জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংশ্লিষ্টতা। বস্তুত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যতীত মানুষের জীবন অকল্পনীয়। আদিম হতে আজ পর্যন্ত কোনো না কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই মানুষ নিরাপদ জীবন-যাপনের স্বাদ গ্রহণ করছে।

৭) **সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবশালী উপাদান:** কার্ল মার্কসের মতে, সমাজের মৌল কাঠামো (অর্থনীতি) উপরি কাঠামোকে (রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি) প্রভাবিত করে। বস্তুত সামাজিক পরিবর্তনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম। কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দাস ও সামন্ত সমাজের পৃষ্ঠপোষক। শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নগর সমাজের গোড়াপত্তন করে। সেবাখাতের বিকাশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুদ্রা বিনিময় ও প্রযুক্তির ব্যবহার অধিকতর শক্তিশালী হয়। ফলে সামাজিক সম্পর্ক, পেশা, শ্রেণি ও ক্ষমতা কাঠামোতে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

৮) **আধুনিকায়ন ও নগরায়নকে ত্বরান্বিত করে:** অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আধুনিকায়ন ও নগরায়নের সূচনা হয়েছিল। শিল্প ও সেবা নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ আধুনিকায়ন ও নগরায়নকে সমৃদ্ধ করেছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে মানুষের চাহিদা, রুচি, মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নানা মাত্রা ও জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। এগুলো আধুনিক ও নগরায়িত সমাজের বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত। সুতরাং পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই আধুনিকায়ন ও নগরায়নকে অনিবার্য করে তোলে।

৯) **শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার সহায়ক:** অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার পূর্বশর্ত। মানুষ যখন শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক জীবন-যাপন করত তখন মূলত কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে সেখানে শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার চিন্তাও মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়নি। কিন্তু কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের ফলে মানুষ ক্রমশ শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করে। শিল্প ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রাকে অনেক বেশি গতিশীল করেছে। বস্তুত শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের নিবিড় সম্পর্ক অনস্বীকার্য।

১০) শোষণ-বঞ্চনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম দেয়: অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজে অসমতার জন্ম দেয়। ফলে শ্রেণিভিত্তিক সমাজে শোষণ-বঞ্চনা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিবার্য নিয়মে সমাজে মালিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী শ্রেণির উদ্ভব হয়। মালিক শ্রেণির মুনাফা লাভের প্রবণতা থেকে শ্রমজীবীদের উপর শোষণ ও বঞ্চনা হয়। শোষণ থেকে সচেতনতা, সচেতনতা থেকে সংগ্রাম এমনকি দ্বন্দ্ব-সংঘাত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণিরও জন্ম দেয়। সমাজে

উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির মূলেও রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সুতরাং শ্রেণিভিত্তিক সমাজ, শ্রেণি-শোষণ এবং বিভিন্ন শ্রেণির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মূলত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিবার্য ফল।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব লিখুন।	**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে মূলত উৎপাদন ব্যবস্থা, ভোগ, বণ্টন তথা এগুলোর সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। মানুষ তার প্রয়োজন ও অভাব পরিপূরণের জন্য উপযোগ সমৃদ্ধ পণ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তাই অর্থ ব্যবস্থা (Economic system)। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট স্থানে থেমে থাকে না। মানুষ সর্বদা নতুন নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকে। তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বিবর্তিত হয়ে উন্নতি লাভ করেছে। জীবিকার উৎস, সভ্যতার বিকাশ, সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণি ও ক্ষমতা কাঠামো নির্ধারণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ ব্যবস্থার সমন্বয়ে গড়ে উঠে-
(ক) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (খ) সামাজিক ব্যবস্থা
(গ) রাজনৈতিক ব্যবস্থা (ঘ) বাজার ব্যবস্থা

২। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিচের কোনোটিকে প্রভাবিত করে?
(ক) জীববৈচিত্র্য (খ) সামাজিক স্তর বিন্যাস
(গ) শ্রেণি ও ক্ষমতা কাঠামো (ঘ) 'খ' এবং 'গ' উভয়।

৩। কার্ল মার্কস 'মৌল কাঠামো' বলে অভিহিত করেছেন-
(ক) সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে (খ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে
(গ) বিচার ব্যবস্থাকে (ঘ) ধর্মীয় ব্যবস্থাকে

পাঠ-১০.২ সম্পত্তি
Property

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সম্পত্তির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- সম্পত্তির মালিকানার ধরন ও মালিকানা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	সম্পত্তি, সম্পত্তির ধরন, মালিকানা ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

সাধারণ অর্থে সম্পত্তি হচ্ছে কোনো বস্তু বা সম্পদের উপর ব্যক্তির সমাজস্বীকৃত চূড়ান্ত অধিকার বা মালিকানা। অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও উপযোগ সম্বলিত মালিকানাধীন কোনো বস্তুকে সম্পত্তি বলা যেতে পারে। অধিকার (Right) ছাড়া সম্পত্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। সম্পদ এবং সম্পত্তির পার্থক্য গড়ে উঠে অধিকার বা মালিকানার ভিত্তিতে। প্রাকৃতিক সম্পদে সবার অধিকার থাকে, কিন্তু সামষ্টিক অধিকারে এর মূল্য প্রকাশ পায় না। যখন সুনির্দিষ্ট অধিকার বা মালিকানা আরোপিত হয় তখনই তার মূল্য বেড়ে যায়। সাধারণত মানুষ সম্পদের উপর সময়, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তি সর্বোপরি অধিকার আরোপের মধ্য দিয়ে মালিকানা অর্জন করে এবং সম্পত্তি হিসেবে তখন এর গুরুত্ব আরও অনেক বেড়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা কোনো চর হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। এ চর যদি বাংলাদেশের অধিকার বা মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। কারণ মালিকানার কারণে এটি বাংলাদেশের সম্পত্তি বলে পরিগণিত। ভারত-মায়ানমার ইচ্ছা করলেও এটি তাদের অধিকারে নিতে পারে না।

সম্পত্তির সংজ্ঞা (Definition of property)

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে সম্পত্তির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন: K. Davis তাঁর '*Human Society*' (1948: 452) গ্রন্থে বলেছেন, "সম্পত্তি সীমাবদ্ধ কোনো কিছুতে মানুষের অধিকার এবং আইনগত বৈধতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।" (Property is nothing more than rights and obligations with respect to something scarce.)

সম্পত্তির সংজ্ঞায়, '*International Encyclopedia of social sciences*' (Vol. 12. P. 590)'-এ বলা হয়েছে, "সম্পত্তি এমন একটি প্রত্যয়ের নাম, যা সীমাবদ্ধ কোনো সামাজিক মূল্যের প্রতি মানুষের অধিকার, আইনগত বৈধতা, ভোগের নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তা যা ঐ সমাজের মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।" (Property is the name for a concept that refers to the rights and obligations and the privileges and restrictions thats govern the behaviour of man in society towards the scarce object of value in that society.)

সম্পত্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছেন L. T. Hobhouse তাঁর '*The Historical Evolution of Property*' গ্রন্থে। তাঁর মতে, "সম্পত্তি এমন একটি প্রত্যয়কে ধারণ করে যা বস্তুর উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ। এ নিয়ন্ত্রণ সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং সম্পত্তি কম-বেশি স্থায়ী ও একচেটিয়া।" (Property is to be conceived in terms of the control of man over things, a control which is recognized by society, more or less permanent and exclusive.)

অতএব, সম্পত্তি হচ্ছে এমন সম্পদ যার উপর ব্যক্তি বা সমাজের নিরঙ্কুশ এবং স্থায়ী মালিকানা ও অধিকার রয়েছে। এ অধিকার বা মালিকানা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত। সম্পত্তির যোগান সীমাবদ্ধ এবং তা হস্তান্তরযোগ্য।

সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য (Characteristic of property)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও আলোচনার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, সম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং অধিকার অপরিহার্য। এটি সম্পত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যও বটে। যেসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে সম্পত্তিকে সহজে সনাক্ত করা যায়, পরপৃষ্ঠায় সেগুলো উল্লেখ করা হল:

১। দখলিস্বত্ব (Occupation)**:** সম্পত্তির দখলিস্বত্ব বলতে মূলত কারও অধিকারে থাকা এবং ভোগ করাকে বুঝায়। যে সম্পদের উপর কারও দখল আরোপিত নয়, তা সম্পত্তির আওতাভুক্ত হতে পারে না।

২। চুক্তি (Contract)**:** সম্পত্তি অর্থনীতির কোনো স্থবির সত্তা নয়। এটি বিনিময়, হস্তান্তরিত ও বিবর্তিত হতে পারে। আর চুক্তি এ ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। আদি হতে আজ পর্যন্ত সম্পত্তির যে বিবর্তন হয়েছে এবং বিকাশ হয়েছে, তার মূলে রয়েছে চুক্তি।

৩। সম্পত্তির অধিকার (Property right)**:** সম্পত্তির ভিত্তি দান করেছে এর উপর মানুষের অধিকার। সম্পত্তির উপযোগিতা আছে। মানুষের অভাব ও প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা আছে। তাই এর উপর মানুষের অধিকার অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। যেমন: পুঁজি, প্রযুক্তি, সময়-শ্রম বিনিয়োগ করে ভূগর্ভস্থ পানি (প্রাকৃতিক সম্পদ) উত্তোলন করার পর তার মানুষের অধিকার আরোপিত হয়। এ অধিকার ও মালিকানার ভিত্তিতে ওই পানির বাণিজ্যিক ব্যবহার হয়ে থাকে।

৪। মুদ্রা (Money)**:** আদিম সম্পত্তিতে মুদ্রা ছিল না। চুক্তি ও বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পন্ন হত। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতি তথা সম্পত্তির মূল নিয়ামক হচ্ছে মুদ্রা। মুদ্রা ব্যবস্থাই আধুনিক সম্পত্তির মূল শক্তি।

সমাজবিজ্ঞানীয় K. Davis সম্পত্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন:

ক) হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability)**:** উত্তরাধিকার, বিক্রয়, দান প্রভৃতি প্রয়োজনে সম্পত্তির হস্তান্তরযোগ্যতা অনিবার্য একটি বিষয়। তাই হস্তান্তরযোগ্যতা ছাড়া কোনো কিছুকে সম্পত্তি বলে গণ্য করা যায় না।

খ) শক্তি সত্তা (Power aspects)**:** সম্পত্তির মধ্যে একটি শক্তি বা ক্ষমতা লুকিয়ে থাকে। এ শক্তি বলেই বস্তু সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

গ) সম্পত্তি হচ্ছে কোনো বস্তুগত উপাদান (Concrete external object)**:** ডেভিসের মতে, সম্পত্তি বলতে কোনো না কোনো বস্তুকেই নির্দেশ করে। অবস্তুগত কোনো উপাদান সম্পত্তি নয়। এগুলো ছাড়াও সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকার বা মালিকানার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, স্থায়িত্ব, সীমাবদ্ধতা, উপযোগিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য।

উল্লেখ্য যে, সম্পত্তি যেমন বস্তুগত হতে পারে, তেমনি অবস্তুগতও হতে পারে। যেমন: মানুষের সুনাম, সততা, মেধা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি অবস্তুত সম্পত্তি।

সম্পত্তির ধরন ও মালিকানা (Types and ownership of property)

ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি অধিকার ও মালিকানা হচ্ছে সম্পত্তির অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ মালিকানা সব সময় সব সমাজে এক ও অভিন্ন নয়। যেমন T. B. Bottomore তাঁর '*Sociology*' গ্রন্থে সম্পত্তি তথা এর মালিকানার ধরন দেখিয়েছেন নিম্নরূপভাবে:

১। বেসরকারি সম্পত্তি (Private property)| এটি আবার ২ প্রকার। যথা:
(ক) ব্যক্তিগত (Individual) এবং (খ) গোষ্ঠীগত (Collective)।

২। সমষ্টিগত সম্পত্তি (Common property)।

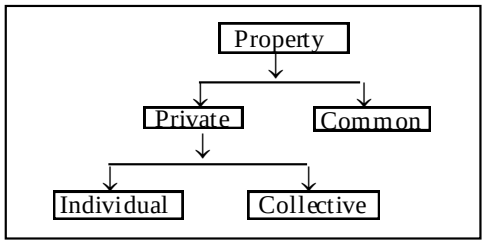

চিত্র : সম্পত্তির ধরন ও মালিকানা

বেসরকারি মালিকানাধীন সম্পত্তি: এ সম্পত্তিতে মালিকানা ব্যবস্থা সংরক্ষিত থাকে। নির্দিষ্ট মালিক ব্যতীত অন্য কেউ এ সম্পত্তি অধিকার বা ভোগ দখল করতে পারে না। এটি সম্পূর্ণ একক বা ব্যক্তিগত হতে পারে। আবার গোষ্ঠীগত বা কয়েকজনেরও হতে পারে। যেমন: দক্ষতা, মন্ত্র-তন্ত্র, ব্যাংকে সংরক্ষিত টাকা, নিজ নামের জমি কিংবা ভবন-বাড়ি ইত্যাদি একক ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Individual property)। এজমালি জমি, অংশগ্রহণভিত্তিক ব্যবসা, যৌথ পরিবারের সম্পত্তি, কোনো গোষ্ঠীর তীর্থস্থান, ধর্মীয়

সম্পত্তি কিংবা কোনো কিংবা কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মালিকানাধীন পশুচারণভূমি ইত্যাদি গোষ্ঠীগত সম্পত্তি (Collective property)।

সমষ্টিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি (Common property)**:** যে সম্পত্তিতে কোনো গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, শ্রেণি বা জাতির যৌথ মালিকানা স্বীকৃত তা-ই যৌথ সম্পত্তি (Common property)। Bottomore বলেছেন, "Common ownership may be maintained for the joint family." আদিম সমাজে প্রায় সব সম্পত্তি সমষ্টিগত বা সাধারণ মালিকানায় বিদ্যমান ছিল।

আকারগত দিক থেকে সম্পত্তিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা:

১। স্থাবর বা বস্তুগত সম্পত্তি (Tangible property)**:** জমি (Land), বাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি স্থাবর বা বস্তুগত সম্পত্তি। এগুলো একক ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকতে পারে, আবার গোষ্ঠীগত বা সাধারণ মালিকানায়ও থাকতে পারে।

২। অবস্তুগত সম্পত্তি (Intangible property)**:** ধরা-ছোঁয়া যায় না এমন সম্পত্তি হচ্ছে অবস্তুগত সম্পত্তি। এটি মূলত একক ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যেমন: সেবা, সুনাম, কাব্যপ্রতিভা ইত্যাদি।

সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিম তাঁর 'সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ (১৯৯৩, ৫ম সংস্করণ)' গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারের সম্পত্তির উল্লেখ করেছেন। যেমন:

১। জমি: এটি মানুষের সর্বজনীন সম্পত্তি। আদি হতে আজ পর্যন্ত জমি প্রথম ও প্রধান সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত।
২। অস্থাবর সম্পত্তি: পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা, অস্ত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি হচ্ছে অস্থাবর সম্পত্তি।
৩। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি : মন্ত্র-তন্ত্র, নিজের নাম, শিক্ষা, দক্ষতা ইত্যাদি ব্যক্তি মালিকাধীন সম্পত্তি।
৪। দাস: দাস যুগে মানুষের জীবন্ত সম্পত্তি হিসেবে দাস ছিল অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি।

নাজমুল করিম সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে ছয়টি প্রকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

(১) গোষ্ঠী বা দলগত মালিকানা। (২) পারিবারিক মালিকানা।
(৩) উচ্চবংশের পারিবারিক মালিকানা। (৪) সামন্ত প্রভুর মালিকানা।
(৫) দলপতির মালিকানা। (৬) ব্যক্তিগত মালিকানা।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ছকের মাধ্যমে সম্পত্তির ধরনগুলো প্রকাশ করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল সম্পত্তি ও সম্পত্তির মালিকানা। সম্পত্তি বলতে বোঝায় এমন বিষয় বা বস্তু যার উপর, সমাজ ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি প্রদান করে। সম্পত্তির মালিকানাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পরে, এর মধ্যে সমষ্টিগত মালিকানা, ব্যক্তিগত মালিকানা ও যৌথ মালিকানাই মুখ্য। আদিম সমাজে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, ছিল গোষ্ঠীগত বা যৌথ মালিকানা। ধীরে ধীরে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনো সম্পদ সম্পত্তি হতে হলে এর পূর্বশর্ত কী?
(ক) হস্তান্তরযোগ্যতা (খ) মালিকানা (গ) উপযোগিতা (ঘ) স্থায়িত্ব

২। টি.বি বটোমোর প্রধানত কয় ধরনের সম্পত্তির উল্লেখ করেছেন?
(ক) দুই ধরনের (খ) তিন ধরনের (গ) চার ধরনের (ঘ) পাঁচ ধরনের

পাঠ-১০.৩ সম্পত্তির বিবর্তন
Evolution of Property

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সম্পত্তির বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সম্পত্তির বিবর্তন।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সমষ্টিগত মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বিকশিত হয়েছে। নাজমুল করিম বলেছেন, "Private property is a matter of culture and not of instinct." বস্তুত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সম্পত্তির বিবর্তন ঘটেছে। উদ্ভব হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির। পশুপালনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বিকশিত হয়। হবহাউসের মতে, পশুর মালিকানাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধকে ভীষণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে... এর ধারাবাহিকতায় কৃষিজীবী সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

সম্পত্তির বিবর্তন (Evolution of property)

L. T. Hobhouse তাঁর '*The Historical Evolution of Property*' গ্রন্থে সম্পত্তির বিবর্তন তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি তিনটি স্তরের মাধ্যমে তাঁর তত্ত্ব (Scheme) প্রকাশ করেন। এগুলো হচ্ছে:

ক) সামান্য সামাজিক ব্যবধান, অল্প মাত্রার অসমতা এবং অর্থনৈতিক সম্পদের সাধারণ মালিকানা অথবা কেবল সম্প্রদায় কর্তৃক সংগৃহীত সামগ্রী। (Little social differentiation, little inequality and in which economic resources are owned in common or are strictly collected by the community).

খ) সম্পদ সমাজে ব্যাপক অসমতা বৃদ্ধি করে। ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত মালিকানা ক্রমশ সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসে। (Wealth increases great inequalities appear, individual or collective ownership escape from community control).

গ) সচেতনতার মাধ্যমে সমাজের অসমতা দূরীকরণ এবং সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। (Conscious attempt made to diminish inequality and to restore community control).

প্রখ্যাত সমাজবাদী চিন্তাবিদ কার্ল মার্কসও (১৮১৮–৮৩) সম্পত্তির বিবর্তনে তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

প্রথম স্তর: আদিম যুগে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। শ্রেণিহীন ও শোষণহীন এ সমাজব্যবস্থায় মানুষ প্রকৃতি হতে ফলমূল সংগ্রহ এবং পশু, মৎস্য ইত্যাদি শিকার করে জীবনধারণ করত। প্রকৃতির সবকিছুতে তাদের সবার সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। মার্কস এ সমাজকে আদিম সাম্যবাদ বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় স্তর: সম্পত্তির বিবর্তনের এ পর্যায়ে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হয়, যার মূলে ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মূলত কৃষিভিত্তিক (Agrarian society) সমাজব্যবস্থায় এটি বিদ্যমান। দাস এবং সামন্ত সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যভিত্তিক সম্পত্তির মালিকানা লক্ষ করা যায়। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শ্রেণি শোষণের জন্য আধুনিক পুঁজিবাদী শিল্প সমাজকেও মার্কস দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তৃতীয় স্তর: কার্ল মার্কসের মতে, ইতিহাসের সাধারণ নিয়মেই সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ নামক শ্রেণিহীন সমাজের উদ্ভব হবে। এ সমাজে ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না। যাবতীয় সম্পত্তি থাকবে রাষ্ট্রীয় মালিকানায়। জনগণ তাদের যোগ্যতানুযায়ী কাজ করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।

সম্পত্তির বিবর্তন ব্যাখ্যায় সমাজবিজ্ঞানী P. Vinogradoff তাঁর '*Historical Jurisprudence* (1920)' গ্রন্থে চারটি স্তরের

উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

১. উপজাতি ও সম্প্রদায়ের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণে সম্পত্তি।
২. সামন্তপ্রথায় রাজস্ব প্রদানের ভিত্তিতে সম্পত্তি।
৩. ব্যক্তিগত মালিকানা/তত্ত্বাবধানে সম্পত্তি।
৪. আধুনিক সমষ্টিবাদী মতবাদের প্রভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ।

নাজমুল করিম তাঁর 'সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ' গ্রন্থে সম্পত্তির বিবর্তনকে দেখিয়েছেন চারটি স্তরে। এগুলো হচ্ছে:

১। আদিম সমাজ ও সম্পত্তি: আদিম সমাজে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ছিল না। কেবল ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রকৃতি থেকে খাদ্যোপযোগী পশু-পাখি, মাছ, ফলমূল, শিকার ও সংগ্রহ করত।

২। যাযাবর সমাজ ও সম্পত্তি: চতুর্থ হিম যুগের পরে এ স্তরের সূচনা হয়। এসময় মানুষ পশুপালনে ব্রতী হয়। এখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পালিত পশু ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন। এখান থেকেই ব্যক্তি মালিকানার সূত্রপাত হয়।

৩। কৃষি সমাজ ও সম্পত্তি: যাযাবর বা পশুপালন যুগেই কৃষির উদ্ভব হয়। কৃষির মাধ্যমে মানুষ খাদ্যের অধিকতর নিশ্চয়তা বিধান করে। জীবন-যাপনে আসে স্থায়িত্ব। কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

৪। শিল্প সমাজ ও সম্পত্তি: অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে 'মুক্তশ্রম'-এর সূচনা হয়। শিল্প-কলকারখানা প্রতিষ্ঠায় সরকারি বা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মাধ্যমে বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় উৎপাদনে নিয়োজিত সবকিছুই ব্যাপক মাত্রায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। পুঁজিবাদের তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিকশিত হয়। এগুলো হচ্ছে:

(ক) বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ (Mercantile capitalism);
(খ) শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদ (Industrial capitalism) এবং
(গ) লগ্নি পুঁজিবাদ (Finance capitalism)।

সম্পত্তির ধারণা মানুষের সহজাত নয়। তবে প্রতিটি সমাজেই রূপভেদে এর উপস্থিতি রয়েছে। আধুনিক সমাজে সম্পত্তি একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। সামাজিক স্বীকৃতি, নিরঙ্কুশ অধিকার ও মালিকানা এবং উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও হস্তান্তরের নীতিমালা সম্পত্তিকে প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। আধুনিক সমাজে ব্যাপক বিস্তৃত এবং নিরঙ্কুশ ব্যক্তি মালিকানায় যে সম্পত্তি আমরা দেখি তা মূলত সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্তনের ফল।

শিক্ষার্থীর কাজ	সম্পত্তির বিবর্তন কিভাবে হয়েছে ১০টি বাক্যের মধ্যে ব্যাখ্যা করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আজকের যে সম্পত্তি আমরা দেখি তা মূলত বিবর্তনের ফসল। আদিম সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না বললেই চলে। উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ক্রমশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিকশিত হয়েছে। কৃষি যুগে ভূমি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি। শিল্প যুগে ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত কলকারখানা, ছোট ও বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, নগদ অর্থ, অবকাঠামো, যানবাহন, দক্ষতা, সেবা ইত্যাদি ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। L. T. Hobhouse সম্পত্তির বিবর্তনে কয়টি স্তরের উল্লেখ করেছেন?
(ক) দু'টি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

২। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা হয় কোনো সমাজে?
(ক) শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজে (খ) পশুপালন সমাজে
(গ) কৃষি সমাজে (ঘ) খ ও গ উভয়

পাঠ-১০.৪ শিক্ষা
Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শিক্ষা, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, আচরণিক পরিবর্তন।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

মানব সমাজের একটি মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়া হল শিক্ষা। শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Education'। Education শব্দটির উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'এডুকেয়ার' (educare) থেকে। এডুকেয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বড় করা বা পালন করা' (Bring up)। গ্রিক চিন্তাবিদদের কাছে শিক্ষা হল বিকাশ সাধনের এক সুসংবদ্ধ ও সচেতন পদ্ধতি। গ্রিক পণ্ডিতগণ সার্বিক শিক্ষা বোঝাতে 'পাইডিয়া' (Paideia) কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষা বলতে কেবল নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন বা পাঠ গ্রহণ নয়, শিক্ষা হল সাফল্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর মাঝে প্রয়োজনীয় অভ্যাস এবং মনোভাব গড়ে তোলা।

শিক্ষার সংজ্ঞা (Definition of education)

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিধিসম্মতভাবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পঠন-পাঠন পরিচালিত হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল এক ধরনের স্বয়ং-শিক্ষা। এ অর্থে শিক্ষা কোনো সংগঠন, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের বিষয় নয়। শিক্ষা সমাজের জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, পরিবেশের এক সামগ্রকি প্রভাব। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির (Mackenzie) মতে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন বা আত্মোপলব্ধিকেই বোঝায়। তিনি বলেছেন , "It (education) means, in this sense, the general process by which personality is developed and by which persons are enabled to realize their relations to one another and the universe in which they live.

ম্যাকেঞ্জি মনে করেন, শিক্ষা হল বিরামহীন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া জন্ম থেকে আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। এ কারণে বলা হয়, 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি'। মানুষের জীবনপথে চলতে চলতে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এসব অভিজ্ঞতার প্রতিটিই কোনো না কোনো শিক্ষা লাভে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো পন্থা-পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। এ কারণে বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা হল সমগ্র জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান।

হোয়াইটহেড (Whitehead)- এর মতে, শিক্ষার একমাত্র বিষয় হল সর্বতোভাবে বিকশিত বা প্রকাশিত জীবন। তিনি বলেছেন, "There is only one subject matter of education, and that is life in all its manifestations".

সমাজবিজ্ঞানী সামনার (W. G. Sumner) বলেছেন, বস্তুতপক্ষে শিক্ষা হচ্ছে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি এবং সক্রিয়তা বিকাশের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, যা সে স্বাভাবিকভাবে অর্জন করতে পারত না। (It is actually a continuous effort to impose on the child ways of seeing, feeling and acting which he could not have arrived at spontaneously).

এমিল ডুর্খেইম বলেছেন, জীবন যাপনের প্রস্তুতি হিসেবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের চর্চিত ক্রিয়াই হল শিক্ষা। সমাজজীবনের চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষা শিশুর মধ্যে দৈহিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক শক্তিকে জাগ্রত ও বিকশিত করে।

মার্কসীয় দর্শন অনুসারে শিক্ষা হল একটি সচেতন সামাজিক কর্ম। শিক্ষা হচ্ছে মানবিক এবং যৌক্তিক গুণাবলী বিকাশের

একটি পদ্ধতি। ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। মার্কর্সবাদীদের মতানুসারে শিক্ষা হল এক ধরনের যৌক্তিক উৎপাদন পদ্ধতি।

সামাজিকভাবে বসবাস করার জন্য, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য, সুস্বাস্থ্যের জন্য যেসব কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয় তাই শিক্ষা। সুতরাং শিক্ষা হচ্ছে মানুষের আচরণিক পরিবর্তন। বয়োজ্যেষ্ঠদের ক্রিয়াকলাপ, পুঁথিগত জ্ঞান, অর্জিত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ব্যক্তির আচরণ, বিশ্বাস, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধন করে। ব্যক্তির এ পরিবর্তনের মূলে রয়েছে শিক্ষা। শিক্ষা শিশুর সামাজিকীকরণের অন্যতম প্রভাবশালী বাহন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি-মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বা ক্ষমতাসমূহকে প্রকাশিত ও পরিমার্জিত করা।

শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristic of education)

আমরা শিক্ষা বলতে কী বুঝায় তা জানতে পেরেছি। এখন আমরা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথমে দেখা যাক ব্যাপক অর্থে শিক্ষার কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

(ক) ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল আনুষ্ঠানিক নিয়মবর্জিত জ্ঞান। এ শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো ধারা অনুসরণ করা হয় না।
(খ) বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়।
(গ) এ ধরনের শিক্ষা সচেতনভাবে যেমন হয়, তেমনি অসচেতনভাবেও হতে পারে।
(ঘ) শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশেও শিক্ষা ভূমিকা অপরিসীম।

প্রাতিষ্ঠানিক বা সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন:

(১) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক থাকে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষা দেন এবং শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করে।
(২) এখানে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম, পঠন-পাঠন, পরীক্ষা-ব্যবস্থা, মূল্যায়ন, সফল শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি প্রদান প্রভৃতি বিদ্যমান।
(৩) এ ধরনের শিক্ষা মানুষ সচেতনভাবে গ্রহণ করে থাকে।
(৪) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে।
(৫) জ্ঞান, দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ পেশাগত উন্নতি লাভ করে।
(৬) বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা প্রভৃতি বিদ্যায়তনে এ ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষার সাথে নানা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সম্পর্কযুক্ত থাকে।
(৭) সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এর উদ্দেশ্য হল কোনো বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন কিংবা কলাকৌশল আয়ত্ত করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার যেকোনো তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সুনির্দিষ্ট অর্থে শিক্ষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল বিশেষ সংস্কার সাধন। বস্তুত শিক্ষা হচ্ছে মানুষের আচরণিক পরিবর্তন। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশেও শিক্ষা ভূমিকা অপরিসীম। সাধারণ শিক্ষা সহজাতভাবে অর্জিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনোটি শিক্ষা?
(ক) মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন (খ) মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন
(গ) মানুষের আচরণিক পরিবর্তন (ঘ) মানুষের অর্থনৈতিক পরিবর্তন

২। 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন' কে বলেছেন?
(ক) হোয়াইটহেড (খ) টমাস মুর (গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) ম্যাকেঞ্জি

পাঠ-১০.৫ শিক্ষার শ্রেণি বিভাগ ও ভূমিকা
Types and Role of Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষার শ্রেণি বিভাগ বলতে পারবেন;
- শিক্ষার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, শিক্ষার ভূমিকা ইত্যাদি।

শিক্ষার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Education)

শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ শিক্ষাকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা–

১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal education);
২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-formal education) এবং
৩. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal education) ।

১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা: ব্যাপক অর্থে শিক্ষাই হলো অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক বা পরিকল্পনা মাফিক শিক্ষার বাইরে মানুষ পরিবেশ ও সমাজ থেকে যে শিক্ষা লাভ করে তাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। সমাজের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, রুচিবোধ, সংস্কৃতি, নিয়মনীতি, বিনোদন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ এই শিক্ষা অর্জন করে।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা: আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন এবং বিশেষ শিখন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:

ক. এ শিক্ষা ব্যবস্থা নমনীয়। শিক্ষা লাভের সময়, স্থান, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, কৌশল পূর্ব নির্ধারিত হলেও শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুসারে পরিবর্তনের সুযোগ থাকে।
খ. বিশেষ কোনো লক্ষ্য কিংবা যোগ্যতা অর্জনে সহায়তার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়।
গ. জীবনের যে কোনো বয়সে এ শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকে। যেমন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত শিক্ষা।

৩. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা: আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে কাঠামোগত শিক্ষা। শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বয়সে এরূপ শিক্ষার্জন শুরু করে এবং ধাপে ধাপে স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণ সাপেক্ষে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শেষ করে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কয়েকটি স্তর রয়েছে। যেমন: ক) প্রাথমিক স্তর, খ) মাধ্যমিক স্তর, গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, এবং ঘ) উচ্চ শিক্ষা।

শিক্ষার ভূমিকা বা কার্যাবলি (Role or functions of education)

সমাজজীবনে শিক্ষার ভূমিকা বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য বা ভূমিকা প্রসঙ্গে দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে। অনেকের মতে ব্যক্তি-মানুষের মানসিক উন্নতি সাধনই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এবংএরিস্টটলের মতে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল জ্ঞানার্জন। এখানে শিক্ষার ভূমিকা বা কার্যাবলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। সু-প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ সাধন: শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের প্রকৃতি প্রদত্ত প্রবণতাগুলোকে বিকশিত করা এবং মানুষের মনে আদর্শ চিন্তা জাগ্রত করা। মানুষের সুপ্ত মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে।

২। ত্রুটিপূর্ণ মনোবৃত্তির সংশোধন: শিক্ষা মানুষের মনোভাব ও আচরণের ত্রুটি দূর করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা এবং অসামাজিক মনোবৃত্তি বর্তমান থাকে। এগুলোর সংশোধনেও শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

৩। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহক: শিশুকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করে শিক্ষা। দেশ ও সমাজের অতীত, এর সঙ্গীত-সাহিত্য, শিল্প-দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি জ্ঞান আহরণ করে শিক্ষার মাধ্যমে।

৪। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি: বিদ্যায়তনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুর্নিদিষ্ট পাঠ্যক্রম থাকে। এ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে যারা উচ্চ স্থান অধিকার করে তারাই কৃতিত্বের দাবিদার হয়। এ প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠে।

৫। শিক্ষার পেশাগত ভূমিকা: পেশার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিকে জীবিকা অর্জনে সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অনেকখানি। শিক্ষা ব্যাক্তিকে নির্দিষ্ট কোনো পেশার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করে তোলে।

৬। সামাজিকীকরণে শিক্ষার ভূমিকা: শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমশ সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার মূলে শিক্ষার ভূমিকা সর্বাধিক। সামাজিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ যেমন সমাজ থেকে অর্জিত হয়, তেমনি বিশেষ জ্ঞান, ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দক্ষতা ইত্যাদি অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ভূমিকা রাখে।

৭। রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি: শিক্ষা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে। রাষ্ট্র পরিচালনা, আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, প্রতিনিধি নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরির মূলে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গই জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

৮। স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা: সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তিবর্গকে বাছাই করার ব্যাপারে শিক্ষা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিবর্গ সমাজে বিশেষ মর্যাদায় আসীন হন। শিক্ষার মাপকাঠিতে অনেকের পদ ও পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়। তৈরি হয় সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাস।

৯। সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ও সভ্যতা বিনির্মাণে শিক্ষার ভূমিকা: আজকের সমাজ পরিবর্তনের ফসল। এ পরিবর্তনের মূলে মানুষের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উৎপাদন ব্যবস্থার উৎর্কষ, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সভ্যতার অগ্রগতির মূলে কাজ করেছে মানুষের শিক্ষা।

১০। আত্মবিশ্বাস ও বিচার-বিবেচনাবোধ: শিক্ষা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা জাগ্রত করে। সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ, ভালো-মন্দের পার্থক্য উপলব্ধির ক্ষমতা নির্ধারণ করে শিক্ষা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার ধরনগুলো লিখুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

শিক্ষাকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। উপ-আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরও রয়েছে। যেমন: ১. প্রাথমিক স্তর, ২. মাধ্যমিক স্তর, ৩. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর, এবং ৪. উচ্চ শিক্ষা। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের সুপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ এবং কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ, জ্ঞানের বিকাশ, পেশাগত দক্ষতা, সামাজিকীকরণ, আত্মবিশ্বাস জাগ্রত ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শিক্ষা প্রধানত কয় প্রকার?

(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার

(গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

২। 'শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল জ্ঞানার্জন' কে/কারা বলেছেন?

(ক) অগাস্ট কোঁৎ (খ) ম্যাক্স ওয়েবার

(গ) মার্কস-লেনিন (ঘ) প্লেটো-এ্যারিস্টোটল

পাঠ-১০.৬ শিক্ষা মতবাদ
Education Theory

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষা মতবাদ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন মনিষীর মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শিক্ষা মতবাদ

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানুষ কোনো না কোনোভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। মানুষের সামাজীকীকরণেও শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিকাশেও শিক্ষার বিকল্প নেই। নানামুখী গুরুত্বের কারণে মনীষীরা শিক্ষা নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা করেছেন। তাঁদের দেয়া মতবাদ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর, গণমুখী, উন্নত এবং আধুনিক করেছে। এই পাঠে শিক্ষা সম্পর্কে কার্ল মার্কস, কার্ল মেনহেইম এবং এমিল ডুর্খেইমের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

শিক্ষা মতবাদ কী (What is education theory)

তত্ত্ব বা মতবাদ হচ্ছে কোনোকিছু সম্পর্কে সাধারণ কোনো সূত্র। সমাজবিজ্ঞানে মতবাদ হচ্ছে সমাজ সম্পর্কে সাধারণ কোনো সূত্র বা সিদ্ধান্ত যা কোনো সামাজিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে ব্যাখা প্রদান করে। মতবাদ বা তত্ত্বে সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অনুমান সন্নিবেশিত থাকে। এখানে বাস্তব তথ্যের সাথে সৃষ্টিশীল চিন্তার প্রয়োগ করা হয়। মতবাদ কখনো সত্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। মতবাদের মাধ্যমে সাধারণীকরণের প্রয়াস থাকে।

শিক্ষা মতবাদ হচ্ছে এমন মতবাদ বা তত্ত্ব যা শিক্ষা প্রত্যয়কে ধারণ করে প্রবর্তিত। অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের উপায়, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া (Teaching-Learning process), শিক্ষার প্রভাব ও কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে মনীষীরা যেসব মতবাদ দিয়েছেন তাকে শিক্ষা মতবাদ বলে। শিক্ষা সম্পর্কে এমিল ডুর্খেইম, কার্ল মার্কস এবং কার্ল মেনহেইমের মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এমিল ডুর্খেইমের শিক্ষা মতবাদ: ডুর্খেইমের মতে, জীবন যাপনের প্রস্তুতি হিসেবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের চর্চিত ক্রিয়াই হল শিক্ষা। অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠদের জ্ঞান, ধারণা, অভিজ্ঞতা শিশুদের উপর প্রয়োগের কৌশল হচ্ছে শিক্ষা। সমাজজীবনের চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষা শিশুর মধ্যে দৈহিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক শক্তিকে জাগ্রত ও বিকশিত করে। তাঁর মতে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (Schooling) নতুন প্রজন্মের সুশৃঙ্খল সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। ডুর্খেইম তাঁর *Moral Education (1906)* এ সমাজে শিক্ষার ভূমিকা তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, যেকোনো ধরনের শিক্ষা শিশুদের প্রত্যক্ষণ, অনুভূতি এবং কর্মক্ষমতা অর্জনে বাধ্য করার একটি চলমান প্রচেষ্টা। আর এটি কেউ খুব সহজেই অর্জন করতে পারে না।

ডুর্খেইম শিক্ষা বিজ্ঞানের সাথে শিক্ষকতার কৌশল বা শিক্ষা চর্চার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, পদ্ধতিগত এবং বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন ব্যতীত শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষার উপরও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য 'ভবিষ্যৎ-শিক্ষক'দেরকে নৈতিক শিক্ষা অর্জন ও প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এজন্য তিনি সমাজে পূর্বনির্ধারিত আচরণবিধি মেনে চলা, সবার সাধারণ স্বার্থে কাজ করা এবং যতটা সম্ভব আমাদের বিভিন্ন আচরণের কারণ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণাঙ্গ সচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষা বিজ্ঞানে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাতাত্ত্বিক বিষয়ের সমন্বয় সাধন জরুরি।

কার্ল মার্কসের শিক্ষা মতবাদ: কার্ল মার্কস ১৮৫৯ সালে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা উপস্থাপন করেন। ১৮৬০ সালে তাঁর *On General Education* প্রকাশিত হয়। মার্কসের মতে, সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক

হওয়া বাঞ্ছনীয়। মার্কস মনে করেন, শিক্ষা কখনো ব্যক্তিগত বিষয় হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষাকে তিনি কেবল সরকারিকরণ নয়, জাতীয়করণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কার্ল মার্কসের মতবাদে শিক্ষাকে সর্বজনীন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সব শিশুকে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের অব্যাহত প্রচেষ্টার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন।

নতুন প্রজন্মকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে পুঁজিবাদী সমাজের শিক্ষায় শাসক শ্রেণির আদর্শ প্রতিফলিত হয়। ফলে তাদের ছেলেমেয়েরাই সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা পায়। বিদ্যামান শিক্ষা ব্যবস্থায় অসমতা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। এক্ষেত্রে মার্কস এবং এঙ্গেলস শিক্ষাকে শাসক শ্রেণির কবল থেকে উদ্ধার করার কথা বলেছেন।

মার্কসের মতে, বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজে শিক্ষার সাথে কাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শিক্ষা উৎপাদনশীল দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার ভূমিকা আরো বেশি বিস্তৃত। এখানে শিক্ষা সমাজের সব মানুষের উন্নয়নের পরিচর্যা করে।

কার্ল মেনহেইমের শিক্ষা মতবাদ: কার্ল মেনহেইমের কাছে শিক্ষা হচ্ছে জীবন-যাপন প্রণালী এবং চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করার একটি উপায়। একইসাথে একটি জাতির প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং দর্শনগত মূল্যবোধের প্রকাশ হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। নির্দিষ্ট বয়সের যেসব জটিলতা, সমস্যা বা চাহিদা রয়েছে সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিত যাতে সমাজের বিশেষ কোনো প্রজন্মের উৎকর্ষে অবদান রাখতে পারে। মেনহেইম একটি সাধারণ নীতির উপর ভিত্তি করে তাঁর তত্ত্ব প্রদান করেছেন। এটি কোনো মাঠ গবেষণার ফলাফল নয়। তবে শিক্ষা বিষয়ক এ তত্ত্ব মেনহেইমের সমাজতাত্ত্বিক অবদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মেনহেইম শিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষা অবশ্যই পরীক্ষণের জন্য উন্মুক্ত, তথ্য অনুসন্ধানমূলক এবং মূল্যায়নভিত্তিক হতে হবে। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সামাজিক শিক্ষার সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা স্কুল-কলেজ থেকে আর সামাজিক শিক্ষা সমাজের প্রভাবে অর্জিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষা সম্পর্কে এমিল ডুর্খেইম অথবা কার্ল মার্কসের মতবাদ ব্যক্ত করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

শিক্ষা মতবাদের ক্ষেত্রে এমিল ডুর্খেইম, কার্ল মার্কস এবং কার্ল মেনহেইমের মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডুর্খেইমের মতে, জীবন যাপনের প্রস্তুতি হিসেবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের চর্চিত ক্রিয়াই হল শিক্ষা। অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠদের জ্ঞান, ধারণা, অভিজ্ঞতা শিশুদের উপর প্রয়োগের কৌশল হচ্ছে শিক্ষা। মার্কসের মতে, সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। মার্কস মনে করেন, শিক্ষা কখনো ব্যক্তিগত বিষয় হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষাকে তিনি কেবল সরকারিকরণ নয়, জাতীয়করণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কার্ল মেনহেইমের কাছে শিক্ষা হচ্ছে জীবনযাপন প্রণালী এবং চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করার একটি উপায়। একইসাথে একটি জাতির প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং দর্শনগত মূল্যবোধের প্রকাশ হচ্ছে শিক্ষা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "পূর্ববর্তী প্রজন্মের চর্চিত ক্রিয়াই হল শিক্ষা" উক্তিটি কার?
(ক) রুশো (খ) কার্ল মার্কস (গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) ম্যাক্স ওয়েবার

২। *On General Education (1860)* কার রচনা?
(ক) ম্যাক্স ওয়েবার (খ) রবার্ট মার্টন (গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) কার্ল মার্কস

৩। কার্ল মেনহেইমের মতে শিক্ষা হচ্ছে:
(ক) জীবনযাপন প্রণালী এবং চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করার একটি উপায়
(খ) আচরণের পরিবর্তন
(গ) বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ (ঘ) সৃজনশীলতার উৎকর্ষ

পাঠ-১০.৭ ধর্ম
Religion

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ধর্মের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা ব্যাখা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ধর্ম, বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত শক্তি ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

সামাজিক ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ধর্ম। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের প্রাথমিক স্তরেই মানুষ ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। সভ্যতার বিকাশ কিংবা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক মূল্যবান উপাদান হিসেবে ধর্ম হাজার বছর টিকে আছে। বস্তুত মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরশীলতার এক চিরন্তন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ধর্ম। সে কারণেই সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত।

ধর্মের সংজ্ঞা (Definition of religion)

ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ Religion এসেছে Religere শব্দমূল থেকে যার অর্থ বন্ধন বা সংহতি। অন্যদিকে ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ধর্ম হচ্ছে এমন একটি প্রত্যয় যা কোনো বিশেষ সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে কিছু মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে। E.B Tylor তাঁর *Primitive Culture* গ্রন্থে বলেছেন, ধর্ম হচ্ছে অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করা (Relgion is belief on super natural being).

The Elementary Forms of Religious Life গ্রন্থে Emile Durkheim বলেছেন, ধর্ম হচ্ছে পবিত্র বস্তুর প্রতি বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতার সমন্বিত ব্যবস্থা। উল্লিখিত পবিত্র বস্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং নিষিদ্ধ হিসেবেও বিবেচিত। বিশ্বাস ধর্মীয় আচরণ একটি নীতি সম্প্রদায়ের চার্চের ন্যায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত যা তাদেরকে সুদৃঢ় বন্ধানে আবদ্ধ করে। (Religion is a unified system of beliefs and practice relative to sacred things that is things set a part and forbidden. Beliefs and practices a church all those who adhere to them.)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ক) অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর বিশ্বাস (Belief), খ) বিশ্বাসের ভিত্তিতে কিছু কাজ বা আচরণ (Practice) এবং গ) কিছু আনুষ্ঠানিকতা (Ritual)। অর্থাৎ মানুষ প্রথমে বিশেষ কোনো শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। এ শক্তির সন্তুষ্টির জন্য পূজা, প্রার্থনা, বলিদান, উপবাস, পুণ্যস্থান দর্শন ইত্যাদি চর্চা করে। বিশ্বাস ও কাজের সমন্বয়ে তৈরি হয় কিছু আনুষ্ঠানিকতা। যেমন প্রার্থনার জন্য পবিত্রতা অর্জন, পোশাক-পরিচ্ছদের শালিনতা, নিয়ম-কানুন মেনে চলা ইত্যাদি।

সুতরাং ধর্ম হচ্ছে একটি চেতনাবোধ যা অতিমানবীয় কোনো শক্তির উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। ধর্মীয় চেতনাবোধ একই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে গভীর ঐক্য তৈরি করে।

সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা (Role of religion in society)

সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম। মনীষীদের মতে সমাজের গর্ভ থেকে যেমন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি সমাজ বিকাশে ধর্মের প্রভাব অনেকখানি। নিচে সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

০১) সামাজিক সংহতি সৃষ্টি করে: সামাজিক সংহতি সৃষ্টিতে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একই ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে সংহতি বোধ করে। অভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করে।

০২) **সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করে:** ধর্মে ঐক্য বা সংহতি শক্তির (Unified force) পাশাপাশি বিভাজন শক্তিও (Devicive force) বিদ্যমান। বিভাজন শক্তির ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে। এক ধর্মের অনুসারীদের সাথে অন্য ধর্মের

অনুসারীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দাঙ্গা-কলহ লেগে যেতে পারে।

০৩) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ বাহন হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম দু'ভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমত ধর্মীয় শিক্ষা তথা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করে। দ্বিতীয়ত ধর্ম পরকালে শাস্তির ভয় দেখায়। মৃত্যুর পর দোজখে শাস্তির ভয় এবং বেহেস্তে অপার সুখ-শান্তি মানুষকে সৎ পথে জীবন-যাপনে উৎসাহিত করে।

০৪) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: ধর্ম আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। Max Weber এর মতে, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উদারনীতি ইউরোপে পুঁজিবাদ বিকাশে ভূমিকা রখেছে। আবার সনাতন এবং ইসলাম ধর্ম ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনকে তুচ্ছ বলে ধারণা দেয়। ফলে এখানে অর্থনৈতিক উন্নতি ও পুঁজিবাদের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি।

০৫) বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ক: বিবাহ এবং যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। বিবাহের নানা রীতিনীতি, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, আনুষ্ঠানিকতা, স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আদি হতে আজ পর্যন্ত প্রতিটি সমাজে যৌন সম্পর্কের উপর ধর্মের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। 'অজাচার' প্রথা মোতাবেক কার কার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না তা ধর্ম দ্বারাই নির্ধারিত।

০৬) পরিবার ও দৈনন্দিন জীবন: অনেকে বলেন, ধর্ম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পরিবার এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সবকিছু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, নির্দেশিত। ধর্মভীরু মানুষ তাদের জন্ম, মৃত্যু, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, আনন্দ-উৎসব সবকিছু ধর্মীয় নির্দেশনানুযায়ী সম্পন্ন করতে চেষ্টা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ধর্ম হচ্ছে বিশেষ অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করা। মূলত সৃষ্টিকর্তা ও ব্যক্তির মধ্যে ধ্যান বা আরাধনার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস, প্রতীকী কর্মকাণ্ড এবং উপাসনা করার একটি ব্যবস্থা যা জ্ঞান অপেক্ষা বিশ্বাস দ্বারা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত। সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজের গর্ভ থেকে যেমন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি সমাজ বিকাশের ধর্মের প্রভাব অনেকখানি। সামাজিক সংহতি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, বিবাহ ও যৌন সম্পর্ক র্নিধারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Religion শব্দের অর্থ কী?
- (ক) বন্ধন বা সংহতি
- (খ) বিশ্বাস
- (গ) সৃষ্টিকর্তা
- (ঘ) প্রার্থনা

২। ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে:
- (ক) ভয়/ভীতি
- (খ) বিশ্বাস
- (গ) সৃষ্টিকর্তা
- (ঘ) প্রার্থনা

৩। নিচের কোনো ক্ষেত্রে ধর্মের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে:
- (ক) সামাজিক অসমতা
- (খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
- (গ) সামাজিক সংহতি
- (ঘ) 'খ' এবং 'গ' উভয়

পাঠ-১০.৮ ধর্মের উৎপত্তি
Origin of Religion

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	ধর্মের উৎপত্তি, মহাপ্রাণবাদ, বিবর্তনবাদ, সর্বপ্রাণবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন তত্ত্ব প্রদান করেছেন। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেমন বিবর্তনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে, তেমনি ধর্মও বিবর্তিত হয়ে ক্রমশ একেশ্বরবাদে উন্নীত হয়েছে। মানুষের জীবন, জীবিকা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি ধর্মের উৎপত্তিতে ভূমিকা রেখেছে। ম্যারেট মনে করেন, চিন্তা-ভাবনা থেকে নয় বরং মানুষের কর্মকাণ্ড থেকেই ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। ফ্রেজারের মতে ধর্মের উৎপত্তির মূলে রয়েছ যাদুবিদ্যা। ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় এখানে কয়েকজন মনীষীর মতবাদ নিম্নে প্রদান করা হল।

মহাপ্রাণবাদ (Animatism)

ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ম্যারেটের (Marret) মহাপ্রাণবাদ বহুল আলোচিত একটি মতবাদ। তিনি তাঁর *The threshold of Religion (1914)* গ্রন্থে এ মতবাদ ব্যাখা করেছেন। ম্যারেটের মতে, মানুষের ধর্মচিন্তার সূচনা হয়েছে মহাপ্রাণবাদের মাধ্যমে। মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিনিয়ত নানা প্রতিকূলতার সম্মুখিন হতো। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রতিদিন মানুষের মৃত্যু হতো, তাদেরকে নানা চড়াই-উৎরাই পার হতে হতো। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের কোনো কৌশল তখনো মানুষ রপ্ত করতে পারেনি। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় মানুষের জানা ছিল না। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড ভীতি ছিল। যার মাধ্যমে এ ভীতিকর অবস্থা তৈরি হতো তাকে 'মনা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মনা অতিপ্রাকৃত অস্বাভাবিক একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি (Impersonal power)। এ শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন ছিল ধর্মের আদিরূপ। ম্যারেট একে মহাপ্রাণবাদ বলে উল্লেখ করেছেন।

বিবর্তনবাদী মতবাদ (Evolutionary theory)

ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় নৃবিজ্ঞানী টেইলরের (E.B Tylor) তত্ত্ব বিবর্তনবাদ নামে পরিচিত। টেইলরের মতে, আত্মার ধারণাকে কেন্দ্র করেই ধর্মের উৎপত্তি, বিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে। টেইলরের এ মতবাদ সর্বপ্রাণবাদ বা Animism নামেও পরিচিত। বিবর্তনবাদে বলা হয়েছে তিনটি স্তর অতিক্রম করে ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এগুলো হচ্ছে:

ক) সর্বপ্রাণবাদ (Animism)
খ) বহু ঈশ্বরবাদ (Polytheism) এবং
গ) একেশ্বরবাদ (Monotheism)।

সর্বপ্রাণবাদ: টেইলরের মতে, মানুষের আত্মা সম্পর্কে ধারণা থেকে ধর্মের সূচনা হয়েছিল। দিনের আলোয় নিজের ছায়া, পানিতে প্রতিচ্ছবি এবং ঘুমালে মানুষ স্বপ্ন দেখে। এসব থেকে তারা আত্মা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। তারা মনে করত, আত্মা দেহছাড়া হলে মানুষের মৃত্যু হয়। তারা আত্মাকে এক অদৃশ্য শক্তি এবং সবকিছুর নিয়ন্ত্রক বলে মনে করত। তারা পূজা, উপাসনা কিংবা অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে আত্মা বা অদৃশ্য শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করত। মৃত আত্মার সন্তুষ্টির জন্য তারা পূর্বপুরুষের পূজা করত।

বহু ঈশ্বরবাদ: বর্বর যুগের শেষ পর্যায়ে বহু ঈশ্বরবাদের প্রচলন ঘটে। বহু ঈশ্বরবাদ হচ্ছে মূলত অসংখ্য দেবদেবীতে বিশ্বাস স্থাপন। প্রকৃতি পূজাও বহু ঈশ্বরবাদের অন্তর্ভুক্ত। সূর্য, বৃক্ষ, বায়ু প্রভৃতি ছাড়াও তারা মৃত্যুদেবতা, যুদ্ধদেবতা, কৃষি ও শিকারের দেবতা, ভাগ্যদেবী প্রমুখের পূজা করত।

একেশ্বরবাদ: ধর্মের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ হচ্ছে একেশ্বরবাদ। জ্ঞান-বুদ্ধি, মেধা, অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বিশ্বের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে এক ও অদ্বিতীয় এক মহাপরাক্রমশালী শক্তি। মানুষ তাদের ব্যাখ্যাতীত বিষয়ে একক সৃষ্টিকর্তার ঐশ্বরিক শক্তির কাছে নিজেদেরকে সমর্পন করে। তারা একক সত্তার প্রার্থনা করতে থাকে। এটিই একেশ্বরবাদ। সভ্যতার উৎকর্ষে একেশ্বরবাদ আরো শক্তিশালী হয়েছে, বিস্তৃতি লাভ করেছে।

ক্রিয়াবাদী মতবাদ (Functional theory)

ক্রিয়াবাদীদের মতে, মানুষ তার প্রয়োজনেই ধর্ম সৃষ্টি করেছে। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীবিকার তাগিদে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। নাজমুল করিমের মতে, প্রাচীনকালে কৃষিকাজের সুবিধার জন্য এবং জরা-ব্যাধি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মুক্তির জন্য ভগবানের দরকার হয়ে পড়ে। এর সাথে পারলৌকিক বা ঐশ্বরিক প্রেরণার কোনো সম্পর্ক নেই। বৃষ্টির দেবতা, জরা-ব্যাধির দেবতাকে পূজা অর্চনার মাধ্যমে ধর্মের উৎপত্তি হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার আলোকে ধর্ম বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ (Sociological theory)

ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় সমাজতাত্ত্বিকদের প্রয়াসও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অগাস্ট কোঁৎ, কার্ল মার্কস, এমিল ডুর্খেইম প্রমুখ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। কোঁৎ ধর্মকে মানুষের বিশেষ মানসিক অবস্থা (State of mind) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসেরও পরিবর্তন ঘটে। বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির সাথে সাথে ধর্মও সুগঠিত, সুশৃঙ্খল, পরিপক্ক এবং উন্নত রূপ লাভ করে। মানুষ যুক্তির আলোকেই বহুঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে উন্নীত হয়। কোঁৎ ধর্মের বিবর্তনকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

ক) ধর্মতাত্ত্বিক স্তর বা ঈশ্বরবাদ (Theological stage): আদিম বা প্রাথমিক সমাজে মানুষ ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে ছিল। যুক্তিহীন মানুষ সবকিছুতে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব বলে মনে করত। ঈশ্বরবাদের প্রথম পর্যায়ে (Fatishism) মানুষ প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু, ঘটনা বা দুর্ঘটনাকেই প্রাণবন্ত বলে মনে করত। দাবানল, বৃষ্টি কিংবা বন্যা হলে তারা এগুলোকে জীবন্ত এবং ক্ষমতাশালী বলে মনে করত। এরপরে মানুষ বস্তু বা ঘটনার পরিবর্তে অতিপ্রাকৃত শক্তি বা দেবদেবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে (Polytheism)। তারা বিশ্বাস করত, কোনো বস্তু বা ঘটনা নিজে নয়, অসংখ্য দেবদেবী নেপথ্যে থেকে সবকিছু পরিচালনা করছে। অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানচর্চার ফলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আরো উৎকর্ষ লাভ করে। তখন তারা মনে করে, বহু দেবদেবী নয়, সবকিছুর মূলে রয়েছে মহাশক্তিধর একজন ঈশ্বর (Monotheism)।

খ) দর্শনতাত্ত্বিক স্তর (Metaphysical stage): আদিম এবং আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী সময় (মধ্যযুগে) দর্শনতাত্ত্বিক স্তরের বিকাশ ঘটে। এ সময় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আরো শানিত হয়। এ স্তরে তারা অদৃশ্য কাল্পনিক শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে। এ স্তরে মানুষ সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করে।

গ) দৃষ্টবাদী স্তর (Positive stage): আধুনিক মানুষের চিন্তা ও দর্শনকে কোঁৎ দৃষ্টবাদ বলে অভিহত করেছেন। এখানে যুক্তি এবং কার্যকারণ সম্পর্কের আলোকে সবকিছু ব্যাখ্যা করা হয়। ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষা বিজ্ঞানের আশীর্বাদ মানুষের পার্থিব জীবনকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হলেও মানুষ যুক্তিহীন সংস্কার পরিহার করতে সচেষ্ট হয়।

কার্ল মার্কসের মতে, ধর্ম হচ্ছে ক্ষমতাশালীদের শোষণের হাতিয়ার। সমাজে যারা প্রভাবশালী তারাই ধর্মকে নিজের পক্ষে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। তিনি মনে করেন, ধর্ম কোনো ঐশ্বরিক বিষয় নয়। সমাজজীবনেও ধর্মের প্রভাব সীমিত। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, ধর্ম কোনোকিছুর ফলাফল নয়, বরং ধর্ম নিজেই ফলাফলকে প্রভাবিত করার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সামাজিক পরিবর্তনে তিনি ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেছেন।

এমিল ডুর্খেইম ধর্মের উৎপত্তিতে সমাজ জীবনকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজই ধর্মের উৎপত্তি স্থল। ধর্মীয় আদর্শ, রীতিনীতি সমাজ-প্রকৃতির প্রতীক। তাঁর মতে, সমাজই ঈশ্বর। মানুষ ঈশ্বরকে যেমন সমীহ করে চলে, তেমনি সমাজকেও সম্মান প্রদর্শন করে। ধর্ম সামাজিক সংহতির অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে।

ডুর্খেইম ধর্মের ব্যাখ্যায় পবিত্রতা (Sacred) এবং অপবিত্রতার (Profance) উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। পবিত্রতার ধারণাটি মূলত অপার্থিব বা ঐশ্বরিক বিষয়ের সাথে যুক্ত। মানুষ অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উপস্থাপন বা সমর্পন করার সময় দৈহিক ও মানসিক পবিত্রাকে অপরিহার্য বলেই মনে করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনবাদী কিংবা সমাজতাত্ত্বিক যেকোনো একটি মতবাদ সংক্ষেপে ব্যাখা করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ধর্ম সমাজের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে মনীষীদের মধ্য নানা মতপার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে ম্যারেট, ই.বি টেইলর প্রমুখ বিবর্তনবাদের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এখানে আত্মার ধারণা ধর্মের উৎপত্তিতে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হয়। আবার কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, মানুষের জীবন-জীবিকা ও ভৌগোলিক পরিবেশ ধর্মের উৎপত্তিতে বিশেষ ভূমিকা রখেছে। তারা ধর্মের ঐশ্বরিক বিষয়কে অস্বীকার করেছেন। ডুর্খেইম ধর্মের সাথে টোটেমবাদ এবং পবিত্রতা ও অপবিত্রতার সম্পর্ককে যুক্ত করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। The Elementary Forms of Relgious Life গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) অগাস্ট কোঁৎ (খ) ই.বি টেইলর
(গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) স্যামুয়েল কোয়েনিগ

২। অগাস্ট কোঁৎ ধর্মের বিবর্তনকে কয়টি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন?
(ক) দু'টি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

৩। সর্বপ্রাণবাদ তত্ত্বের প্রবর্তক কে?
(ক) অগাস্ট কোঁৎ (খ) ম্যারেট
(গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) ই.বি টেইলর

পাঠ-১০.৯ নৈতিকতা
Morality

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নৈতিকতার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন এবং
- সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব ব্যাখা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নৈতিকতা।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

মানুষের সাথে ইতর প্রাণির পার্থক্য তৈরিতে বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিকতা সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। মানুষ যা খুশি তা করতে পারে না। কেবল নিজের স্বার্থ রক্ষা, অপরের ক্ষতিসাধন, কাউকে কষ্ট দেয়া এগুলো মানবিক গুণের পরিপন্থী। মানবিক গুণের মূলে কাজ করে মানুষের নীতিবোধ ও আদর্শ। নৈতিক মানদণ্ডে অগ্রগামিতাই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। সমাজে যে যত নৈতিকতার চর্চা করে সে তত শ্রদ্ধাভাজন, গ্রহণযোগ্য ও বরেণ্য ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। অপর দিকে অনৈতিক কাজের জন্য সমাজ, রাষ্ট্র, আইন ও ধর্ম তিরস্কার ও নানা শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকে। তাই সভ্য সমাজে নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম।

নৈতিকতা কী (What is morality)

নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ "Morality" ল্যাটিন "Moralitas" শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে যার অর্থ আদব-কায়দা, চরিত্র বা সঠিক আচরণ। Morality-এর সমার্থক শব্দ হিসেবে Ethics প্রত্যয়টিও বহুলব্যবহৃত। নৈতিকতা হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনায় সঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। বস্তুত শুদ্ধ ও ভুলের মধ্যে প্রভেদ তৈরি করতে পারাই নৈতিকতা।

Marc Hauser তার *Moral Minds: How Nature Designed our Universal Sense of Right and Wrong* (2006) গ্রন্থে বলেছেন, To take morality to refer to an actually existing code of conduct put forward by a society results in a denial that there is a universal morality, one that applies to all human beings. অর্থাৎ নৈতিকতা হচ্ছে সমাজ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বিদ্যমান কিছু আচরণবিধি যা সব মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

নৈতিকতা সম্পর্কে ডুর্খেইম (১৯৬১:২৪) তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন:

ক) কেউ কিভাবে আচরণ করবে তার শিক্ষা হচ্ছে নৈতিকতা। অর্থাৎ সমাজে পূর্বনির্ধারিত আচরণবিধি মেনে চলা।

খ) নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি কেবল নিজের স্বার্থে নয়, সমাজ ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করবে। নিজের কোনো কাজের ফলে যেন অপরের ক্ষতি না সে বিষয়ে লক্ষ রাখবে। এবং

গ) মানুষের বিভিন্ন আচরণের কারণ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা নৈতিকতার জন্য অপরিহার্য।

অতএব, নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও দর্শনগত একটি গুণ যার মাধ্যমে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শুদ্ধ-ভুলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। নৈতিকতা মানুষকে সততা, শুদ্ধতা এবং ন্যায্যতার দীক্ষা দেয়।

সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব (Impact of morality in society)

সমাজ ও সভ্যতার উৎকর্ষে নৈতিকতার প্রভাব অপরিসীম। সমাজে নৈতিকতা না থাকলে নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা বাসা বাঁধে। এখানে সমাজে নৈতিকতার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

০১) **সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে:** নৈতিকতা মানুষকে যাচ্ছেতাই করা থেকে বিরত রাখে। নৈতিকতা না থাকলে মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা সবকিছু বিপন্ন হতে পারে। নৈতিকতার চর্চা হলে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায়।

০২) **আইনের শাসন বহাল থাকে:** নৈতিকতা মানুষকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে। 'আইন সবার জন্য সমান'– এ নীতিবাক্য প্রয়োগে নৈতিকতা অপরিহার্য। নৈতিকতা ব্যতীত আইনের শাসন অসম্ভব।

০৩) **মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা:** সব মানুষেরই জন্মগতভাবে কিছু অধিকার রয়েছে। বেঁচে থাকা থেকে শুরু করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সবই তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। অধিকার প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার বিকল্প নেই।

০৪) **সামাজিক সমতা রক্ষা:** সমাজের অনিবার্য বাস্তবতা হচ্ছে কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র; কেউ সবল আবার কেউ দুর্বল। এখানে কেউ শাসক আবার অনেকে শাসিত। কিন্তু সমাজের সমতা ও ভারসাম্য রক্ষায় নৈতিকতা অপরিহার্য।

০৫) **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ:** 'মানুষ বিবেকের দাস'। তাই ক্ষুধা লাগলেই কেউ অপরের খাবার কেড়ে খায় না। বিবেক ও নৈতিকতা মানুষের অনেক ইচ্ছার লাগাম টেনে ধরে। নৈতিক শিক্ষার ফলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না।

০৬) **সততার শিক্ষা দেয়:** নৈতিকতা ও সততাকে অনেকে সমার্থক বলে মনে করেন। বস্তুত নৈতিকতাই সততার শিক্ষা দেয়। কী করা উচিত আর কী উচিত নয়, কোনোটি কল্যাণকর আর কোনোটি ক্ষতিকর নৈতিকতার মাধ্যমে এ বোধ তৈরি হয়।

০৭) **কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহ যোগায়:** দরিদ্র, অসহায় ও অনগ্রসর মানুষকে সহায়তা করা একটি নাগরিক দায়িত্ব। সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক যেকোনো কাজের মূলে নৈতিকতার প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

০৮) **সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে:** নৈতিকতা মানুষকে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে। নৈতিকতা সম্পন্ন কোনো মানুষ কখনো সমাজবিরোধী কাজে সম্পৃক্ত হতে পারে না।

০৯) **সমাজের অবক্ষয় রোধ করে:** নৈতিকতার অবক্ষয় মানে সমাজের অবক্ষয়। একটি সমাজ কতটা উন্নত ও স্থিতিশীল হবে তা নির্ভর করে ওই সমাজে কতটা নৈতিকতার চর্চা হয় তার উপর। কোনো সমাজ থেকে নৈতিকতা তুলে দিলে সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না।

১০) **চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করে:** মানুষের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে নৈতিকতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কোনো মানুষ সৎ নাকি অসৎ হবে, শান্তশিষ্ট নাকি বদমেজাজি হবে তা অনেকটা সমাজে প্রচলিত নৈতিকতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

নৈতিকতার অবক্ষয় এবং নৈতিক শিক্ষার উপায়

'নৈতিকতার অবক্ষয়' সাম্প্রতিককালের বহুলউচ্চারিত বিষয়। বিশেষ করে তরুণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয় সমাজবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মানের অভাব, বেপরোয়া মনোভাব, বখাটেপনা, মাদকাসক্তি, বিকৃত কিংবা অননুমোদিত যৌনাচার, কিশোর অপরাধ, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে কিশোর-তরুণদের ক্রমবর্ধমানহারে সম্পৃক্ততা নৈতিকতার অবক্ষয়ের স্মারক হিসেবে বিবেচিত হয়। শিশুদের উপর পাশবিক আচরণ, বর্বর নির্যাতন এমনকি অপহরণ, হত্যা কিংবা গুমের মত ঘটনাও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয়। এসব কর্মকাণ্ড মূলত নৈতিকতার অবক্ষয়ের ফল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এবং কিভাবে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে? প্রথমত, অপসংস্কৃতির প্রভাবে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে। নিজ দেশ বা সমাজের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি পরিহার করে তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। দ্বিতীয়ত, আধুনিক প্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিকস গণমাধ্যম আমাদের দেশের তরুণ সমাজের নৈতিকতার অবক্ষয়ে ভূমিকা রাখছে। এসব প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের কল্যাণে বিদেশি তথা অপসংস্কৃতির সন্ত্রাস, যৌনতা ইত্যাদি তরুণদের আকৃষ্ট করে। ফলে এদের অনেকে নানারকম আপত্তিকর ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষার অভাবে অনেকে ক্রমশ অনৈতিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠ্যপুস্তকে কার্যকরভাবে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের অভাবে নতুন প্রজন্মের অনেকে বিপথে চালিত হয়। চতুর্থত, নগর জীবনের একক পরিবারে বাবা-মা দু'জনই প্রায়শ ব্যস্ত থাকেন। সন্তানকে খুব বেশি সময় দিতে পারেন না। একাকিত্ব থেকে তারা একসময় বেপরোয়া হয়ে উঠে। পঞ্চমত, আমাদের দেশে সুস্থ বিনোদনের অভাব রয়েছে। ফলে অনেকে অনৈতিক ও অননুমোদিত বিনোদনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ষষ্ঠত, নৈতিকতার অবক্ষয়ে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয় অনেক সময়ই সেগুলোর দৃষ্টান্তমূলত বিচার হয় না।

এখন দেখা যাক নৈতিক শিক্ষা কীভাবে অর্জন করা যায়। প্রথমত নিজ ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা প্রয়োজন। নিজ সংস্কৃতি নিয়ে যে গর্ব অনুভব করতে পারে সে কখনো অপসংস্কৃতি দ্বারা বিভ্রান্ত হয় না। ধর্মীয় অনুশাসন

যে মেনে চলে তার পক্ষে কখনো বিপথগামী হওয়া সহজ নয়। দ্বিতীয়ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় নৈতিকতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার প্রতিটি স্তরে নৈতিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করা জরুরি। সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় এবং আদর-স্নেহ দিতে হবে। সন্তান বা ছোট ভাই-বোন বা পরিবারের সদস্যরা কে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কার সাথে মিশছে, কিভাবে টাকা খরচ করছে সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ভুল-ত্রুটি বা অপরাধ করলে কাউন্সেলিং- এর পাশাপাশি পরিমিত শাসনও থাকা উচিত। চতুর্থত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি) ব্যবহার এবং বিদেশি টিভি চ্যানেল দেখার বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে। পঞ্চমত সুস্থ বিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হলে অনৈতিক বিনোদনের চাহিদা এবং আগ্রহ কমে যাবে। প্রচুর পরিমাণে খেলাধুলা, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা ইত্যাদি মানুষকে বিপথগামিতা থেকে ফেরাতে পারে। ষষ্ঠত আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধী ও অনৈতিকতার চর্চা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজজীবনে নৈতিকতার প্রভাব বর্ণনা করুন।	**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সংহতির জন্যও নৈতিকতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু নানা কারণে সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে থাকে। বিশেষ করে তরুণ সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় এখন সামাজিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এর থেকে উত্তরণের জন্য নৈতিক শিক্ষা, নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের চর্চা অপরিহার্য। সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, সন্তান এবং ছোট ভাই-বোনদের প্রতি নিবিড় স্নেহ-ভালোবাসা, তাদেরকে সময় দেয়া এবং সুস্থ বিনোদন, খেলাধুলা, বিতর্ক ইত্যাদি তরুণদের বিপথগামিতা রোধ করে নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "Morality" শব্দটি কোনো শব্দ থেকে উদ্ভুত?

(ক) ল্যাটিন শব্দ Morals থেকে (খ) ল্যাটিন শব্দ Moralitas থেকে

(গ) রোমান শব্দ Morali থেকে (ঘ) গ্রিক শব্দ Moralitia থেকে

২। "Morality" শব্দের অর্থ কী?

(ক) আদব-কায়দা (খ) চরিত্র

(গ) সততা (ঘ) সুপথ

৩। নৈতিকতা বিষয়ে এমিল ডুর্খেইম কয়টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন?

(ক) দু'টি (খ) তিনটি

(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

পাঠ-১০.১০ রাষ্ট্র
State

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- রাষ্ট্রের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- রাষ্ট্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্র, জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

আদিম সমাজে মানুষ যখন যূথবদ্ধ সমাজে বসবাস করত তখনও তারা একজন নেতার নেতৃত্বে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হত। স্বাস্থ্য, সক্ষমতা, বয়স, লিঙ্গ, শক্তি ইত্যাদি বিবেচনায় নেতা নির্বাচিত হত। নেতা নির্বাচন, নেতার প্রতি আনুগত্যতা ইত্যাদির মধ্য দিয়েই মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে। মানব সমাজ ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ক্রমশ জটিল রূপ ধারণ করেছে। রাষ্ট্র তেমনই এক জটিল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের ধারণা, এর উপাদান ও বৈশিষ্ট্য এবং উৎপত্তি সম্পর্কে মনীষীরা নানা মত ব্যক্ত করেছেন।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of state)

রাষ্ট্র যেমন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্র। Gillin and Gillin রাষ্ট্রের দু'টি বিশেষ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। "গঠনতন্ত্রের পটভূমিতে রাষ্ট্র, গঠনতন্ত্রে প্রতিফলিত রাষ্ট্র।" রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব প্রথম স্বরূপকে সামনে রেখে রাষ্ট্রকে মূল্যায়ন করে। সব দেশের গঠনতন্ত্রই সেদেশের সমাজ, সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ের পটভূমিতে তৈরি হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক গার্নার (Garner)। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র কম-বেশি এমন একটি জনসমষ্টি যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাস করে, যারা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং যাদের একটি সংগঠিত সরকার আছে যার প্রতি তারা স্বভাবতই আনুগত্য প্রদর্শন করে। ("State is a community of persons, more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so of external control and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience").

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, রাষ্ট্র হল সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদানের একটি সংঘ। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে, অন্যান্য সংঘের সাথে রাষ্ট্রের পার্থক্য হল শক্তি প্রয়োগের চরম ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই কর্তৃত্বাধীন। সরোকিন (P. A. Sorokin) বলেছেন, 'রাষ্ট্র হল তার কর্তৃত্বাধীন জনগণের সকল গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক তত্ত্বাবধান ও চাপ প্রশমনের সংগঠন।'

অতএব, রাষ্ট্র হচ্ছে জনগণকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার একটি শক্তিধর ও সার্বভৌম সংগঠন। জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ।

রাষ্ট্রের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য (Elements and Characteristics of state)

রাষ্ট্রের প্রধানত চারটি উপাদান রয়েছে। যথা:

১। জনসসমষ্টি (Population)**:** জনসসমষ্টি নিয়েই রাষ্ট্র। এ জন্য জনসংখ্যাকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করা হয়। তবে জনসংখ্যার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। রাষ্ট্রভেদে জনসংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে।

২। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory)**:** রাষ্ট্রের সীমারেখা অবশ্যই ভোগোলিকভাবে নির্ধারিত থাকে। সেজন্য রাষ্ট্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো এর নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাসকারী জনসংখ্যা রাষ্ট্র গড়ে তোলে।

৩। সরকার (Government)**:** জনসংখ্যাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সংগঠিত করা, তাদের কল্যাণ সাধন, দেশের সার্বভৌমত্ব এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদানের নাম সরকার।

৪। সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty)**:** সার্বভৌম ক্ষমতা হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক ও নিরংকুশ ক্ষমতা। এর দ্বারা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা যায়।

উপর্যুক্ত উপাদানগুলো রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবেও বিবেচিত। রাষ্ট্রের আরোকিছু বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক) রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান। এটি সমাজের অংশ, তবে সমাজ রাষ্ট্রের অংশ নাও হতে পারে। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিসীমা আছে, সমাজের ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক নয়।

খ) জনগণের কল্যাণ সাধন এবং তাদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও এর অধিবাসীদের সার্বিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে একটি সার্বভৌম সরকার থাকা রাষ্ট্রের জন্য বাঞ্ছনীয়।

ঘ) অন্যান্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও স্বার্থ-গোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

ঙ) সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিমের মতে, সহযোগিতা এবং অবদমন (Domination) রাষ্ট্রের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য।

চ) রাষ্ট্র বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সামাজিক সংগঠনের পরিপক্ব এবং একটি চূড়ান্ত স্তর। মানব সংগঠনের একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি (Functions of state)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

ক) অত্যাবশ্যকীয় কাজ (Essential functions) এবং

খ) ঐচ্ছিক কাজ (Optional functions)।

ক) রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজ: যেসব কাজ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য খুবই জরুরি সেগুলো হলো রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজ। রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

০১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান: রাষ্ট্রের প্রথম কাজ হলো বহিঃশক্তির আক্রমণ কিংবা অহেতুক হস্তক্ষেপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। প্রয়োজনে যুদ্ধ বা সন্ধির পথ বেছে নেওয়া। সামরিক শক্তির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

০২) নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান: রাষ্ট্রের কাজ হলো নাগরিকের আইনগত অধিকার ও কর্তব্য সুনিশ্চিত করা। কর প্রদান, রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলতে নাগরিকদের বাধ্য করার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই পালন করতে হয়। রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি নাগরিকদের অনুগত রাখার ব্যবস্থা নেওয়া রাষ্ট্রের অন্যতম জরুরি কাজ।

০৩) জনগণের অধিকার রক্ষা: সব নাগরিকের জন্য সমান অধিকার এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা যেন অন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী শোষিত, বঞ্চিত বা অত্যাচারিত না হয় সে দিকে লক্ষ রাখা রাষ্ট্রের জরুরি কাজের অংশ। জনগণের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার দায়িত্বও রাষ্ট্রের।

খ) রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজ: বর্তমানে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজগুলো এতই গুরুত্ব পাচ্ছে যে, রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজ ও ঐচ্ছিক কাজের মাঝে ভেদরেখা টানা খুবই কষ্টকর। রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজকে অসমাজতান্ত্রিক (non-socialistic) এবং সমাজতান্ত্রিক (socialistic) নামে বিভক্ত করা হয়। অসমাজতান্ত্রিক কাজগুলো রাষ্ট্রের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়, কিন্তু খুবই স্বাভাবিক। যেমন: দরিদ্র এবং অক্ষমদের যত্ন নেওয়া, জনহিতকর কাজ, সেনিটেশন, প্রাথমিক শিক্ষা, পরিসংখ্যান গ্রহণ ও গবেষণা-কর্ম সম্পাদন, ডাক বিভাগীয় কাজ, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, খাল খনন ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধাদি প্রদান ইত্যাদি অসমাজতান্ত্রিক কাজ বলে বিবেচিত।

রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক কাজগুলোর মধ্যে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, গ্যাস, পানি এবং বিদ্যুত প্রভৃতি সেবাধর্মী কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া থিয়েটার, বিশ্ববিদ্যালয়, যাদুঘর, চাকরি, পেনশন এবং অন্যান্য এমন সব কাজ যা সমাজ উন্নয়নমূলক এবং যা সমাজের সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের সুষম বন্টনের নিশ্চয়তা দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রের উপাদান এবং কার্যাবলির পৃথক দু'টি তালিকা প্রস্তুত করুন।**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র হচ্ছে জনগণকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার একটি শক্তিধর ও সার্বভৌম সংগঠন। জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক শৃঙ্খলাবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ। জনগণ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রধান চারটি উপাদান। অত্যাবশ্যক ও ঐচ্ছিক কাজের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশপাশি জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'গঠনতন্ত্রের পটভূমিতে রাষ্ট্র, গঠনতন্ত্রে প্রতিফলিত রাষ্ট্র'– উক্তিটি কার?

(ক) Gillin and Gillin (খ) MacIver & Page

(গ) Prof. Garner (ঘ) T.B Bottomore

২। 'রাষ্ট্র হল তার কর্তৃত্বাধীন জনগণের সকল গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক তত্ত্বাবধান ও চাপ প্রশমনের সংগঠন'- কে বলেছেন?

(ক) Aristotle (খ) Robert Berstedt

(গ) P. A. Sorokin (ঘ) T.B Bottomore

৩। রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি?

(ক) তিনটি (খ) চারটি

(গ) পাঁচটি (ঘ) ছয়টি

৪। রাষ্ট্রের প্রধান দু'টি কাজ কী কী?

(ক) সামারিক ও সামাজিক (খ) রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

(গ) অত্যাবশ্যকীয় এবং ঐচ্ছিক (ঘ) কল্যাণমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক

পাঠ-১০.১১ রাষ্ট্রের উৎপত্তি
Origin of State

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ আলোচনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐশ্বরিক এবং শক্তি প্রয়োগমূলক মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের বিকাশে ক্রিয়াশীল উপাদানসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নৃতাতত্ত্বিক মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ, ঐশ্বরিক মতবাদ, শক্তি প্রয়োগমূলক মতবাদ, সামাজিক চুক্তিমূলক মতবাদ, বিবর্তনবাদী মতবাদ ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

আধুনিক সভ্যতায় রাষ্ট্র শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু একটি সময় ছিল যখন রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বার্নস বলেছেন, মানব ইতিহাসের দশ ভাগের নয় ভাগ সময় কেটেছে রাষ্ট্রবিহীনভাবে। বস্তুত সমাজ বিবর্তনের এক সুসংগঠিত পর্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। যেমন:

ক) সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ (Sociological theory)
খ) ঐশ্বরিক মতবাদ (Divine theory)
গ) শক্তি প্রয়োগমূলক মতবাদ (Force theory)
ঘ) সামাজিক চুক্তিমূলক মতবাদ (Social contract theory) এবং
ঙ) বিবর্তনবাদী মতবাদ (Evolutionary theory)
চ) নৃতাত্ত্বিক মতবাদ (Antropological theory)

ক) সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ: সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের প্রবর্তকরা মনে করেন, বন্যদশায় মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে যূথবদ্ধ সমাজে বসবাস করত। তাদের মধ্যে নেতৃত্ব বা কর্তৃত্বের কোনো ধারণা ছিল না। বর্বর দশার এক পর্যায়ে মানুষ পরিবার গঠন করে। পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসরে সর্বপ্রথম স্থায়ী নেতৃত্বের সূচনা হয়। তাই ম্যাকাইভারসহ অনেকে পরিবার থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। বস্তুত অস্থায়ী, অসংগঠিত একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় স্থায়ী, সুসংগঠিত এবং কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রমবিভাজন, শ্রেণি, জটিল উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পত্তি, কর্তৃত্বমূলক শাসন ব্যবস্থাকে অপরিহার্য করে তোলে। ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। স্পেন্সার তাঁর '*Principles of Sociology*' গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। যেমন:

১। উপজাতীয় যুগ (Tribal period)**:** তখন জনসমষ্টি ছিল অসংগঠিত এবং কোনো সরকার ছিল না। এ স্তরে কেন্দ্রবিহীন (uncentralized) রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে ব্যান্ড (Band) ও উপজাতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব প্রচলিত ছিল।

২। সামরিক যুগ (Military period)**:** অভিযান ও বিজয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। পরিণতিতে শক্তিশালী সমরনায়ক ও উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাসীন রাজাদের প্রতি আনুগত্যতা পরিলক্ষিত হয়।

৩। শিল্পযুগ (Industrial period)**:** সমরবাদকে অপসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তোলে।

খ) ঐশ্বরিক মতবাদ: এ মতবাদে রাষ্ট্রকে ঈশ্বর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচনা করা হয়। ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃষ্টি করে তা পরিচালনার জন্য নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। এ মতবাদে বিশ্বাস করা হয়, রাষ্ট্রের পরিচালক বা রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সুতরাং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারী জনগণকে রাজার নির্দেশ মেনে চলতে হবে

এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকতে হবে। রাজার অবাধ্য হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া। এ মতবাদে রাজা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি- জনগণের প্রতিনিধি নন।

গ) শক্তি প্রয়োগমূলক মতবাদঃ এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তির পিছনে শক্তির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রভুত্বের মাধ্যমে সমাজ তথা রাষ্ট্র পরিচালনার ইচ্ছা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরই অংশ। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রবিহীন আদিম সমাজে শক্তি প্রয়োগের কয়েকটি নমুনা হচ্ছেঃ

ক) সবল কর্তৃক দুর্বলের উপর অত্যাচার এবং দুর্বলকে পরাভূত করে অনুগত রাখার প্রয়াস;
খ) গোত্র-প্রধান কর্তৃক নিজ বংশের সকলকে শাসনে রাখার প্রবণতা;
গ) গোত্রপতির নেতৃত্বে এক গোত্র কর্তৃক অন্য গোত্রের উপর প্রভুত্ব কায়েম;
ঘ) আন্তঃউপজাতি যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিজিতের উপর বিজয়ীর আধিপত্য।

এ মতবাদের সারকথা হচ্ছে রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে রয়েছে 'শক্তি'। বল প্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে।

ঘ) সামাজিক চুক্তিমূলক মতবাদঃ সামাজিক চুক্তিমূলক মতবাদের কয়েকজন সমাজচিন্তাবিদ হচ্ছেন হব্‌স, লক এবং রুশো (Hobbes, Locke and Rousseau)। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের চুক্তির মাধ্যমে। তারা মনে করেন, আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে (state of nature) বাস করতো এবং প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হতো। পরে বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকৃতির রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। রুশোর সামাজিক চুক্তির রূপরেখা হচ্ছে, "আমরা সবাই আমাদের সমগ্র ক্ষমতা একত্রিত করে 'সাধারণ ইচ্ছা'র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধীনে রাখতে অঙ্গীকার করি।" এভাবে তারা সাধারণ ইচ্ছার (General will) অধীনে রাষ্ট্র গঠন করে।

ঙ) বিবর্তনবাদী মতবাদঃ এই তত্ত্বের মূলকথা হলো রাষ্ট্র আকস্মিকভাবে উৎপত্তি লাভ করেনি। বরং সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় বিভিন্ন উপাদানের ক্রিয়াশীল ভূমিকার ফলে মানব সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্ক, ধর্ম, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদি রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে মাতৃপ্রধান পরিবারই আদি পরিবার। পশুপালন সমাজের আবির্ভাবের সাথে পিতৃপ্রধান পরিবারের সূত্রপাত ঘটে। এ সময় সমাজের বয়স্ক পুরুষের হাতে নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। পরিবারে পিতার কর্তৃত্ব ছিল নিরংকুশ। বস্তুত, নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক চেতনা পিতৃপ্রধান পরিবারেই প্রথম লক্ষ করা যায়। জ্ঞাতিসম্পর্ক রাজনৈতিক জীবনের সংহতি বিধানে সহায়ক ছিল। কৌম বা গোষ্ঠী প্রধান গোলযোগ মিটাতে পরিবার প্রধানের ভূমিকাই পালন করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি পরিবার ও কৌম প্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (MacIver) মনে করেন, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি করেছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন গোত্রের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল। গোত্রপতি নিজেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। গোত্রপতির আদেশ-নির্দেশ অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করা। নেতৃত্বের প্রতি এরূপ আনুগত্য রাষ্ট্র সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যুদ্ধ-সংঘাত ইত্যাদি রাষ্ট্র গঠনে বিশেষ অবদান রেখেছে।

চ) নৃতাত্ত্বিক মতবাদঃ নৃবিজ্ঞানীদের মতে, রাজনৈতিক চেতনা ও নেতৃত্বের ধারণা থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে। আদিম যূথবদ্ধ (Horde society) সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে নেতৃত্বের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু যূথ জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে একসময় প্রয়োজনের তাগিদেই দলপতি বা নেতার আবির্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক চেতনা। রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে দলপতি ও রাজনৈতিক চেতনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানী লুইস হেনরি মর্গান, লোঈ, ফ্রীড প্রমুখ নিজ নিজ ধারণা ব্যক্ত করেছেন। মর্গানের মতে, জৈবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক সংগঠনগুলোতে পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। লোঈ মনে করেন, সামান্য হলেও আদিম সমাজে রাজনৈতিক চেতনা বিদ্যমান ছিল। ফ্রীডের মতে, সামাজিক সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধার অসম অধিকার (unequal access) হচ্ছে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বশর্ত। সম্পদ এবং সুযোগ-সুবিধায় যাদের বেশি মাত্রায় অধিকার রয়েছে তাদেরকে সে অধিকার রক্ষা করতে হয়। আর এটা করতে হলে তাদের রাষ্ট্রশক্তি বা ক্ষমতার ব্যবহার জরুরি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক কিংবা বিবর্তনবাদী মতবাদ বর্ণনা করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আধুনিক সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন হচ্ছে রাষ্ট্র। তবে আদিম সমাজের রাষ্ট্র আর আজকের রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নয়। এমনকি আদিম সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পর্কেও বিতর্ক রয়েছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কেও মনীষীদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিকাংশ মনীষী মনে করেন, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র সুসংগঠিত রূপ লাভ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'মানব ইতিহাসের দশ ভাগের নয় ভাগ সময় কেটেছে রাষ্ট্রবিহীনভাবে'– উক্তিটি কার?

(ক) বার্নস- এর (খ) বটোমোর- এর

(গ) গার্নার- এর (ঘ) জিনসবার্গ- এর

২। 'পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি করেছে'- কে বলেছেন?

(ক) Aristotle (খ) Robert Berstedt

(গ) MacIver (ঘ) T.B Bottomore

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে স্পেন্সার কয়টি স্তরের কথা বলেছেন?

(ক) তিনটি (খ) চারটি

(গ) পাঁচটি (ঘ) ছয়টি

৪। রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে রুশোর সামাজিক চুক্তির মূল ভিত্তি কী?

(ক) সমঝোতা (খ) শক্তি প্রয়োগ

(গ) নেতৃত্ব (ঘ) সাধারণ ইচ্ছা

পাঠ-১০.১২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব
Power and Authority

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ক্ষমতা বলতে কী বুঝায় তা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- কর্তত্বের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষমতা, কর্তৃত্ব।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

রাজনৈতিক সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল পরিচালনায় কর্তৃত্ব অপরিহার্য। আবার সামাজিক কাঠামোয় 'ক্ষমতা'র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ক্ষমতা কার হাতে কেন্দ্রীভূত, ক্ষমতার উপাদান, সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাসে ক্ষমতার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার গুরুত্ব অনেকখানি।

ক্ষমতা কী (What is power)

সাধারণ অর্থে ক্ষমতা হচ্ছে একটি শক্তি (Force)। এর মাধ্যমে অন্যের ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত ও মতামতকে প্রভাবিত করে নিজের মতামত, সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছাকে অপরের উপর চাপিয়ে দেয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কোহেন (Cohen) বলেছেন, "অপরের আচরণকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য অথবা অপরের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার প্রভাব অর্জনই ক্ষমতা (Power)।"

কার্ল মার্কস (Karl Marx) ক্ষমতাকে শ্রেণিস্বার্থের ফল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ম্যাক্স ওয়েবারের (Max Weber) মতে, ক্ষমতা হচ্ছে প্রভাব, কর্তৃত্ব ও আইনের সম্মিলিত শক্তি। ওয়েবার প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে অর্থের ক্ষমতাকে (Money power) সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সামাজিক স্তরবিন্যাসের তৃতীয় মাত্রা হিসেবে ওয়েবার রাজনৈতিক দলের (Party) উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক দল ক্ষমতার (Power) সাথে যুক্ত।

মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট ডাল (Robert Dahl) সামাজিক স্তরবিন্যাস ও শ্রেণিবিন্যাসে ক্ষমতাকে (Power) সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মিলস্ (C. Wright Mills) তাঁর *'The Power Elite'* গ্রন্থে ক্ষমতাকে সামাজিক সম্পর্কের প্রধান প্রত্যয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষমতা অর্থনৈতিক অবস্থান থেকেই উৎপন্ন হয়।

পোলান্টজা (Poulantza)-এর মতে, ক্ষমতার ধারণা সামাজিক সম্পর্কের সেই যথাযথ ধরনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা শ্রেণিসংগ্রাম দ্বারা বিশিষ্টতা অর্জন করে। বস্তুত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, শ্রেণি বিভাজন ছাড়াও প্রশাসন, বিচার প্রক্রিয়া, উৎপাদন যন্ত্র ইত্যাদির উপর প্রভাব বিস্তার করার সামর্থ্যই ক্ষমতার মূল কথা। সমাজের সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতা বিরাজমান। রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান, পরিবার, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, ক্লাব, সংঘ, সর্বত্রই প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়, যিনি অন্যদের প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করেন।

ক্ষমতা হচ্ছে সমাজের মৌলসত্তা (A fundamental entity of society)। ক্ষমতার মূলে শিক্ষা, দক্ষতা, অর্থ-বিত্ত, ভূমি, প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ, জনপ্রতিনিধিত্ব, শহরের সাথে যোগাযোগ, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, বংশমর্যাদা, আভিজাত্য, সামাজিক মর্যাদা, দৈহিক শক্তি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণিবিন্যাস, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে।

কর্তৃত্ব (Authority)

'কর্তৃত্ব' শব্দটি 'ক্ষমতার' (Power) সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। ক্ষমতা থেকেই কর্তৃত্বের উদ্ভব হয়। কোনো নেতা বা নেতৃত্ব (Leadership) যখন তার ক্ষমতা বলে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন তাকে কর্তৃত্ব বলে। কর্তৃত্বের সাথে ক্ষমতার

পাশাপাশি 'নেতৃত্ব' এবং 'প্রভাব' প্রত্যয় দু'টিও বিশেষভাবে যুক্ত। সুতরাং কর্তৃত্ব হল ক্ষমতা, প্রভাব ও নেতৃত্বের সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ।

কর্তৃত্বের সংজ্ঞায় G. D. Mitchell তাঁর *'A Dictionary of Sociology'* (P. 14) গ্রন্থে বলেছেন, "Authority is that form of power which orders or articulates the actions or other actors through commands which are effective because those who are commanded regard the commands as legitimate." অর্থাৎ কর্তৃত্ব হচ্ছে ক্ষমতার একটি বিশেষ রূপ, যা আদেশ এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। আইনগত বৈধতার জন্য জনগণ এটি মেনে নিতে বাধ্য হয়। আইনগত বৈধতা ছাড়া কর্তৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা নেই।

কর্তৃত্ব যখন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পরিচালিত হয় তখন তাকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলে। অর্থাৎ কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দল যখন জনগণের উপর প্রভাব খাটানোর আইনগত স্বীকৃতি ও অধিকার পায় তখন তাকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলে। মোঃ মকসুদুর রহমান (সম্পা:) এর *'রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানে'* (১৯৯১:১৭৯) বলা হয়েছে, "আইনগত ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা পেলে তাকে রাজনৈতিক পরিবৃত্তে কর্তৃত্ব বলে।"

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে বৈধতা, সম্মতি এবং স্বীকৃতি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অভ্যন্তরীণ স্বীকৃতি ও বৈধতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বৈধতা অপরিহার্য। অন্যথায় কর্তৃত্ব অর্থহীন ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে।

কর্তৃত্বের অবিচ্ছেদ্য উপাদান ক্ষমতা (Power)। সমাজের সর্বস্তরে ক্ষমতার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এতে বল প্রয়োগ (Force) এবং সামাজিক শৃঙ্খলার (Social order) বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ক্ষমতাসম্পন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থাকে কর্তৃত্ব বলে। সুস্থ, সুশৃঙ্খল সমাজজীবন বজায় রাখার জন্য কর্তৃত্ব অপরিহার্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'সরকার'কে কর্তৃত্ব বলা হয়। আবার সামাজিক সংঘ, সমিতির কর্মকর্তাদেরকে সামাজিক কর্তৃত্বের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সংজ্ঞায়িত করুন।	**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। কেবল রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল পরিচালনায় নয়, সামাজিক কাঠামোয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ক্ষমতা হচ্ছে একটি শক্তি, যার মাধ্যমে অন্যের ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত ও মতামতকে প্রভাবিত করে নিজের মতামত, সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছাকে অপরের উপর চাপিয়ে দেয়া যায়। কর্তৃত্ব প্রত্যয়টি ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। ক্ষমতা থেকেই কর্তৃত্বের উদ্ভব হয়। কোনো নেতা বা নেতৃত্ব যখন তার ক্ষমতা বলে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন তাকে কর্তৃত্ব বলে। কর্তৃত্বের মাধ্যমে নিজ দল, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষের উপর ক্ষমতা আরোপ ও প্রভাব বিস্তার করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "অপরের আচরণ বা কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার সামর্থ্যই ক্ষমতা"– কার উক্তি?

(ক) T.B Bottomore (খ) Cohen

(গ) Prof. Garner (ঘ) Gillin and Gillin

২। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে—

(ক) দলের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রভাব (খ) জনগণের উপর ক্ষমতা ও প্রভাব

(গ) 'ক' ও 'খ' উভয়। (ঘ) বিশাল রাজনৈতিক দল

পাঠ-১০.১৩ কর্তৃত্বের ধরন, উপাদান ও প্রভাব
Types, Element and Impact of Authority

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কর্তৃত্বের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- কর্তৃত্বের উপাদানসমূহ লিখতে পারবেন; এবং
- সমাজজীবনে কর্তৃত্বের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব, সম্মোহনী কর্তৃত্ব, যৌক্তিক-আইনগত কর্তৃত্ব, কর্তৃত্বের প্রভাব।

কর্তৃত্বের ধরন (Types of authority)

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার তিন ধরনের কর্তৃত্বের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

১। প্রচলিত বা ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব;
২। সম্মোহনী বা আকর্ষণীয় কর্তৃত্ব এবং
৩। যৌক্তিক-আইনগত কর্তৃত্ব।

১। ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব (Traditional authority)**:** ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বের ভিত্তিমূল হচ্ছে অতীত এবং প্রচলিত প্রথা-ঐতিহ্য। এ কর্তৃত্বের অনুসারীরা প্রচলিত ধারণা, বিশ্বাস এবং নিয়মের কারণেই কর্তৃত্বকে মেনে নেয়। ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বের উদাহরণ হিসেবে ওয়েবার পিতৃতান্ত্রিকতার উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেনের 'রাজতন্ত্র' ঐতিহ্যগত নেতৃত্বের বড় উদাহরণ। ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে দেয়া হল:

১। পূর্ববর্তী দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান করা হয়;
২। মৌলিক পরিবর্তনে আগ্রহী নয়;
৩। অতীতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে;
৪। এর অনুসারীরা প্রথার (Custom) প্রতি বেশি অনুগত;
৫। ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব বংশপরম্পরায় চলে আসে।

২। সম্মোহনী কর্তৃত্ব (Charismatic authority)**:** গ্রিক শব্দ 'Charisma'-এর অর্থ হচ্ছে 'Gift'। সাধারণত মনে করা হয় সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত কতকগুলো ব্যতিক্রমধর্মী গুণাবলির জন্য বিশেষ কোনো ব্যক্তি সম্মোহনী বা ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। সম্মোহনী কর্তৃত্বের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "Charismatic authority is based on some extraordinary quality of the leader or the leader's ideas."

সম্মোহনী বা ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্বে অনুসারীরা নেতার মধ্যে অতিপ্রাকৃত (Supernatural) গুণাবলি আছে এবং নেতাকে একজন অতিমানব (Superman) বলে মনে করে। এ ধরনের কর্তৃত্বে নেতার সম্মোহন শক্তি বিলুপ্ত হলে নেতৃত্বও বিলুপ্ত হতে পারে। আবার নেতার আদর্শ যুগ যুগ ধরে কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। সম্মোহনী কর্তৃত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

১। নেতার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলিই প্রধান;
২। কিছু অনুসারী থাকে, যারা অন্ধভাবে নেতার কর্তৃত্ব মেনে নেয়;
৩। অনেক ক্ষেত্রে এর আইনগত বৈধ্যতা থাকে না এবং এ কর্তৃত্ব যৌক্তিক না ও হতে পারে;
৪। নেতার অনুপস্থিতিতে তার আদর্শ কর্তৃত্বারোপ করতে পারে;
৫। নেতা বা তার আদর্শের সম্মোহনী প্রভাবের স্থায়িত্ব কর্তৃত্বের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

৩। যৌক্তিক-আইনগত কর্তৃত্ব (Rational-legal authority)**:** নিয়মকানুনের ভিত্তিতে সৃষ্ট সংগঠনে যে কর্তৃত্ব বিদ্যমান তাকে

যৌক্তিক-আইনগত কর্তৃত্ব বলে। আইন এবং কাঠামোগত আদর্শের বলে কর্তৃত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি বা সংগঠনের কর্তৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ওয়েবারের মতে, শুধু যৌক্তিক ও আইনগত কর্তৃত্বেরই আইনগত ভিত্তি এবং যৌক্তিকতা রয়েছে। যৌক্তিক আইনগত কর্তৃত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হল:

১। সময়ের বাধ্যবাধকতা থাকে। ক্ষমতা/প্রশাসনে কে কত দিন কী দায়িত্ব পালন করবেন তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।
২। কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক পদগুলো উচ্চক্রম-নিম্নক্রম অনুসারে বিন্যস্ত থাকে।
৩। যোগ্যতা এবং কাজকেই (পেশা) জীবিকা বলে গণ্য করা হয় এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।
৪। সবকিছু আনুষ্ঠানিক (Formal) হয়। ইচ্ছামত নিয়োগ-বরখাস্ত করা সম্ভব নয়।
৫। আইন এবং যুক্তি হচ্ছে এর মূলভিত্তি।
৬। নিয়োগের জন্য যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

কর্তৃত্বের উপাদান (Element of authority)

যেকোনো কর্তৃত্বের মূলে কোনো না কোনো উপাদান কাজ করে। সময় ও অঞ্চলভেদে এসব উপাদানে পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন গ্রামীণ সমাজে কর্তৃত্ব অর্জন বা আরোপে একসময় বংশ, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ভূসম্পত্তির একচ্ছত্র প্রভাব ছিল। কিন্তু এখন সেখানে শিক্ষা, নগদ অর্থ, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংশ্লিষ্টতার প্রভাব বেশি। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কর্তৃত্বের উপাদানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হচ্ছে:

ক) সনাতন উপাদান: সনাতন উপাদানগুলো মূলত ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক সমাজে যুগযুগ ধরে কর্তৃত্ব নির্ধারণে ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে বংশ মর্যাদা, বৃহৎ জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, কৃষি জমির মালিকানা কর্তৃত্ব সৃষ্টির সনাতন উপাদান হিসেবে বিবেচিত। আগে গ্রামীণ সমাজে মোড়ল-মাতুব্বর ও ধর্মীয় নেতাদের বিশেষ কর্তৃত্ব ছিল। এখন জনপ্রতিনিধি কিংবা প্রশাসনের প্রভাব বেশি। শিক্ষার বিস্তার, সচেতনতা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, নগরায়ন, শিল্পায়ন, প্রযুক্তির বিকাশ ইত্যাদি কর্তৃত্বের সনাতন উপাদানকে ক্রমশ দুর্বল করে দিয়েছে।

খ) আধুনিক উপাদান: কর্তৃত্ব নির্ধারণে উদ্ভব হয়েছে নতুন নতুন এবং আধুনিক উপাদানের। এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা, কৃষি বহির্ভূত পেশা, নগদ অর্থের মালিকানা; সরকার, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা; জনপ্রতিনিধিত্ব, বীজ-সার-কীটনাশকের ডিলারশিপ, সেচযন্ত্রের মালিকানা, কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর দক্ষতা ইত্যাদি কর্তৃত্বের আধুনিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

সমাজজীবনে কর্তৃত্বের প্রভাব (Impact of authority on society)

কর্তৃত্ব একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। সব সমাজেই কর্তৃত্ব আছে এবং সমাজের উপর কর্তৃত্বের প্রভাবও রয়েছে। নিচে কর্তৃত্বের প্রভাবসমূহ আলোচিত হল:

১। সামাজিক শৃঙ্খলা (Social order)**:** সামাজিক শৃঙ্খলার মূলে রয়েছে কর্তৃত্ব। মানুষের উপর কর্তৃত্বারোপ না করলে সমাজে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে, শান্তি বিনষ্ট হবে এবং প্রগতি ব্যাহত হবে।

২। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social control)**:** সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার মূলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা সর্বাধিক। কর্তৃত্ব সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। সমাজে কর্তৃত্ব আছে বলেই মানুষ যাচ্ছেতাই আচরণ প্রদর্শন করতে পারে না।

৩। সামাজিক স্থিতিশীলতা (Social stability)**:** সভ্য সমাজে স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ন রাখতে কর্তৃত্বের বিকল্প নেই। সমাজ থেকে কর্তৃত্ব তুলে নিলে সাথে সাথে সমাজে সংঘাত, সংঘর্ষ শুরু হবে।

৪। সামাজিক সংহতি (Social solidarity)**:** মূলত কর্তৃত্ব হচ্ছে একটি ব্যবস্থাপনা। রাষ্ট্র, সরকার, আইন ইত্যাদি উপাদানের সমন্বিত রূপ হচ্ছে কর্তৃত্ব। কর্তৃত্ব এবং এর উপাদানসমূহের প্রভাবে মানুষ সংহতি বোধ করে, ঐক্যবদ্ধ হয়।

৫। সংস্কৃতি, প্রথা ও ঐতিহ্যের বাহক (Agent of culture and heritage)**:** শুধু ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব নয়, যেকোনো কর্তৃত্বই নিজেদের সংস্কৃতি, প্রথা এবং ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। কর্তৃত্বের সেবা ও সদিচ্ছায় সংস্কৃতি, প্রথা যুগের পর যুগ টিকে থাকে, ক্রমোন্নতি লাভ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কর্তৃত্বের ধরনগুলো এবং সমাজজীবনে কর্তৃত্বের প্রভাব পৃথক দু'টি ছকে লিপিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে কর্তৃত্ব। কর্তৃত্বকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা: ক) ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব, খ) সম্মোহনী কর্তৃত্ব এবং গ) আইনগত-যৌক্তিক কর্তৃত্ব। আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বে আইনগত-যৌক্তিক কর্তৃত্বের চর্চাই বেশি পরিলক্ষিত হয়। কর্তৃত্ব নির্ধারণ ও চর্চায় সনাতন এবং আধুনিক দু'ধরনের উপাদানই ভূমিকা রাখে। তবে সনাত উপাদানের পরিবর্তে আধুনিক উপাদান ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছে। সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রেও কর্তৃত্ব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ম্যাক্স ওয়েবার কয় ধরনের কর্তৃত্বের উল্লেখ করেছেন?
(ক) দুই ধরনের (খ) তিন ধরনের
(গ) চার ধরনের (ঘ) পাঁচ ধরনের

২। ব্রিটেনের রাজতন্ত্র কী ধরনের কর্তৃত্ব?
(ক) সনাতন (খ) সম্মোহনী
(গ) যৌক্তিক ও আইনগত (ঘ) কোনোটি নয়

৩। কর্তৃত্বের একটি সনাতন উপাদান হচ্ছে:
(ক) শিক্ষা (খ) ভূসম্পত্তি
(গ) রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা (ঘ) বংশ মর্যাদা

ইউনিট-১০ এর উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১	ঃ	১। ক	২। ঘ	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২	ঃ	১। খ	২। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩	ঃ	১। খ	২। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪	ঃ	১। গ	২। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫	ঃ	১। খ	২। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬	ঃ	১। গ	২। ঘ	৩। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭	ঃ	১। ক	২। খ	৩। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮	ঃ	১। গ	২। খ	৩। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯	ঃ	১। খ	২। ক	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১০	ঃ	১। ক	২। গ	৩। খ	৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১১	ঃ	১। ক	২। গ)	৩। ক	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১২	ঃ	১। খ	২। গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৩	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ	
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ঘ	৪। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. আকারগত দিক থেকে সম্পত্তি কয় প্রকার?

ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার

গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

২. ধর্মের উৎপত্তিতে মহাপ্রাণবাদের প্রবক্তা কে?

ক. ই.বি টেইলর খ. মর্গান

গ. ম্যারেট ঘ. টি.বি বটোমোর

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩. সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য-

i. দলিলস্বত্ব
ii. চুক্তি
iii. সম্পত্তির অধিকার
সঠিক উত্তর কোনটি?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে স্পেন্সার উল্লেখিত স্তর কোনটি?

i. উপজাতীয় যুগ
ii. সামরিক যুগ
iii. আধুনিক যুগ
সঠিক উত্তর কোনটি?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:

সোমা এবং লোপা একই ক্লাশে পড়ে। ক্লাশের ফাঁকে তারা একদিন তর্কে জড়িয়ে পড়ে। সোমা বলছে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, আত্মরক্ষা ইত্যাদি রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে ভূমিকা রেখেছে। তবে রাষ্ট্র গঠনে সামাজিক চুক্তিরও প্রভাব থাকতে পারে। লোপা সোমার কথায় দ্বিমত পোষণ করে। সে বলে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে বিবর্তন প্রক্রিয়ায়। এখানে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদেরও সত্যতা রয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠন থেকে নেতৃত্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে।

(ক) সোমা এবং লোপা কী বিষয়ে তর্ক করছিল? ১

(খ) উদ্দীপকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত কোন কোন মতবাদের উল্লেখ করা হয়েছে? ২

(গ) সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল বক্তব্য লিখুন? ৩

(ঘ) রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে আপনি কোন মতবাদকে যথার্থ বলে মনে করেন? কেন?। ৪

বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ
Deviant behaviour and crime

ইউনিট ১১

মানুষ সাধারণত সামাজিক অনুশাসন মেনে চললেও মাঝেমধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের জন্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। প্রতিটি সমাজই নির্দিষ্ট একটি সামাজিক শৃঙ্খলা (Social order), রীতিনীতি, আচরণবিধি (Norms) এবং মূল্যবোধ (Values) অনুসরণ করে। কিন্তু সমাজের সব সদস্যই এটি মেনে চলতে পারে না। মাঝে মধ্যে তারা সামাজিকভাবে অপ্রত্যাশিত আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। সাধারণভাবে সমাজের বিধি লঙ্ঘন করে সামাজিক রীতিনীতি বহির্ভূত আচরণকে বিচ্যুত আচরণ বলা হয়। প্রতিটি সমাজেই কমবেশি বিচ্যুত আচরণ হয়ে থাকে। এটি সমাজ কাঠামোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তি সমাজ স্বীকৃত আচরণ না করে গর্হিত আচরণ করে। ফলে সামাজিক সংহতি বিনষ্ট এবং সমাজে বসবাসকারী মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। এ জন্যই সামাজিক রীতিনীতি পরিপন্থী আচরণকে বিচ্যুত আচরণ বলে। যেমন: বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সেবা-যত্ন করা, বড়দের সম্মান করা, মদ্যপান না করা ইত্যাদি আমাদের সামাজিক রীতি ও মূল্যবোধ। এগুলো পালন না করা বিচ্যুত আচরণ। সাধারণত বিচ্যুত আচরণ থেকেই অপরাধের সূচনা হয়। আজ যে কিশোর বিচ্যুত আচরণ করছে, কাল সে অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১১.১: বিচ্যুতিমূলক আচরণ
পাঠ ১১.২: বিচ্যুতিমূলক আচরণ সম্পর্কিত তত্ত্ব
পাঠ ১১.৩: অপরাধ
পাঠ ১১.৪: অপরাধের কারণ ও প্রতিকার
পাঠ ১১.৫: বিচ্যুতি ও অপরাধ: বর্তমান বাংলাদেশ

পাঠ-১১.১ বিচ্যুতিমূলক আচরণ
Deviant behaviour

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিচ্যুতিমূলক আচরণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- বিচ্যুতিমূলক আচরণের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন;
- বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধরনসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিচ্যুতিমূলক আচরণ।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

বিচ্যুত আচরণ সমাজ ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিটি সমাজে কোনো না কোনো ধরনের বিচ্যুত আচরণ লক্ষ করা যায়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে মানসিক, শারীরিক ও বুদ্ধিগত পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ সাধারণত সামাজিক অনুশাসন মেনে চলে। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থে কিংবা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে মানুষ অনেক সময় অপ্রত্যাশিত বা অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এভাবেই সৃষ্টি হয় বিচ্যুত আচরণ। বিচ্যুত আচরণের জন্য আইনত শাস্তি বিধানের সুযোগ নেই। তবে অনেক সময় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিচ্যুত আচরণই একসময় ব্যক্তিকে বিপথগামী করে তোলে এবং সে অপরাধে লিপ্ত হয়।

বিচ্যুত আচরণের সংজ্ঞা (Definition of Deviant Behaviour)

সাধারণ অর্থে মানুষের যেসব আচরণ সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী, সমাজে অসংগতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাকে বিচ্যুত আচরণ বলে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিচ্যুত আচরণকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন সমাজবিজ্ঞানী J. D. Ross (1972 : 298) বলেছেন, বিচ্যুত আচরণ হচ্ছে ঐ সব আচরণ যেগুলো সামাজিক প্রত্যাশাকে নিশ্চিত করতে পারে না। (Deviant behaviour is that behaviour which does not confirm to social expectation).

B. Bhushan তাঁর '*Dictionary of Sociology* (1989 : 72) গ্রন্থে বলেছেন, বিচ্যুতি প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় এমন আচরণ বুঝাতে যা বিধিনিষেধ বা অন্যের প্রত্যাশাকে লঙ্ঘন করে। এটি অননুমোদিত এবং শাস্তি বিধানের ব্যাপারে আগ্রহী। (The term 'deviance' is used to refer to behaviour which infringe rules or the expectations of others and which attracts disapproval or punishment).

David Dressler এর মতে, বিচ্যুত আচরণকে বুঝতে হলে সামাজিক আদর্শের (Social norms) পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। সামাজিক আদর্শ থেকে নেতিবাচক ও ভিন্নতর আচরণই বিচ্যুত আচরণ। Dressler (1969 : 240)-এর ভাষায়, "Deviant behaviour is the behaviour that deviates..... . Deviant behaviour that varies significantly in direction or degree from the social norm of that behaviour."

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, কোনো ব্যক্তি যখন সামাজিক রীতি-নীতি, আইন-কানুন ও আদর্শানুসারে কাজ করে না, তখন সে ব্যক্তিকে 'বিচ্যুত ব্যক্তি'। সামাজিক রীতি-নীতি বিবেচনায় ঐ বিচ্যুত ব্যক্তির কার্যকলাপ ও আচরণ, অপ্রত্যাশিত ও নৈতিক আদর্শ পরিপন্থী। মাদকাসক্তি, নারীর প্রতি বিরূপ মনোভাব, সমকামিতা, গর্ভপাত, আত্মহত্যা, দুর্নীতি, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি বিচ্যুত আচরণ হিসেবে পরিগণিত।

বিচ্যুত আচরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Deviant Behaviour)

বিচ্যুত আচরণের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:

১। বিচ্যুত আচরণ আচরণবিধি ও মূল্যবোধ পরিপন্থী;
২। বিচ্যুত আচরণ সামাজিকভাবে নিন্দনীয় হলেও আইনগতভাবে দণ্ডনীয় নয়;
৩। আচরণের অস্বাভাবিক রূপ হচ্ছে বিচ্যুত আচরণ;
৪। এটি সমাজের অপ্রত্যাশিত এবং অবাঞ্ছিত;
৫। বিচ্যুত আচরণ ব্যক্তিগত, আদর্শগত এবং সামাজিকভাবে ক্ষতিকর;
৬। বিচ্যুত আচরণ সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে;
৭। বিচ্যুত আচরণ আপেক্ষিক। সময় ও সমাজভেদে এর মাত্রাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
৮। বিচ্যুত আচরণ সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া এবং সামাজিকীকরণের ফল। এটি সামাজিক প্রপঞ্চও বটে। সমাজের বাইরে কোনো বিচ্যুতি নেই।
৯। বিচ্যুত আচরণ সামাজিক কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– শিল্প সমাজে জ্ঞাতিত্ব বা প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক খুব কমই বিকশিত হয়। কিন্তু গ্রামীণ সমাজে কেউ বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে চাইলে তা বিচ্যুত আচরণ বলে গণ্য করা হয়।
১০। বিচ্যুত আচরণ কখনো কখনো সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। চিরায়ত নিয়ম-কানুন ও সামাজিক বিধিনিষেধের বাইরে গিয়ে ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় যেসব বিচ্যুত আচরণ করেছিলেন তা স্বাধীনতা ও সামাজিক সংস্কারকে ত্বরান্বিত করেছিল।

বিচ্যুত আচরণের ধরনসমূহ (Types of Deviant Behaviour)

সমাজে নানা ধরনের বিচ্যুত আচরণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন Edwin Limert তাঁর '*Social Pathology*' গ্রন্থে দু'ধরনের বিচ্যুত আচরণের উল্লেখ করেছেন। যথা:

ক) মুখ্য বিচ্যুত আচরণ (Primary deviance) এবং
খ) গৌণ বিচ্যুত আচরণ (Secondary deviance)।

মৌলিক মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণ প্রদর্শন করলে তা মুখ্য বিচ্যুত আচরণ। যেমন: সংক্ষিপ্ত কাপড়ে মেয়েদের বাইরে চলাফেরা, শ্রেণিকক্ষের মধ্যে ধূমপান করা ইত্যাদি। অন্যদিকে পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণ হচ্ছে গৌণ বিচ্যুতি। যেমন: বড়দের সালাম না দেয়া, জেব্রা ক্রসিং কিংবা ফুটওভারব্রিজ দিয়ে রাস্তা পারাপার না হওয়া, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

বিচ্যুত আচরণের আরো কয়েকটি ধরন সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল :

১। আচরণের বিচ্যুতি (Deviance of behaviour) **:** বিচ্যুতির ধরনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আচরণগত বিচ্যুতি। এ ধরনের বিচ্যুতির ফলেই সমাজের অধিকাংশ অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। জুয়াখেলা, সমকামিতা, পরকীয়া প্রেম, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি আচরণের বিচ্যুতি।

২। অভ্যাসের বিচ্যুতি (Habitual deviance) **:** অভ্যাসগত বিপথগামিতা অনেক সময় সামাজিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাদকাসক্তি, জুয়াখেলা, নারীর প্রতি লোলুপ মনোভাব ব্যক্তিকে বেপরোয়া করে তুলতে পারে।

৩। মনস্তাত্ত্বিক বিচ্যুতি (Psychological deviance)**:** আচরণের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক বিচ্যুতির প্রকাশ ঘটে। অতিরিক্ত আবেগ মানুষকে উদাসীন, স্বার্থপর ও লোভী করে তোলে। ফলে সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

৪। সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি (Cultural deviance) **:** সাংস্কৃতিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের এ ধরনের বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্যুত মানুষের কর্মকাণ্ড সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুতরাং সাংস্কৃতিক বিচ্যুতিও অনেক বিচ্যুত আচরণের বহিঃপ্রকাশ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিচ্যুতিমূলক আচরণের ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিচ্যুতিমূলক আচরণ যেকোনো সমাজের জন্যই নানামুখী সমস্যার কারণ। বিভিন্নভাবে ব্যক্তির মধ্যে বিচ্যুত আচরণ দেখা দিতে পারে। বিচ্যুত আচরণ সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজের কাম্য নয়। মাত্রাতিরিক্ত বিচ্যুত আচরণের ফলে সমাজের পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ যেমন নিশ্চিত হয় না, তেমনি উন্নত, সুষ্ঠু, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থাও বাধাগ্রস্থ হয়। এজন্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সমাজবিরোধী, সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'সামাজিক আদর্শ থেকে নেতিবাচক ও ভিন্নতর আচরণই বিচ্যুত আচরণ' কে বলেছেন?

(ক) J. D. Ross (খ) Edwin Limert

(গ) David Dressler (ঘ) David Repenoe

২। Edwin Limert কয় ধরনের বিচ্যুত আচরণের কথা বলেছেন?

(ক) দুই ধরনের (খ) তিন ধরনের

(গ) চার ধরনের (ঘ) পাঁচ ধরনের

পাঠ-১১.২ বিচ্যুতিমূলক আচরণ সম্পর্কিত তত্ত্ব
Theories on Deviant behaviour

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিচ্যুতিমূলক আচরণের বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যাখা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিচ্যুতিমূলক আচরণের তত্ত্ব, পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা তত্ত্ব ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

ব্যক্তির যেকোনো আচরণের জন্য সমাজই দায়ী। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজ মানুষকে 'সামাজিক' জীবে পরিণত করে। সবাই সমাজ প্রত্যাশিত আচরণ প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়। আবার অসামাজিক, বিপথগামী, অপরাধী, বিচ্যুত আচরণকারীও সমাজের সৃষ্টি। কেননা প্রচলিত সামাজিক বিধিবিধানের পরিপন্থী আচরণ সমাজ থেকেই অর্জিত হয়। অর্থাৎ সমাজের বাইরে থেকে যেমন সামাজিক হওয়া যায় না, তেমনি বিচ্যুত আচরণকারী বা অপরাধী হওয়াও সম্ভব নয়।

বিচ্যুতির তত্ত্ব (Theory of Deviance)

বিচ্যুত আচরণ সামাজিক পটভূমিতেই তৈরি। এ জন্যই বিচ্যুত আচরণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে। বিচ্যুতির প্রধান কয়েকটি তত্ত্ব হচ্ছে :

ক. পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা তত্ত্ব;
খ. মার্কসবাদী তত্ত্ব;
গ) এমিল ডুর্খিমের তত্ত্ব
ঘ) রবার্ট কে. মার্টনের তত্ত্ব

ক) পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা তত্ত্ব (Differential association theory)

প্রখ্যাত অপরাধবিজ্ঞানী সাদারল্যান্ড (Sutherland) বিচ্যুত আচরণ বা অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কে ১৯৩৯ সালে একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর এ ব্যাখাই অপরাধবিজ্ঞানে 'পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা' (Differential association) নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালে তিনি এ তত্ত্বে কিছু সংশোধনী আনেন। অনেকেই এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যাচাই-বাছাই, পর্যালোচনা ও সমালোচনা করে চলেছেন। Differential association-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'মিলনভেদ মতবাদ', 'বৈষম্যমূলক সহযোগিতা', 'বিভিন্নমুখী মেলামেশা' ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান গ্রন্থে Differential association-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা' ব্যবহার করা হয়েছে।

সাদারল্যান্ড তাঁর তত্ত্বের বক্তব্যগুলোকে কতিপয় বিবৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বিবৃতগুলো এমন সব সামাজিক প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে যেগুলোর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অপরাধমূলক আচরণে লিপ্ত হয়। যেমন:

১। বিচ্যুত আচরণ হচ্ছে সামাজিক শিক্ষার ফল বা অর্জিত আচরণ;
২। সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বিচ্যুত আচরণ আয়ত্ত হয়;
৩। মানুষ নিজ দল থেকেই বেশিরভাগ বিচ্যুত আচরণ শিক্ষা করে;
৪। বিচ্যুত আচরণের কৌশল রপ্ত করে;
৫। বিচ্যুত আচরণ প্রদর্শনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে;
৬। বিদ্যমান আইনের অপব্যাখ্যা বিচ্যুত আচরণকে উৎসাহিত করে;
৭। আইন অমান্য করার জন্য ব্যক্তিকে উৎসাহিত করা হয়;
৮। বিচ্যুতি শুধু অনুকরণ নয়, শিক্ষণের বিশেষ কৌশল হিসেবে চিহ্নিত;
৯। বিচ্যুতি হচ্ছে অপরাধমূলক আচরণ;

১০। ঘটমান সংখ্যা এবং এর হার (Frequency): ব্যক্তি বিচ্যুত আচরণকারী এবং সদাচরণকারীর সংস্পর্শে আসার মাত্রা বা হার (Frequency) কম বা বেশি হতে পারে। মেলামেশার হার কোন ধরনের ব্যক্তির সাথে কতটা তা তার আচরণের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। আবার উল্লিখিত দু'ধরনের ব্যক্তিবর্গের সাথে কোনো মানুষ কতটা সময়ব্যাপী (Duration) এবং কতখানি আন্তরিকতার (Intensity) সাথে মেলামেশা করে সেটিও তার আচরণের উপর গভীর রেখাপাত করে।

সমালোচনা (Criticisms): সাদারল্যান্ডের পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা তত্ত্বটির সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম হলেও এটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। অনেকের মতে তত্ত্বটির মূল বিবৃতি বা বক্তব্যসমূহ সুস্পষ্ট নয়। তিনি তাঁর প্রস্তাবনাগুলো এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করা হয় নি। ফলে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট হয়নি। সাদারল্যান্ড তাঁর তত্ত্বে বলেছেন, বিচ্যুত আচরণকারী মানুষের সাথে মেলামেশার ফলেই বিচ্যুত আচরণ বা অপরাধের শিক্ষা পায়। কিন্তু সমাজে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যে অপরাধীর সাথে মেলামেশা সত্ত্বেও অনেকে অপরাধী হয় না, আবার সদাচরণ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মেলামেশা সত্ত্বেও ব্যক্তি বিচ্যুত আচরণকারীতে পরিণত হয়।

খ) মার্কসীয় তত্ত্ব (Marxist Theory)

মার্কসবাদী তত্ত্বে বিচ্যুত আচরণকে মানুষের একটি অন্যতম স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ শ্রেণির তাত্ত্বিকদের মতে এটি ব্যক্তিগত বা সামাজিক ব্যাধির ফল নয়। মানুষের বিচিত্র চরিত্রের একটি বিশেষ বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে বিপথগমন (Deviance)। সামাজিক প্রয়োজনেই বিপথগমনকে অপরাধ (Crime) হিসেবে গণ্য করা হয়। Taylor, Walton এবং Young মনে করেন, বর্তমান সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর কাজই হচ্ছে বিচ্যুত আচরণকে অপরাধরূপে চিহ্নিত করা। তাঁদের মতে, এমন সমাজের চিন্তা করা যেতে পারে যেখানে বিচ্যুত আচরণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কোনো বাস্তব প্রয়োজন নেই। কোনো ক্ষমতা বা শক্তিই বিচ্যুত আচরণকে 'অপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করবে না। এ ধরনের নতুন সমাজের চিন্তা-চেতনাই উল্লিখিত লেখকত্রয়কে মার্কসবাদী তত্ত্বে আগ্রহী করে তোলে। নব্য-মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অপরাধকে স্বাভাবিক লোকের স্বাভাবিক কর্ম বলে বিবেচনা করা হয়। এদের অপরাধীকরণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই বললেই চলে। বিপথগমনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানবীয় আচরণের কিছু দিককে সামাজিক প্রয়োজনে অপরাধমূলক বলে আখ্যা দেয়া হয়। তাঁদের মতে, অপরাধ এবং নিরাপরাধ উভয় ধরনের আচরণই স্বাভাবিক। মানুষের কিছু আচরণকে অপরাধীকরণ প্রক্রিয়ায় অপরাধমূলক বলে আখ্যা দেয়াও স্বাভাবিক।

গ) এমিল ডুর্খেইমের তত্ত্ব (Emile Durkheim's theory)

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম সরাসরি বিচ্যুতিমূলক আচরণ সম্পর্কে তত্ত্ব প্রদান করেননি। তিনি তাঁর The Division of Labour গ্রন্থে যৌথ প্রতিরূপ (Collective conscience) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যৌথ প্রতিরূপের মূল বক্তব্য হচ্ছে, ব্যক্তি সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় বিধান দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এসব বাহনের প্রতি সমাজের অধিকাংশ মানুষ শ্রদ্ধাশীল থাকে। মানুষের এ সমষ্টিগত মনোভাবকে যৌথ প্রতিরূপ বলে। অর্থাৎ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অভিন্ন বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচরণ হচ্ছে ওই সমাজের যৌথ প্রতিরূপ বা সমষ্টিগত চেতনা। সমষ্টিগত চেতনার লংঘন হচ্ছে বিচ্যুতি। যৌথ প্রতিরূপের প্রাতিষ্ঠানিক, বাস্তব ও দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত হচ্ছে আইন। কেউ আইন লংঘন করলে সে মূলত যৌথ চেতনার লংঘন করে। ফলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু যৌথ চেতনার যেসব রীতিনীতি কেবল সামাজিকভাবে প্রয়োগ করা হয় সেগুলোর লংঘন হচ্ছে বিচ্যুতি। কাউকে গালি দেয়া অপরাধ নয়, বিচ্যুত আচরণ। কিন্তু গণপরিবহনে ধূমপান একটা সময় পর্যন্ত বিচ্যুতিমূলক আচরণ ছিলো। এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন হওয়ার ফলে এখন এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। একই কথা বলা যায় বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রেও। ডুর্খেইমের মতে, সামাজিক সংহতি (Social solidarity) ও সমষ্টিগত চেতনার (Collective conscience) মাধ্যমে নৈরাজ্য এবং বিচ্যুতিমূলক আচরণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ঘ) রবার্ট কে. মার্টনের তত্ত্ব (R.K Marton's theory)

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট কে. মার্টন তাঁর Social Theory and Scial Structure (1949) গ্রন্থে অপরাধমূলক আচরণের তত্ত্ব প্রকাশ করেন। সামাজিক কাঠামোর ভেতর থেকেই অপরাধমূলক আচরণের উদ্ভব হয়। কোনো কোনো সামাজিক কাঠামো নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে চিরায়ত (Conforming) আচরণের পরিবর্তে ভিন্নতর কোনো আচরণে (Non-conforming conduct) উদ্বুদ্ধ করে। মার্টনের মতে, অপরাধমূলক আচরণের মূলে জৈবিক কারণ নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো অধিকতর ক্রিয়াশীল। সমাজে সাফল্য, অর্থবিত্ত, ক্ষমতা ও মর্যাদা অর্জন হচ্ছে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য। এগুলো অর্জনে

প্রাতিষ্ঠানিক উপায় প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হলে নৈরাজ্য দেখা দেয়। মার্টন বিষটিকে নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

ক) সামঞ্জস্য (Conformity): কোনো সমাজে সাংস্কৃতিক লক্ষ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলে ওই সমাজে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। ফলে সমাজে নৈরাজ্য এবং অপরাধ প্রবণতা কম থাকে।

খ) উদ্ভাবন (Innovation): প্রাতিষ্ঠানিক উপায়কে অস্বীকার করে ব্যাক্তি স্বীকৃত সাংস্কৃতিক লক্ষ্যকে বিকল্প উপায়ে অর্জনে তৎপর হয়। বিকল্প বা উদ্ভাবনী উপায় হিসেবে ব্যক্তি বিচ্যুত আচরণ করতে পারে।

গ) প্রথানিষ্ঠতা (Ritualism): লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক উপায় বা নিয়ম-কানুনকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কোনোভাবেই নিয়মের বাইরে যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়। প্রথানিষ্ঠতা বিচ্যুত আাপচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ) পশ্চাদপসারণ (Retreatism): লক্ষ্য অর্জনের প্রচণ্ড চাপ থাকে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে বৈধভাবে তা সম্ভব হয় না। তখন ব্যক্তি লক্ষ্য অর্জনে বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং সমাজে বিচ্যুত আচরণ বৃদ্ধি পায়।

ঙ) বিদ্রোহ (Rebellion): কোনো সমাজ কাঠামোয় যদি স্বীকৃত লক্ষ্য অর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক উপায় কার্যকর না থাকে তখন ব্যক্তি বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্রোহের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এর ফলে সমাজে নৈরাজ্য দেখা দেয়। নৈরাজ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী সমাজে বিচ্যুত আচরণের মাত্রাও কম-বেশি হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	'পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা' তত্ত্বটির সারাংশ লিখুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজ গঠনের শুরু থেকেই সমাজে বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধ-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সমাজ যত জটিল (Complex) হচ্ছে বিচ্যুত আচরণের শ্রেণি, বৈশিষ্ট্য এবং স্বরূপেও তত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিচ্যুত আচরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অপরাধবিজ্ঞানে অসংখ্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলো এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামাজিক পরিমণ্ডলেই অপরাধীকরণ হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজই কিছু মানুষকে অপরাধী করে তোলে। বলা যায়, সমাজের প্রয়োজনে আইন ও বিধিনিষেধের ভিত্তিতে মানুষের কিছু আচরণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'পার্থক্যমূলক সম্পৃক্ততা' তত্ত্ব কে প্রদান করেছেন?
(ক) সাদারল্যান্ড (খ) কার্ল মার্কস
(গ) এমিল ডুর্খিম (ঘ) আর.কে মার্টন

২। মার্কসবাদে বিচ্যুত আচরণ হচ্ছে মানুষের:
(ক) সামাজিক আচরণ (খ) স্বাভাবিক আচরণ
(গ) অথনৈতিক প্রতিযোগিতার ফল (ঘ) সামাজিক কাঠামোর প্রভাব

৩। 'সমষ্টিগত চেতনার লংঘন হচ্ছে বিচ্যুতি' কে বলেছেন?
(ক) সাদারল্যান্ড (খ) কার্ল মার্কস
(গ) এমিল ডুর্খেইম (ঘ) আর.কে মার্টন

৪। আর.কে মার্টন কয়টি উপাদানের মাধ্যমে বিচ্যুতিমূলক আচরণ ব্যাখ্যা করেছেন?
(ক) তিনটি (খ) চারটি
(গ) পাঁচটি (ঘ) ছয়টি

পাঠ-১১.৩ অপরাধ
Crime

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অপরাধ কী তা বলতে পারবেন;
- অপরাধের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখতে পারবেন এবং
- অপরাধের ধরনসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অপরাধ।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

বিচ্যুত আচরণ সমাজ ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিটি সমাজে কোনো না কোনো ধরনের বিচ্যুত আচরণ লক্ষ করা যায়। বিচ্যুত আচরণ থেকেই অপরাধের সূচনা হয়। সাধারণ অর্থে সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ কিংবা রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করলে তাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অপরাধ সব সমাজে এক এবং অভিন্ন না-ও হতে পারে। যেমন: পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক, একত্রে বসবাস, সমকামিতা ইত্যাদি আইনত বৈধ এবং সামাজিকভাবে এটি নয়। কিন্তু বাংলাদেশে এটি রীতিমত নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ। রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিকভাবে এটি গ্রহণযোগ্য বা সমর্থনযোগ্য নয়। বস্তুত অপরাধের সাথে সমাজ ও সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে

অপরাধের সংজ্ঞা (Definition of Crime)

অপরাধের সংজ্ঞায় B. Bhushan (1989 : 51) বলেছেন, অপরাধ বলতে বুঝায় গোষ্ঠীগত রীতিনীতির পরিপন্থী কোনো আচার-আচরণ। এসব আচরণ প্রতিষ্ঠিত কোনো গোষ্ঠী কিংবা তাদের আইন কর্তৃক অনুমোদিত নয়। এটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য কষ্টদায়ক সমাজবিরোধী আচরণ। (Crime refers to any behaviour contrary to the groups of moral codes for which there are formalized group sanctions whether they are laws or not. It is anti-social behaviour harmful to individuals or groups).

সাধারণত অপরাধের দু'টি দিক রয়েছে। (ক) সামাজিক– অর্থাৎ সমাজের বিধিবহির্ভূত কাজকে অপরাধ বলা হয় এবং (খ) আইনগত– এটি রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থী আচরণ। অর্থাৎ রাষ্ট্র বা আইন কর্তৃক অননুমোদিত কাজ হচ্ছে অপরাধ।

গিলিন ও গিলিন তাঁদের '*Cultural Sociology*' গ্রন্থে বলেছেন, জৈবিক দিক থেকে অপরাধের ধারণা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মধ্যে নিহিত। সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিকশিত ব্যক্তিত্বের পার্থক্য অপরাধের সূচনা করে। তাঁদের মতে, সমাজের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকদের বিশ্বাস মতে যারা ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত, সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী তারাই অপরাধী বা কিশোর অপরাধী বলে বিবেচিত। (Sociologically either a criminal or a juvenile delinquent is one who is guilty of an act believed by a group that has a power to enforce its belief to injurious to society and therefore prohibitive).

আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকেও অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। যেমন সাদারল্যান্ড (E. H. Sutherland) তাঁর *Principles of Criminology (1955)* গ্রন্থে বলেছেন, আইন লঙ্ঘনই অপরাধ। যেখানে কোনো আইন নেই সেখানে কোনো অপরাধও থাকে না। যখন কোনো আইন পাস করে বলবৎ করা হয়, পূর্বে যে কর্ম অপরাধমূলক ছিল না, এক্ষণে তা অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। (Crime is a violation of law. If there were no laws there would be no crime. Whenever a law is passed and enforced acts that were not crime, previously are made crimes.)

বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানী ফজলুর রশীদ খান (F. R. Khan) অপরাধের সংজ্ঞায় আইনগত ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর '*Principles of Sociology*' গ্রন্থে বলেছেন, সাধারণভাবে বলতে গেলে একথা স্পষ্ট যে কোনো সমাজে লোকদের যেসব আচরণ নৈতিকতাবিরোধী ও সমাজবিরোধী সেগুলো অপরাধমূলক কর্ম বলে বর্ণনা

করাই সর্বাপেক্ষা সহজতম পন্থা। আইন যেসব কর্মকে নিষিদ্ধ করে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণও সেসব কর্মকে সমাজের জন্য বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বলে মনে করে। এটি স্বতঃসিদ্ধ।

বস্তুত অপরাধ হচ্ছে এমন আচরণ বা কৃতকর্ম যা সমাজে আপত্তিকর এবং আইন ও রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ। অপরাধ সমাজে নিন্দনীয় এবং আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত। সমাজে এক ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে, অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে। এসব অপরাধ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধী শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে। এটি মূলত দুর্নীতি বা ভদ্রবেশী অপরাধ (White colour crimes)। কর ফাঁকি দেয়া, ঘুষ নেয়া, তহবিল তছরূপ করা ইত্যাদি এ শ্রেণির অপরাধ।

অপরাধের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Crime)

অপরাধ সামাজিক আচরণবিধি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী একটি প্রত্যয়। এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন:

১। মানুষের সামাজিক আচরণের একটি অস্বাভাবিক রূপ হচ্ছে অপরাধ।
২। এটি সামাজিক, ব্যক্তিগত এবং আদর্শগতভাবে ক্ষতিকর।
৩। অপরাধ মূলত আপেক্ষিক; সময় ও সমাজভেদে এর রূপ ও মাত্রাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
৪। সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি হচ্ছে অপরাধ।
৫। অপরাধ সমাজ কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন—শিল্প সমাজের অপরাধপ্রবণতা কৃষি সমাজ অপেক্ষা ভিন্নতর।
৬। অপরাধ সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া এবং সামাজিকীকরণের ফল।
৭। অপরাধ আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য।
৮। বয়স অনুযায়ী অপরাধের মাত্রা ও গুরুত্ব নিরূপণ করা হয়।
৯। অপরাধ নিন্দনীয় এবং বর্জনীয়।
১০। অনেক সময় মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কোনো কোনো মানুষ অপরাধে লিপ্ত হয়। যেমন: ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা সূর্য সেন প্রমুখ মহান স্বাধীনতার আদর্শে নিবেদিত হয়ে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।
১১। অপরাধ সমাজের অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য বিষয়। এরিকসন (T. Erikson) বলেছেন, সন্ন্যাসীদের সমাজে বসবাসকারী সদস্যদের মধ্যেও অপরাধ প্রবণতা বিদ্যমান। ডুর্খেইম অপরাধকে সামাজিক দিক থেকে স্বাভাবিক কার্যকলাপ এবং সুস্থ সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য উস্কানি, শর্তভঙ্গ, উন্মুক্ত অপরাধ সংঘটন ইত্যাদি সমাজের ক্ষতি সাধন করে। মাদকাসক্তি, ডাকাতি, আত্মহত্যা ইত্যাদি ব্যক্তিগত এবং বেশ্যাবৃত্তি, সমকামিতা, গর্ভপাত প্রভৃতি কোনো কোনো রক্ষণশীল সমাজের আদর্শগত ক্ষতি সাধন করে থাকে।

অপরাধের ধরনসমূহ (Types of Crime)

সমাজে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়। সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীরা পাঁচ ধরনের অপরাধের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

ক) কিশোর অপরাধ (Juvenile delinquency)
খ) আত্মবিনাশ অপরাধ (Self-destroyed crime)
গ) ভদ্রবেশী অপরাধ (White-collar crime)
ঘ) সংগঠিত অপরাধ (Organized crime)
ঙ) ফৌজদারি অপরাধ (Criminal crime)

ক) কিশোর অপরাধ: কিশোর-কিশোরী দ্বারা সংঘটিত অপরাধ হচ্ছে কিশোর অপরাধ। ১৮ বছরের কম বয়সী কোনো ছেলে কিংবা মেয়ে দ্বারা সংঘটিত অপরাধকে কিশোর অপরাধ বলে অভিহিত করা হয়।

খ) আত্মবিনাশ অপরাধ: কিছু অপরাধ আছে যা অন্যের নয়, অপরাধীরই ক্ষতিসাধন করে। অর্থাৎ এ ধরনের অপরাধে ব্যক্তি নিজেই নিজের বিনাশ ত্বরান্বিত করে। মাদকাসক্তি, ধূমপান, জুয়াখেলা, পতিতাবৃত্তি, ইত্যাদি আত্মবিনাশ অপরাধ।

গ) ভদ্রবেশী অপরাধ: সাধারণত 'ভদ্রলোকেরা' যে অপরাধ করে তাকে ভদ্রবেশী অপরাধ বলে। শিক্ষিত, পেশাজীবী এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গই এ ধরনের অপরাধের সাথে বেশি যুক্ত থাকেন। দায়িত্বে অবহেলা, কাজে ফাঁকি, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, আয়কর ফাঁকি, জালিয়াতি, প্রতারণা, তহবিল তছরূপ, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, ট্রেডমার্ক বা বইয়ের পাণ্ডুলিপি

চুরি বা নকল করা ইত্যাদি ভদ্রবেশী অপরাধ বলে পরিগণিত।

ঘ) সংগঠিত অপরাধঃ সংগঠিত অপরাধ হচ্ছে দলগত অপরাধ। 'চেইন অব কমান্ড' অনুসরণ করে 'সিন্ডিকেট' পদ্ধতিতে বেশকিছু মানুষ সমন্বিতভাবে এ ধরনের অপরাধ সংঘটন করে। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মাফিয়াচক্র, সন্ত্রাসীগোষ্ঠী সংগঠিত অপরাধে যুক্ত থাকে। চোরাচালান, মাদক ব্যবসা, নারী ও মানব পাচার, জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি অপরাধ দলগতভাবে সংঘটিত অপরাধ। বিভিন্ন সরকারী সেবা যেমন ভিসা-পাসপোর্ট, স্বাস্থ্যসেবা, ভূমি অফিস বিভিন্ন ক্ষেত্রেও 'সিন্ডিকেট'ভিত্তিক অপরাধ পরিলক্ষিত হয়।

ঙ) ফৌজদারি অপরাধঃ ফোজদারী অপরাধ সরাসরি আইনের লংঘন এবং শাস্তিযোগ্য। এতে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপক্ষ বা অন্য ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সম্পত্তি হরণ কিংবা কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীকে আক্রমণের মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়। সম্পত্তি আত্মসাৎ, জবরদখল, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন-জখম, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, রাহাজানি ইত্যাদি ফৌজদারি অপরাধ।

শিক্ষার্থীর কাজ	অপরাধের ধরন এবং বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন। সময় : ১০ মিনিট

সারসংক্ষেপ

উত্তর-আধুনিক সমাজের বিচ্যুত আচরণ হচ্ছে অপরাধ। আইন, প্রথা, নিয়ম-কানুন, বিধিনিষেধ ইত্যাদি সমাজ ও মানুষের শান্তি-শৃঙ্খলা ও কল্যাণ বিবেচনায় কোনো কোনো আচরণকে অপরাধ বলে গণ্য করে। অপরাধ প্রায়শ শাস্তিযোগ্য ও দণ্ডনীয়। মানুষ সমাজ থেকেই অপরাধ রপ্ত করে। সামাজিকীকরণ যেমন মানুষকে যৌক্তিক ও নীতিপরায়ণ করে তোলে তেমনি পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কিছু মানুষ অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠে। কিশোর অপরাধ, ফৌজদারি অপরাধ, ভদ্রবেশী অপরাধসহ সমাজে নানা ধরনের অপরাধ পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Crime is a violation of law' কে বলেছেন?

(ক) E. H. Sutherland (খ) Edwin Limert

(গ) David Dressler (ঘ) David Repenoe

২। ঘুষ নেয়া, দুর্নীতি, দায়িত্বে অবহেলা কী ধরনের অপরাধ?

(ক) আত্মবিনাশ অপরাধ (খ) ভদ্রবেশী অপরাধ

(গ) ফৌজদারি অপরাধ (ঘ) কোনোটিই নয়

পাঠ-১১.৪ অপরাধের কারণ ও প্রতিকার
Causes and remedies of Crime

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অপরাধের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- অপরাধ প্রতিকারের ব্যবস্থা ব্যাখা করতে পারবেন এবং

মুখ্য শব্দ	অপরাধের কারণ, অপরাধ প্রতিকার।

অপরাধের কারণসমূহ (Causes of Crime)

আমরা জানি, কেউ অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সমাজই তাকে অপরাধী করে গড়ে তোলে। তবে কোনো মানুষ কেনো অপরাধী হয়ে উঠে সে সম্পর্কে মনীষীরা নানা ব্যাখ্যা, মতামত এবং তত্ত্ব প্রদান করেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন:

১) লমব্রোসো'র জৈবিক মতবাদ: অপরাধ বিজ্ঞানী লমব্রোসো (Lombroso) মনে করেন ত্রুটিপূর্ণ বা অস্বাভাবিক শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ অপরাধ প্রবণ হয়। তাঁর মতে, শারীরিক গড়নে ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা অপরাধের অন্যতম কারণ। অপরাধীদের শারীরিক গঠন পর্যালোচনা করে লমব্রোসো বলেছেন, মুখমণ্ডল, চোয়াল, চোখ, কান, নাক, ঠোঁট, বাহু, থুতনি কিংবা দাঁতের গড়নসহ পাঁচ বা ততোধিক দৈহিক ত্রুটি থাকলে মানুষ অপরাধী হয়ে উঠে। তবে সমাজবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীদের অনেকে লমব্রোসোর এ মতবাদের সমালোচনা করেছেন।

২) ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ: প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড (Freud) অপরাধের কারণ বিশ্লেষণে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, মানুষ বাঁচার তাগিদে অপরাধে লিপ্ত হয়। অনিবার্য জীবন প্রবৃত্তি (Life instinct) মানুষকে প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দেয়। আবার মানুষের মরণ প্রবৃত্তি (Death instinct) তাকে ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক কাজে উৎসাহ যোগায়। ফ্রয়েডের মতে মানুষ মূলত অদস বা আদি প্রবৃত্তি (Id) অহম (Ego) এবং বিবেক বা অধিসত্তা (Super ego) দ্বারা পরিচালিত হয়। এ তিনটির মধ্যে আদি প্রবৃত্তি বেশি শক্তিশালী হলে মানুষ ভালো-মন্দের বিচার না করে নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা চরিতার্থ করতে অপরাধ করতে দ্বিধা করে না। অন্যদিকে বিবেক বা অধিসত্তা বেশি শক্তিশালী হলে মানুষ যৌক্তিকতা ও নৈতিকতার চর্চা করে।

৩) মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদ: কার্ল মার্কসের (Karl Marx) মতে, পুঁজিবাদী সমাজে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে অপরাধ সংঘটিত হয়। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, শোষণ, বঞ্চনা মানুষকে অপরাধী হতে বাধ্য করে। আবার অধিক মুনাফার লোভে পুঁজিপতিরা করফাঁকি, প্রতারণা, বঞ্চনার মত অপরাধ করে থাকে। ফলে পুঁজিবাদী সমাজে মালিক-শ্রমিক উভয় শ্রেণি অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠে।

৪) অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ: সমাজবিজ্ঞানী টার্ডের (Tarde) মতে, অনুকরণ প্রবণতাই অপরাধের মূল কারণ। পূর্বসূরি, খেলার সাথী অর্থাৎ গোষ্ঠী সদস্যদের আচরণ থেকেই অপরাধ অন্যদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। গিলিন ও গিলিন বলেছেন, পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া ব্যতীত কারো পক্ষে অপরাধী হয়ে উঠা খুব সহজ নয়। সমাজবিজ্ঞানী মার্টন (Robert K. Merton) এর মতে, প্রতিটি সমাজে কিছু স্বীকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

উপর্যুক্ত তাত্ত্বিক কারণগুলো ছাড়াও আরো অনেক কারণে মানুষ অপরাধমূলক কাজ বা আচরণ করতে পারে। যেমন:

১) ভৌগোলিক পরিবেশ: সমাজ জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মরু এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষ বদমেজাজি এবং নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। গহীন অরণ্য, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দুর্গম এলাকা অপরাধের স্বর্গরাজ্য। কেননা এখানে কার্যকরভাবে প্রশাসনিক তৎপরতা চালানো সম্ভব নয়। আবার চরাঞ্চলে দস্যুতা, দাঙ্গা, রক্তপাত নিত্যদিনের ঘটনা। সুতরাং

ভৌগোলিক প্রভাবে অপরাধপ্রবণতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

২) পারিবারিক কারণ: পিতা-মাতার মধ্যে কলহ, অশান্তি, দূরত্ব, পৃথক আবাসন, তালাক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট পরিবারের (Broken family) ছেলে-মেয়েদেরকে অপরাধী করে তুলতে পারে। স্নেহ-ভালোবাসার অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, নিঃসঙ্গতা, হতাশা কিংবা পিতা-মাতার উগ্রতা-উশৃঙ্খলতা সন্তানদেরকে অপরাধ জগতে ঠেলে দেয়। পিতা-মাতা, বড়ভাই বা নিকটাত্মীয়দের কেউ অপরাধ জগতের সাথে যুক্ত থাকলে তাদের প্রভাবে অনেকে অপরাধ জগতে প্রবেশ করে।

৩) ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ: পরিবার ছাড়াও স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠ তথা বন্ধুবান্ধবের প্রভাবে অনেক সময় মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অপরাধে লিপ্ত হয়। কোনো শান্ত প্রকৃতির ছেলে যদি উচ্ছৃঙ্খল বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেলা-মেশা করে তবে তার নৈতিকতায় পরিবর্তন আসতে বাধ্য। অপরাধপ্রবণ পরিবেশ এবং ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণের ফলেই অনেকে অপরাধী হয়ে উঠে।

৪) সুস্থ বিনোদনের অভাব: মানুষ খেলাধুলা এবং হাসি-আনন্দে থাকলে তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ সুন্দর ও স্বাভাবিক গতিতে সম্পন্ন হয়। নানা কারণে খেলার মাঠসহ সুস্থ বিনোদন ক্ষেত্রকে ক্রমশ দুর্লভ করে তুলছে। অন্যদিকে টেলিভিশন, সিনেমা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফেসবুক, গেমস ছেলে-মেয়েদেরকে খেলার মাঠ বিমুখ করে তুলছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের অশ্লীল, সহিংস ও কুরুচিপূর্ণ বিনোদন তরুণদেরকে যৌনতা, ভায়োলেন্স, হিংস্রতাসহ নানা অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

৫) গণমাধ্যমের প্রভাব: পাশ্চাত্য সমাজে কিশোর অপরাধীদের একটি বড় অংশ টিভি–সিনেমার ভায়োলেন্স দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপরাধে লিপ্ত হয়। খুন-ধর্ষণ, চাঁদাবাজী, মাস্তানি ইত্যাদি খবর গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করার ফলে অন্যরা এর থেকে উৎসাহিত হয়। সিনেমায় অশ্লীল দৃশ্য দেখে অনেকে যৌন অপরাধ, খুন-খারাবি দেখে সন্ত্রাস করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

৬) বিচারালয় ও জেলখানার ত্রুটি: অপরাধীদের শাস্তিবিধান ও অবস্থানের বাহন হচ্ছে বিচারালয় ও জেলখানা। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা, আইনের মারপ্যাচ, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে অনেক সময় অপরাধী যেমন শাস্তি থেকে রেহাই পায়, আবার নিরপরাধ ব্যক্তির শাস্তি প্রাপ্তির মত ঘটনাও ঘটে। প্রমাণ ও যথাযথ কার্যক্রমের অভাবে কুখ্যাত সন্ত্রাসীরা জামিনে মুক্তি পায় এবং অপরাধ কার্যক্রমে দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পৃক্ত হয়। জেলখানায় আত্মশুদ্ধির পরিবর্তে

৭) রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশ্রয়: চাঁদাবাজী, মাস্তানি, ছিনতাইসহ যে কোনা অপরাধের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্র-ছায়ায় তাদের কু-কর্ম সম্পন্ন করে। চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, অপহরণ, মুক্তিপণ ইত্যাদি বিষয়ের সাথে যুক্ত প্রায় সবাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও এর অঙ্গসংগঠনের সদস্য। শীর্ষ সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ বা অন্য কোনো অপরাধীদের উত্থানে রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা এক অনিবার্য বাস্তবতা।

অপরাধ প্রতিকারের উপায়সমূহ (Ways of Prevent Crime)

অপরাধ প্রবণতা প্রতিকারের ক্ষেত্রে প্রধান কয়েকটি উপায় হচ্ছে:

ক) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

খ) সংশোধনমূলক ব্যবস্থা

গ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:

ঘ. সচেতনতামূলক ব্যবস্থা।

ক. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা: প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রধানত কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১। পরিকল্পিত সুখী পরিবার গঠন। পরিবারকেই বিনোদন, আস্থা ও নিরাপত্তার মূল কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
২। পারিবারিক অশান্তি, দ্বন্দ্ব-কলহ পরিহার করা, একসাথে আনন্দ-বেদনা ভাগাভাগি করা, বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে সন্তানাদিসহ পরিবারকে সময় দেয়া।
৩। শিশু-কিশোরদের লালন-পালন এবং মননশীলতা বিকাশে সমাজে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।
৪। সুস্থ ও গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।
৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আনন্দময় পরিবেশে উৎপাদনমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করা।
৬। আইন-শৃঙ্খলা ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
৭। সবাইকে মানবিক ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা।
৮। আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা।

খ. সংশোধনমূলক ব্যবস্থা: অপরাধ প্রতিকারের উপায় হিসেবে কিশোর অপরাধীদের সংশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিশোর

অপরাধ সংশোধনে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ অধিকতর কার্যকর বলে মনীষীরা মনে করেন।

১। কিশোর আদালত: কিশোর অপরাধীর প্রতি আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিশোর আদালত পরিচালিত হয়। প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে কিশোর অপরাধীকে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করা হয়।

২। কিশোর হাজত: দাগী অপরাধীদের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে ধৃত কিশোর অপরাধীদেরকে কিশোর হাজতে রাখা হয়। কিশোর হাজতও সংশোধনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গড়ে তোলা হয়।

৩। সংশোধনী প্রতিষ্ঠান : কিশোর অপরাধীদের উপার্জনক্ষম ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে সংশোধনী প্রতিষ্ঠান। সংশোধনী বা উন্নয়ন কেন্দ্রে অপরাধী কিশোরদের নিয়মিত শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে সক্ষম করে তোলা হয়।

গ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা: শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মূলত বয়স্ক অপরাধীদের জন্য প্রযোজ্য। প্রমাণিত হলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে পেনাল কোডের ধারা মোতাবেক শাস্তি নিশ্চিত করাই আইনের শাসন। এতে অপরাধী নিজে যেমন নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি সমাজের সাধারণ মানুষও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে। আমাদের দেশ বা সমাজে নানা ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দেখা যায়। যেমন: ১) সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাস, ২) নির্দিষ্ট মেয়াদে কারাদণ্ড, ৩) জরিমানা বা অর্থদণ্ড, ৪ পেশাগত শাস্তি এবং ৫) সামাজিক শাস্তি।

ঘ. সচেতনতামূলক ব্যবস্থা: অপরাধ প্রতিকারের জন্য সচেতনতামূলক ব্যবস্থা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। যেমন: সামাজিক আন্দোলন, অপরাধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দান থেকে বিরত থাকা, দুর্নীতি রোধ এবং আইনের শাসন নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে অপরাধের বিরুদ্ধে সচেনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	অপরাধের ৫টি কারণ এবং প্রতিকারের ৫টি উপায় লিখুন। সময় : ১০ মিনিট

সারসংক্ষেপ

সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, অপরাধমুক্ত কোনো সমাজ নেই। সব সময় সব সমাজে কম-বেশি অপরাধ ছিলো, থাকবে। যে সমাজ যতখানি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে সমাজ ততখানি শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অপরাধের জৈবিক মতবাদ কে দিয়েছেন?

(ক) E. H. Sutherland (খ) Lombroso

(গ) Freud (ঘ) David Repenoe

২। অপরাধ সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতবাদ হচ্ছে–

(ক) জৈবিক মতবাদ (খ) সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ

(গ) মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ (ঘ) কোনোটিই নয়

৩। অপরাধ প্রতিকারের প্রধান উপায় কয়টি?

(ক) দু'টি (খ) তিনটি

(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

পাঠ-১১.৫ বিচ্যুতি ও অপরাধঃ সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

Devience and Crime: Recent Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিচ্যুতি ও অপরাধের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে বিচ্যুতি, নৈতিকতার সাথে গণমধ্যামের সম্পর্ক ব্যাখা ব্যাখা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিচ্যুতি, অপরাধ, নৈতিকতা ও গণমাধ্যম।

বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধের পার্থক্য (Difference between Deviance and Crime)

অপরাধের সাথে বিচ্যুত আচরণের কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বিচ্যুতি বা বিচ্যুত আচরণ হচ্ছে অপরাধের প্রাথমিক স্তর। নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধন না হলে বিচ্যুত আচরণকারী ক্রমশ অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠে। এখানে বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধের কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

ক্রম	বিচ্যুত আচরণ	অপরাধ
০১	সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও প্রথা বিরোধী কাজ বা আচরণ।	প্রচলিত আইন বিরোধী কাজ বা আচরণ।
০২	আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য নয়।	আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য।
০৩	বিচ্যুত আচরণের জন্য অনেক সময় তিরস্কারসহ সামাজিক শাস্তি প্রদান করা হয়।	অপরাধের জন্য সামাজিক শাস্তি নয়, আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
০৪	বিচ্যুত আচরণ নিয়ন্ত্রণে পরিবার এবং সমাজের ভূমিকাই যথেষ্ট।	অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ভূমিকা অধিকতর কার্যকর। তবে সামাজিক আন্দোলন এবং সচেতনতাও প্রয়োজন
০৫	অপরাধের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে বিচ্যুতি।	বিচ্যুতির চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে অপরাধ।
০৬	বিচ্যুতি সামাজিক শৃঙ্খলাকে দুর্বল করে ।	অপরাধ রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাকে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্থ করে।
০৭	বিচ্যুত আচরণের নির্ধারক হচ্ছে পরিবার, গোষ্ঠী বা সমাজ।	অপরাধের নির্ধারক হচ্ছে আইন, সরকার বা রাষ্ট্র।
০৮	বিচ্যুতি প্রায়শ অলিখিত এবং যুগ যুগ ধরে প্রচলিত।	অপরাধ লিখিত, কোনটি অপরাধ এবং তার জন্য শাস্তি কী হবে তা লিখিতভাবে জারি করা হয়।
০৯	বিচ্যুত আচরণকারীকে থানা-পুলিশ, আইন-আদালত মোকাবিলা করতে হয় না।	অপরাধীকে থানা-পুলিশ, আইন-আদালত মোকাবিলা করতে হয়।
১০	সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে বিচ্যুত আচরণে পার্থক্য দেখা যায়। একসমাজে যা বিচ্যুতি, অন্য সমাজে তা বিচ্যুতি না ও হতে পারে।	অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব সমাজ ও সংস্কৃতিতে অপরাধের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য থাকে না। হত্যা, ধর্ষণ, চুরি সর্বত্রই অপরাধ হিসেবে গণ্য। তবে দেশভেদে শাস্তির পার্থক্য রয়েছে। একই অপরাধে কোনো দেশ অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে আবার কোনো কোনো দেশ নির্দিষ্ট মেয়াদে কারাদণ্ড দিতে পারে।

বিচ্যুতি, নৈতিকতা ও গণমাধ্যমঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থায় গতিশীল পরিবর্তন সর্বজন স্বীকৃত। শিল্পায়ন, দ্রুত নগরায়ন, শিক্ষার সম্প্রসারণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ প্রভৃতি সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পরিবর্তনের দৃশ্যমান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এদের একটি বড় অংশ চিরায়ত মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়।

আধুনিক শিক্ষা তাদেরকে অনেকবেশি স্বাধীনচেতা করে তুলছে। আবার নৈতিক শিক্ষার অভাবে অনেক তরুণ দুর্বিনীত মনোভাবের অধিকারী হয়ে উঠছে। পারিবারিক ও প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিও এদের উৎকট উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের প্রতি অশোভন দৃষ্টিভঙ্গি, গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। পারিবারিক কাজে ছেলে-মেয়েরা পূর্বের ন্যায় বাবা-মাকে সাহায্য করে না। অধিকাংশ পরিবারে সন্তানরা বাবা-মায়ের সমস্যা বা সীমাবদ্ধতার প্রতি সমব্যাথী বা সহানুভূতিশীল নয়।

ত্রুটিপূর্ণ, গোঁড়া এবং অপূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় শিক্ষা তরুণদের একটি ক্ষুদ্র অংশকে জঙ্গি ও মৌলবাদী ভাবধারায় গড়ে তুলছে। মুক্ত গণমাধ্যম, হাতের নাগালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তরুণ প্রজন্মকে ক্ষেত্রবিশেষে বিপথে ঠেলে দিচ্ছে। এখন তরুণ-তরুণী অনেকের হাতে স্মার্ট ফোন। টুইটার, ফেসবুক, ইউটিউব, গুগলে সার্চ দিলেই মুহূর্তে সবকিছুর দেখা মেলে। সবাই এগুলোর সদ্ব্যবহার করছে না। বিনোদনের নামে অশ্লীলতা, পর্ণোগ্রাফি, সন্ত্রাস-সহিংসতায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। ইয়াবাসহ মাদকের সহজলভ্যতা কিছু শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত এবং নিরক্ষর তরুণদের সর্বনাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সামগ্রিকভাবে তরুণ প্রজন্মের নৈতিকতায় বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কিছু কিছু তরুণ এখন বাবা-মা, পরিবার, শিক্ষক ও গুরুজনদের অবাধ্য। বন্ধুদের সাথে 'স্ট্যাটাস' রক্ষা কিংবা মাদকের নেশায় তারা অনেক সময় বেপরোয়া আচরণ করে। ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা, পরিবারকে না জানিয়ে নিজের পছন্দে বিয়ে করা এমনকি বিবাহপূর্ব কিংবা বিবাহ বহির্ভুত যৌনাচারের প্রবণতাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো বাংলাদেশের সমাজে বিচ্যুত আচরণ। নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং নৈতিকতার অবক্ষয়ে বাংলাদেশের সমাজে বিচ্যুত আচরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সুস্থ-স্বাভাবিক মূল্যবোধের অভাবে জঙ্গি ও মৌলবাদে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি সমাজে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। ধর্মের নামে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চিরায়ত সংস্কৃতির পরিপন্থী। ধর্মের মর্মবাণী আত্মস্থ করা, নৈতিক শিক্ষার চর্চা, অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সংস্কৃতির লালন, অপসংস্কৃতি পরিহার, পারিবারিক সংহতি ও মূল্যবোধ ধারণ বিচ্যুত আচরণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিচ্যুত আচরণের সাথে গণমাধ্যমের সম্পর্ক চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। বিচ্যুতির জন্য আইনগতভাবে শাস্তির বিধান নেই। অন্যদিকে অপরাধ হচ্ছে আইনের লঙ্ঘন এবং শাস্তিযোগ্য। মূল্যবোধের অবক্ষয় বিচ্যুতি এবং অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। মাদকাসক্তি, নারীর প্রতি সহিংসতা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, ঘুষ-দুর্নীতি ইত্যাদির মূলে রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, ধর্ম ও নৈতিকতার চর্চা বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধের কার্যকর প্রতিষেধক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বিচ্যুত আচরণের মূলে রয়েছে–
(ক) শিক্ষার অভাব (খ) মূল্যবোধের অবক্ষয়
(গ) নৈতিক শিক্ষার অভাব (ঘ) 'খ' এবং 'গ' উভয়

২। নিচের কোন মাধ্যমটি তরুণদেরকে বিচ্যুত আচরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?
(ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (খ) গণমাধ্যম
(গ) অপসংস্কৃতি (ঘ) সবগুলো

৩। বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর–
(ক) উচ্চশিক্ষা (খ) নৈতিক শিক্ষা
(গ) অর্থনৈতিক উন্নতি (ঘ) সচেতনতা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. Principles of Criminology (1955) কার রচিত গ্রন্থ?
ক) গিলিন ও গিলিন খ) ই.এইচ সাদার‍্যলান্ড গ) এডউইন লিম্বার্ট ঘ) ডেভিড রেপিনো

২. অপরাধ বিশ্লেষণে অদস, অহম ও অধিসত্তার ব্যাখ্যা কে প্রদান করেছেন?
ক) ই.এইচ সাদার‍্যলান্ড খ) লম্বোরোসো গ) এডউইন লিম্বার্ট ঘ) সিগমুন্ড ফ্রয়েড

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩. Edwin Limert'র মতে বিচ্যুতি আচরণ-
i. মুখ্য বিচ্যুতি
ii. গৌণ বিচ্যুতি
iii. মনস্তাত্ত্বিক বিচ্যুতি
সঠিক উত্তর কোনটি?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ

মারুফ এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। কলেজে যাতায়াতের জন্য ব্যবসায়ী বাবা মারুফকে একটি মোটর সাইকেল কিনে দিয়েছেন। কলেজ শেষে মারুষ একদিন বাড়ি ফিরছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে রাস্তার উপর সে পাড়ার বেশকিছু মুরুব্বিকে দেখতে পেল। রাস্তার দু'দিকে বসে তারা কোনো বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। কাছাকাছি এসে মারুষ মোটর সাইকেলের গতি এবং শব্দ আরো বাড়িয়ে দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। শব্দ, ধোঁয়া-ধুলো এবং বেপরোয়া গতি সবাইকে বিরক্ত এবং আতঙ্কিত করল। একজন মুরুব্বি বলেই ফেললেন, 'ছেলেটি কে, তার বাবার নাম কী? এ পাড়ার ছেলে তো এতো বেয়াদব হবার কথা নয়'। ওখানে মারুফের বাবাও ছিলেন। তিনি লজ্জায় মুখ নিচু করলেন।

(ক) মারুফের অপ্রত্যাশিত আচরণকে কী বলে? ১
(খ) বিচ্যুতিমূলক আচরণের ধরনগুলো কি কি? ২
(গ) মানুষ কেন বিচ্যুতিমূলক আচরণ প্রদর্শন করে? ৩
(ঘ) বিচ্যুতিমূলক আচরণ প্রতিরোধে আপনার সুপারিশ তুলে ধরুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১	ঃ	১। গ	২। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২	ঃ	১। ক	২। খ	৩। গ	৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩	ঃ	১। ক	২। খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪	ঃ	১। খ	২। গ	৩। গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫	ঃ	১। ঘ	২। ঘ	৩। খ	
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। খ	২। ঘ	৩। ক	

সামাজিক পরিবর্তন
Social Change

ইউনিট ১২

মানব সমাজ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। সমাজের আজকের যে অবস্থা শুরুতে এমন অবস্থা ছিল না। নানাবিদ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এই পূর্ণতা পেয়েছে। সকল সমাজই কম বেশি পরিবর্তনশীল। কোনো সমাজে পরিবর্তনের গতি খুব দ্রুত আবার কোনো সমাজের পরিবর্তনের গতি মন্থর। সমাজবিজ্ঞানে স্থিতিশীলতা হল একটি আপেক্ষিক ব্যাপার; অন্যদিকে পরিবর্তন হচ্ছে একটি অতি চূড়ান্ত বিষয়। সামাজিক পরিবর্তন ধারণাটি কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী সাংস্কৃতিক দিক থেকে, কেউ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ কেউ আবার একে রাজনৈতিক দিক থেকে আর অন্যরা একে সমাজ কাঠামোর দিক থেকে বিবেচনা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, 'বিবর্তন', 'প্রগতি', 'উন্নয়ন', এবং 'পরিবর্তন' এই শব্দ চারটি ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। বিবর্তন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Evolution যা ল্যাটিন শব্দ Evolvere থেকে এসেছে যার অর্থ 'বিকাশ সাধন' অথবা 'উন্মোচন'। উন্নয়ন প্রত্যয়টির সাথে 'জ্ঞানের বিকাশ' এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি' প্রত্যয় দুটির ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্যদিকে, সামাজিক প্রগতি নির্ধারণে একটি মাত্র মাপকাঠিই যথেষ্ট নয়। কারণ সমাজ একটি জটিল সত্তা, যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে গঠিত।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১: সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ
পাঠ-২: সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব: মার্কস ও পেরেটো
পাঠ-৩: সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব
পাঠ-৪: সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

পাঠ-১২.১ সামাজিক পরিবর্তন : ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ
Social Change : Concept, Characteristics and Causes

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক কাঠামো, শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

পরিবর্তনশীলতাই মানব সমাজের প্রধান ধর্ম। সামাজিক পরিবর্তন বলতে সাধারণ কথায় বলা যায় সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তনশীল রূপ লাভ করা। অর্থাৎ সমাজ কাঠমোর এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরকে সামাজিক পরিবর্তন বলা যায়। সমাজ কাঠামোর এ রূপান্তর সবসময় স্থায়ী বা অস্থায়ী নয়। সামাজিক পরিবর্তন সমাজের মৌল কাঠামোর পরিবর্তনকে যেমন বোঝায় সাথে সাথে সমাজের উপরি কাঠামোর পরিবর্তনকেও নির্দেশ করে। মানুষের জীবনযাত্রা, আচরণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে লক্ষ্য করা যায় সে সবই 'পরিবর্তন' নামক প্রত্যয় দ্বারা বিজ্ঞান সম্মতভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। কোনো সমাজে পরিবর্তনের গতি খুব দ্রুত আবার কোনো সমাজের পরিবর্তনের গতি মন্থর। সমাজবিজ্ঞানে স্থিতিশীলতা হলো একটি আপেক্ষিক ব্যাপার; অন্যদিকে পরিবর্তন হচ্ছে একটি অতি চূড়ান্ত বিষয়।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

সামাজিক পরিবর্তন ধারণাটি কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী সাংস্কৃতিক দিক থেকে, কেউ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ কেউ আবার একে রাজনৈতিক দিক থেকে আর অন্যরা একে সমাজ কাঠামোর দিক থেকে বিবেচনা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী উইলবার্ট ও মুর (Wilbert and Moore) সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন বুঝিয়েছেন। সমাজতত্ত্ববিদ রস (Ross) সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন বলে আখ্যায়িত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী এলউডের (E. A. Ellwood) মতে, সমাজ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের অজ্ঞাতসারেই সামাজিক পরিবর্তন সংগঠিত হলেও কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের পরবর্তী স্তরগুলোতে যুক্তিশীল ও উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা বিদ্যমান থাকে।

সমাজবিজ্ঞানী জোনস এর মতে, সামাজিক পরিবর্তন এমন একটি শব্দ, যা সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, সামাজিক ধরন, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া কিংবা সামাজিক সংগঠনের যে কোনো রূপান্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। রজার্স (Rosers) সামাজিক পরিবর্তন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করেছেন যার মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামো এবং ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। তাঁর ভাষায় "Social Change is the process by which alteration occurs in the structure and function of social system"। সমাজবিজ্ঞানী গিলিন এবং গিলিন এর মতে, সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে গ্রহণযোগ্য জীবন পদ্ধতির ক্ষেত্রে রূপান্তর, যা ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, জনতাত্ত্বিক এবং মতাদর্শগত কারণে সংঘটিত হতে পারে। আর এ সব পরিবর্তন যে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি কিংবা উদ্ভাবনের ফলে ঘটতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী মরিস গিনসবার্গ সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, সামাজিক পরিবর্তন দু প্রকারের পরিবর্তন নির্দেশ করে। প্রথমত, সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কার্যাবলির পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, যেসব আদর্শ, মূল্যবোধ বা সামাজিক বিধি সামাজিক কাঠামোকে সংহত করে রাখে এদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এদের পরিবর্তন।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন। তবে সমাজের কাঠামোর সামগ্রিক পরিবর্তন না হয়েও কাঠামোর বিশেষ অংশের পরিবর্তন ঘটে তাকেও পরিবর্তন বলা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য:

১) সামাজিক পরিবর্তন একটি সর্বজনীন প্রপঞ্চ। পৃথিবীর সকল সমাজই কম বেশি পরিবর্তনশীল।

২) সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামগ্রিক পরিবর্তন। কোনো একজন ব্যক্তির পরিবর্তন হলেই সামাজিক পরিবর্তন হবে না। সমগ্র সমাজের পরিবর্তন হতে হবে।

৩) সামাজিক পরিবর্তন অসম গতি সম্পন্ন। সকল সমাজে একই রকম গতিতে সামাজিক পরিবর্তন হয় না। কোথাও দ্রুত গতিতে পরিবর্তন হয় আবার কোথাও মন্থর গতিতে।

৪) সামাজিক পরিবর্তন গতি প্রকৃতি সময় নির্ভর।

৫) সামাজিক পরিবর্তন নিয়ম কেন্দ্রিক। প্রাকৃতিক পরিবর্তন যেমন নিয়ম মেনে চলে তেমনি সামাজিক পরিবর্তনও নিয়ম মেনে চলে।

৬) সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। সামাজিক কী প্রক্রিয়া, কী কী পরিবর্তন হবে তা পূর্ব থেকেই ধারণা করা যায় না।

৭) সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতা। সামাজিক পরিবর্তন হলো সামাজিক বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতা।

৮) সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার ফল। সামাজিক পরিবর্তন হলো সামাজিক বিভিন্ন কারণের মিথষ্ক্রিয়ার ফল।

৯) সামাজিক পরিবর্তন প্রতিস্থাপনমূলক। সামাজিক পরিবর্তন একটি নিয়মের জায়গায় আরেকটি নিয়মের প্রতিস্থাপন ঘটায় বা নিয়মের রূপান্তর করে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

আদিম যুগ হতে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব সমাজ বিকাশ লাভ করেছে। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন: অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক কারণকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক কারণকে এবং মনোবিজ্ঞানীগণ মনস্তাত্ত্বিক কারণকে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে সামাজিক পরিবর্তন যেহেতু একটি সামগ্রিক পরিবর্তন তাই কোনো একটি বিশেষ দিকের পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ একই সমাজে একই সময়ে বিভিন্ন উপাদান পরিবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। যেমন: কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক উপাদানকে আর ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) সাংস্কৃতিক উপাদানকে সামাজিক পরিবর্তনের মুখ্য কারণ বলে বিবেচনা করছেন। সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ প্রধানত প্রাকৃতিক ও মানুষ সৃষ্ট পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের পেছনে জনসংখ্যার স্থানান্তর, শিক্ষা, নগরায়ন, শিল্পায়ন, গণমাধ্যমের ভূমিকা, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত কারণ মুখ্য।

১) ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তন: কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুকূল পরিবেশে ভৌগোলিক অবস্থান পরিবর্তন অথবা আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

২) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা: ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানের উপর প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন: সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের কারণে কৃষি পণ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়, যার ফলে কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ মৎস্য আহরণ সমাজে রূপান্তর হয়।

৩) সামাজিক আন্দোলন: সামাজিক আন্দোলন বা বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। যেমন: সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ভারতীয় উপমহাদেশে সতীদাহ প্রথার বিলোপ, বিধাব বিবাহ প্রচলন, নারী শিক্ষার প্রসারসহ নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

৪) উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন: কোনো সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের হলে ঐ সমাজের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন: কার্ল মার্কস বর্ণিত উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের ফলে সমাজের আমূল পরিবর্তন হয়।

৫) শিক্ষার প্রসার: শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে সমাজের নানা কুসংস্কার ও গোঁড়ামী ভাঙার কারণে সামাজিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন :নারী শিক্ষার প্রসারের ফলে নারীরা ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার ফলে তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার প্রসার নারীর ক্ষমতায়নকে তরান্বিত করায় সামাজিক পরিবর্তন গতি পেয়েছে।

৬) রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন: কোনো সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে সমাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন: আফগানিস্তানে তালিবানদের পতনের পর সেখানকার সমাজে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

৭) ধর্মীয় মূলবোধের প্রচার-প্রসার: ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ামক। কোনো সমাজে যখন অতি মাত্রায় কুসংস্কার, অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় তখন বিভিন্ন ধর্মীয় নেতার আগমনে এবং ধর্মীয় মূলবোধ প্রচারের ফলে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন: হযরত মুহাম্মাদ (সঃ), যীশুখ্রিষ্ট, গৌতম বৌদ্ধ প্রমুখ ব্যক্তির ধর্মীয় মূলবোধ ও আদর্শ প্রসারের ফলে তৎকালীন সমাজে আমূল পরিবর্তন আসে।

৮) যাতায়াত ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন: যাতায়াত ব্যবস্থা পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তির প্রসারের ফলেও সমাজ ব্যবস্থায় উন্নয়ন সাধিত হয় এবং সামাজিক পরিবর্তনকে বেগবান করে। যেমন: বর্তমান যুগে ফেইসবুক, ইমেইল, টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে।

৯) গণমাধ্যম ও আকাশ সংস্কৃতি: আধুনিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে গণমাধ্যম। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করছে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধ, পরিবেশ রক্ষা, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে গণমাধ্যম ভূমিকা রাখতে পারে। আকাশ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচলন বর্তমান সমাজজীবনে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো উল্লেখ করুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সামাজিক কাঠামোতে রূপান্তর বা পরিবর্তন সাধিত হলে তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলে। কখনো কখনো সামাজিক প্রথা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের কারণেও সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তবে যে রূপান্তর দ্বারা সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ ক্রিয়ার ব্যবধান ঘটে না সে রূপান্তরকে পরিবর্তন বলা যায় না। সামাজিক পরিবর্তনের মূখ্য কারণগুলো হল-ভৌগোলিক পরিবেশ, শিক্ষার প্রসার, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, জৈবিক, জনসংখ্যা, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক, শিল্প ও প্রযুক্তি বিপ্লব, তথ্য প্রযুক্তি ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মহৎব্যক্তির সামাজিক সংস্কার ভূমিকা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'Social Change' গ্রন্থটি কে লিখেছেন?
(ক) অগবার্ন (খ) কার্ল মার্কস (গ) অগাস্ট কোঁতে (ঘ) হার্বার্ট স্পেনসার

২। "সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে একটি সহজ-সরল সংগঠন থেকে একটি জটিল কাঠামোয় রূপান্তর" উক্তিটি কার?
(i) রস (ii) এলউড (iii) হার্বার্ট স্পেনসার
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। কে সাংস্কৃতিক উপাদানকে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ বলে বিবেচনা করছেন?
(ক) পেরেটো (খ) সরোকিন (গ) ম্যাক্স ওয়েবার (ঘ) রুশো

পাঠ-১২.২ সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব : কার্ল মার্কস ও ভিলফ্রেডো পেরেটো
Theory of Social Change: Karl Marx and Vilfredo Pareto

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কার্ল মার্কস এর সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভিলফ্রেডো পেরেটো এর সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্ব ব্যাখ্যা পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কার্ল মার্কস, ভিলফ্রেডো পেরেটো, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, মৌলকাঠামো, উপরিকাঠামো, এলিট, ক্ষমতা চক্র ইত্যাদি।

কার্ল মার্কস- এর তত্ত্ব

কার্ল মার্কস কর্তৃক প্রদানকৃত সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বটির নাম 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'। এই তত্ত্বটি বিবর্তনবাদী তত্ত্বসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কেননা উভয় তত্ত্বেই বলা হয়েছে যে, সমাজের মৌলিক পরিবর্তন বস্তুগত পরিবেশের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে ঘটে থাকে। মার্কস তাঁর তত্ত্বে সমাজব্যবস্থায় দুটি কাঠামোর কথা বলেছেন, যথা- মৌলকাঠামো এবং উপরিকাঠামো। মৌলকাঠামো বলতে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে বুঝানো হয়েছে, অন্যদিকে উপরিকাঠামো বলতে সমাজের রাজনৈতিক, আইনানুগ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর মতে, সমাজের মৌলকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন উপরিকাঠামোর উপাদানসমূহের পরিবর্তন ঘটায়। তিনি আরো মনে করেন সামাজিক পরিবর্তন কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয়, বরং এটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মার্কসের মতে, সামাজিক পরিবর্তনের মূলে রয়েছে উৎপাদন প্রণালীর মৌলিক পরিবর্তন যা যুগ যুগ ধরে মানব সমাজের শুরু থেকে ধাপে ধাপে প্রগতিশীলভাবে বস্তু জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হয়েছে। মার্কসের সামাজিক পরিবর্তন সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রাকে নির্দেশ করে। সমাজের উৎপাদন শক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয় যাকে মার্কস 'পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা' বলে অভিহিত করেছেন। যখনই মৌলকাঠামো বা উৎপাদন শক্তি বা অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের ভেতর পরিবর্তন সূচিত হয় তখনি উপরিকাঠামোর উপাদানসমূহের মধ্যে টানাপোড়েন দেখা যায়। এর ফলে সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয় এবং সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি হয়। সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত চরম আকার ধারণ করে। সম্পর্কের ক্রমাগত অবনতির ফলে সমাজে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে অথবা রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে।

মার্কস সমাজ বিকাশের মূলত চারটি ধারার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও পঞ্চম আরো একটি ধারার কথা উল্লেখ করেছেন যার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এবং এটি সমাজের চূড়ান্ত পর্যায়। অর্থাৎ মার্কস বর্ণিত সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের মোট পাঁচটি ধারা বিদ্যমান। যথা- প্রাচ্য বা এশীয় সমাজ ব্যবস্থা, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা, সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এবং সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা। মার্কসের মতে, এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সবচেয়ে প্রাচীন। এখানে ভোগের জন্য উৎপাদন করা হতো, শ্রমবিভাগ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সম্পত্তির যৌথ মালিকানাও বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় বিলাস দ্রব্যের ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যবসা ও জিনিসপত্রের বিনিময় ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। এখানে উৎপাদন শুধু ভোগের জন্যই হতো না, বিনিময়ের জন্যও হতো। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্থান এবং জমিজমার ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে বণিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণি জমিজমার মালিক হন। কৃষকরা উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করে। এ স্তরে প্রধানত ভোগের জন্যই উৎপাদন করা হতো। আধুনিক প্রযুক্তির আবিষ্কার, নতুন নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্র তৈরি ইত্যাদি কারণে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা ক্রমাগত ভেঙে পড়ে। সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়। এ ব্যবস্থায় ধনিকশ্রেণি উৎপাদন যন্ত্রের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে। এর ফলে সমাজে দৃশ্যমান দুটি শ্রেণির সৃষ্টি হয়। একটি শ্রমিক শ্রেণি যারা নিজের কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে আর অন্যদিকে ধনিকশ্রেণি যারা মুনাফা লাভ করে। মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী সমাজ তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে ভেঙে পড়তে পারে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটবে। এ স্তরে প্রকৃত

সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে বলেই একে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা বলা হয়। এখানে কোনো শ্রেণি থাকবে না, সমাজ হবে শোষণমুক্ত। এই সমাজে মানুষ নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রয়োজন মাফিক সব কিছুই পাবে।

ভিলফ্রেডো পেরেটো- এর তত্ত্ব

ইটালীয় সমাজবিজ্ঞানী ভিলফ্রেডো পেরেটো (Vilfredo Pareto) সামাজিক পরিবর্তনের যে তত্ত্ব প্রদান করেন তার নাম চক্রাকারমূলক তত্ত্ব। এটি সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রাচীন তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনুসারে সমাজ কিছু সুনির্দিষ্ট চক্রে আবর্তিত। পেরেটোর মতে, প্রত্যেক সমাজের রাজনীতির যে উত্থান-পতন তা চক্রাকারে ঘটে। জার্মান নৃবিজ্ঞানী অটো অ্যামন, ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী হাউস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেইন, মানিক নৃবিজ্ঞানী ম্যাডিসন গ্রান্ট এবং লথরপ স্টোডার্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পেরেটো তাঁর এ তত্ত্ব দেন (সেন ও নাথ: ২০১৩)। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা স্পেংগলার মনে করেন, সমাজের জীবনচক্র চারটি ধাপে বিভক্ত। যথা- জন্ম, বিকাশ, পরিপক্কতা ও পতন। এ তত্ত্ব অনুযায়ী ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রত্যেকটি সমাজই এক এক করে চারটি ধাপ পর্যায়ক্রমিকভাবে অতিক্রম করার পর পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। তেমনি পেরেটোর মতে সমাজের যে পরিবর্তন তা চক্রাকরে ঘটে। পেরেটো তাঁর চারখন্ডে প্রকাশিত The Mind and the Society (1935) গ্রন্থে এ তত্ত্ব দেন যা সমাজবিজ্ঞানে এলিটের আবর্তন তত্ত্ব বা 'Theory of the Circulation of Elites' বলা হয়। এক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন যে, আমাদের সমাজে দুই ধরনের মানুষ বাস করে। তিনি প্রথম ধরনের মানুষকে 'ক্ষমতাসীন এলিট' বলেছেন যারা চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও ভূমিকা পালন করে। আর দ্বিতীয় ধরনের মানুষকে বলেছেন 'ক্ষমতার বাইরের এলিট' যারা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের মানুষ পরবর্তীকালে হীনবল হয়ে পড়ার কারণে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে শাসকগোষ্ঠীকে এ সময় তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য নানা ধরনের চতুরতার আশ্রয় নিতে হয় এবং এভাবে তাদের ভেতরও নানা রকম রক্ষণশীল চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটে। এ পর্যায়ে অবক্ষয় শুরু হয়। অন্যদিকে, প্রথম ধরনের মানুষের মাঝে ক্ষমতার বাইরের এলিট অর্থাৎ দ্বিতীয় ধরনের লোকদের গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে শুরু করে। যার ফলে প্রথম ধরনের মানুষ দ্বিতীয় ধরনের মানুষের অবস্থান নিতে শুরু করে। পেরেটোর মতে, সামাজিক পরিবর্তনে শাসক এলিট ও অশাসক এলিটের মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল চক্রাকারে সাধিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মার্কস ও পেরেটোর তত্ত্বের পাঁচটি তুলনা লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

কার্ল মার্কসের সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্ব মতে সমাজ পরিবর্তনের পাঁচটি ধারা রয়েছে। যথা- প্রাচ্য বা এশীয় সমাজ ব্যবস্থা, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা, সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এবং সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা। অন্যদিকে পেরেটো তাঁর সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্বে ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর তত্ত্বের নাম 'Theory of the Circulation of Elites' তত্ত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কার্ল মার্কস এর মতে কোন ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা সবচেয়ে প্রাচীন?
(ক) সামন্তবাদী (খ) পুঁজবাদী (গ) এশীয় (ঘ) সাম্যবাদী

২। পেরেটোর "The Mind and the Society" গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
(i) ১৭৩৫ (ii) ১৮৩৫ (iii) ১৯৩৫
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-১২.৩ সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব
Impact of the Elements of Social Change

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবর্তনে জৈবিক, প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত উপাদানের প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	উপাদান, জৈবিক, প্রাকৃতিক, প্রযুক্তিগত ইত্যাদি।

মৌলিক ধারণা

মানব সমাজ পরিবর্তনশীল। সৃষ্টির আদি থেকে মানব সভ্যতার সকল সমাজে ও বিভিন্ন যুগে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তবে সামাজিক পরিবর্তনের এই গতি সকল সমাজে সবসময় এক রকম নয়। কখনো দ্রুত আবার কখনো মন্থর। সমাজের এই পরিবর্তনে কিছু কিছু উপাদান ক্রিয়াশীল। নিম্নে সামজিক পরিবর্তনের এই সব উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

ক) জৈবিক উপাদান: সামাজিক পরিবর্তনে জৈবিক উপাদানের রয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জৈবিক উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে মানুষ, অন্যান্য প্রাণি ও বৃক্ষরাজি। মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন জৈবিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। কেননা মানুষ তার সামাজিক আচরণ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি নির্ধারিত উপায় দ্বারা তার পরিবেশের প্রাণি ও বৃক্ষরাজি এবং অন্যান্য উপাদানকে ব্যবহার করে থাকে। অন্যদিকে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রত্যেক সমাজের পরিবর্তনেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। অতি জনসংখ্যার ফলে বেকারত্ব, দুর্নীতি ও অন্যন্যা অসামাজিক কার্যক্রম, শিশুশ্রমের ব্যবহার ও কর্মসংসস্থানের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

খ) প্রাকৃতিক উপাদান : সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবী পৃষ্ঠের যত বড় বড় পরিবর্তন তার বেশির ভাগই প্রাকৃতিক নানা কারণে হয়েছে। যদিও এসব পরিবর্তন কখনো কখনো সবার দৃষ্টিগোচর হয় না। নানা রকম প্রাকৃতিক উপাদান সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে থাকে। যেমন: ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি। এসব উপাদানসমূহের কারণে নতুন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের ফলে সে অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক কৃষি কাজ ব্যাহত হচ্ছে এবং সেখানকার মানুষ নতুন ধরনের পেশায় লিপ্ত হচ্ছে। এছাড়াও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সহায় সম্বলহীন মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এর ফলে একদিকে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তন হচ্ছে অন্যদিকে শহরেও নতুন নতুন বস্তি এলাকা গড়ে উঠছে। বাংলাদেশের মতো বন্যা প্রবণ দেশসমূহে রাতের অন্ধকারে অনেক গ্রাম শহর বিশেষ করে নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহ নদীগর্ভে হারিয়ে যায়। যার ফলে বাস্তুচ্যুত ঐসব মানুষের জন্য গুচ্ছগ্রাম গড়ে তুলতে হয়। বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলায় এরকম অনেক গুচ্ছগ্রাম লক্ষ করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই সভ্যতার বিকাশ ঘটে থাকে। তবে এককভাবে প্রাকৃতিক উপাদান সামাজিক পরিবর্তন সাধনে পরিপূর্ণ নয়।

গ) প্রযুক্তিগত উপাদান: বর্তমান সমাজে প্রযুক্তি সামাজিক পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ও নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এ যুগের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ, এ যুগ প্রযুক্তির যুগ। এ যুগ পুঁজিবাদের চেয়ে যান্ত্রিকীকরণকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যান্ত্রিকীকরণের উপজাত হলো পুঁজিবাদ। যান্ত্রিকীকরণ শুধু মৌল বা অর্থনৈতিক কাঠামোতেই পরিবর্তন ঘটায় না বরং সমাজের উপরিকাঠামো বিশেষ করে সামাজিক সংগঠন ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটায়। অগবার্ণ ও নিমকফ তাঁদের 'A Handbook of Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Technology changes society by changing our environment to which we, in turn, adapt. This change is usually in the material

environment and the adjustment we make with changes often modifies customs and social institutions"। অর্থাৎ প্রযুক্তি প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তন করার সাহায্যে সামাজিক রূপান্তর ঘটিয়ে থাকে, এই রূপান্তরের সাথে ঐ সমাজের মানুষ নিজেদের মানিয়ে নেয়। এ পরিবর্তন সাধারণ বস্তুগত পরিবেশের মধ্যে সীমিত এবং এর সাথে আমরা উপযোজনের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রথা-পদ্ধতির মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটায় (সেন ও নাথ: ২০১৩)। প্রযুক্তিগত উপাদানের ফলে সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেমন: গার্মেন্টস শিল্পের প্রযুক্তির সহজ ব্যবহারে এদেশের মেয়েরা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে এবং দেশের অর্থনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। অন্যদিকে, যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারে এখন মানুষ আর আগের মতো চিঠি লিখে না। মানুষ এখন মুহূর্তেই মোবাইল ফোন, ইমেইল, ফেইসবুক, টুইটার, স্কাইপে, ভাইভার, মেসেঞ্জার ইত্যাদির সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। এছাড়াও আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষের মাঝে অন্য দেশের সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলছে, ফলে নতুন ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে যাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'সাংস্কৃতিক ব্যবধান (Cultural lag) । আর এ সব কিছুই ঘটছে প্রযুক্তিগত উপাদানের কারণে।

জৈবিক উপাদান, প্রাকৃতিক উপাদান ও আধুনিক প্রযুক্তিগত উপাদান সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেমন- প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত উপাদানের কারণে উপমহাদেশের যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে একক ও অণু পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক পরিবর্তনের জৈবিক উপাদানের প্রভাব লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন ধরনের উপাদানের নানামুখী তৎপরতার কারণে সামাজিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। এর মধ্যে জৈবিক, প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত উপাদান অতি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণি জৈবিক উপাদানের অংশ। অন্যদিকে ঝড়, বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিক উপাদানের এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার প্রযুক্তিগত উপাদানের অংশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জীবজগৎ কোন ধরনের উপাদান?
(ক) প্রাকৃতিক (খ) সামাজিক (গ) জৈবিক (ঘ) প্রযুক্তিগত

২। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত কোন ধরনের উপাদান?
(i) প্রাকৃতিক
(ii) জৈবিক
(iii) প্রযুক্তিগত
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i ও ii

৩। নিচের কোন শব্দযুগল প্রযুক্তিগত উপাদানের অংশ?
(i) গাছপালা ও মোবাইল ফোন
(ii) মানুষ ও ফেইসবুক
(iii) কম্পিউটার ও ইমেইল
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.৪ সামাজিক পরিবর্তন : বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়ন
Social Change : Evolution, Progress and Development

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়নের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়নের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিবর্তন, প্রগতি, উন্নয়ন, পরিবর্তন ইত্যাদি।

বিবর্তন

বিবর্তন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Evolution যা ল্যাটিন শব্দ Evolvere থেকে এসেছে যার অর্থ 'বিকাশ সাধন' অথবা 'উন্মোচন'। এটি প্রবৃদ্ধির চেয়েও ব্যাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রবৃদ্ধি যেখানে পরিবর্তনের দিকে নির্দেশ এবং সংখ্যাগত ধারণা প্রদান করে বিবর্তন সেখানে পরিবর্তনের আকৃতিগত এবং কাঠামোগত দিক নির্দেশ করে। বিবর্তন বলতে আমরা পরস্পর সম্পর্কিত একটি সত্ত্বার সামগ্রিক ব্যবস্থাকে বুঝি যা সুপ্ত ও প্রকাশ্য দুই অবস্থাতেই পাওয়া যায় এবং যা প্রাকৃতিক, জৈবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারার বিকাশ সাধন করে। বিবর্তন প্রত্যয়টি সাধারণত জীবদেহের অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। তবে সমাজবিজ্ঞানে শব্দটি কোনো সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক রূপান্তরকে বোঝাবার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানে বিবর্তনের এ ধারণাটি সর্বপ্রথম জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ভনবেয়ার প্রবর্তন করেন, যা পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার, জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন, নৃবিজ্ঞানী স্যার ই বি টাইলর, মর্গান ও অন্যান্যদের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে।

মানব সমাজ বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আজকের এই বর্তমান রূপে পৌঁছেছে। সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক বিবর্তনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। যেমন: ডুর্খেইম (Durkheim) এর মতে, মানব সমাজ বিবর্তনের মাধ্যমে 'যান্ত্রিক' পর্যায় থেকে 'জৈবিক পর্যায়ে' উত্তরণ ঘটে। প্রাথমিক পর্যায়ে মানব সমাজের সামাজিক সংহতি ছিল খুবই শক্তিশালী। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমবিভাজনের ফলে সামাজিক সংহতি দুর্বল হয়ে সমাজে জৈবিক সংহতির সৃষ্টি হয়। বার্নস (Bornes) এর মতে, মানব সমাজ বিবর্তনের ধারায় আদিম থেকে পশুচারণ এবং ক্রমান্বয়ে কৃষি এবং শিল্প সমাজে রূপান্তর হয়েছে। কিন্তু কার্ল মার্কস এর মতে, মানব সমাজ আদিম সাম্যবাদী সমাজ হতে দাস সমাজ হয়ে সামন্তবাদকে পাড়ি দিয়ে পুঁজিবাদে বিবর্তিত হয়েছে যার সর্বশেষ পর্যায় হলো আধুনিক সাম্যবাদ। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানী Morgan সমাজ ব্যবস্থাকে বন্যদশা, বর্বর দশা এবং সভ্যতা (Civilization) এ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। পরিবর্তনের বিভিন্ন ধাপকে বোঝাবার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা বিবর্তন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে থাকেন।

স্পেনসার (Spencer) মতে, সমাজ সহজ সরল অবস্থা থেকে একটি জটিল অবস্থায় সমাজের পরিবর্তন হয়। স্পেনসার এর বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী, একটি মুরগির ডিম যেভাবে ছানাতে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ একটি মুরগীতে রূপান্তরিত হয় সমাজও তেমনি বিবর্তিত হয় যা সমাজ কাঠামোর ক্রমশ রূপান্তরকে নির্দেশ করে। তাঁর মতে, সমাজ অতি সহজ কাঠামো থেকে পরিবর্তিত হয়ে ক্রমশ জটিল কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ চার্লস ডারউইন তাঁর 'Origin of the Species' গ্রন্থে প্রাণি জগতের বিকাশকে বিবর্তন বলেছেন। ডারউইনের 'বির্বতনবাদ'কে আমলে নিয়ে লুডইগ গোমপ্লোইজ (Ludwig Gumplowich) মনে করেন যে, মানব সমাজ বিবর্তনের ধারায় চলে এসেছে। তাঁর মতে 'বিবর্তন' শব্দটি 'আমূল পরিবর্তন' কে নির্দেশ কর। তিনি আরো বলেন যে, বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জগৎ সহজতর স্তর থেকে জটিলতর স্তরে যায়।

প্রায় সকল সমাজবিজ্ঞানীই ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, বিবর্তনের মাধ্যমে মানব সমাজ আজকের এ পর্যায়ে এসেছে। বিবর্তনে সমাজকাঠামো থেকে শুরু করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্তন হয়েছে। আদিম কালের একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আধুনিক যুগের একটি প্রতিষ্ঠানের তুলনা করলে তা পরিস্কার হয়ে যাবে। সামাজিক বিবর্তনে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ দুটোই দায়ী।

উন্নয়ন

উন্নয়ন শব্দটি বিবর্তন শব্দের চেয়ে খুব একটি বেশি সুস্পষ্ট নয়। সাধারণত যখন সামাজিক প্রপঞ্চসমূহ ব্যাখ্যা করা হয় তখন এদের অস্পষ্টতা ধরা পড়ে। উন্নয়ন প্রত্যয়টির সাথে 'জ্ঞানের বিকাশ' এবং 'প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি' প্রত্যয় দুটির ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান (সেন ও নাথ: ২০১৩)। সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণে উন্নয়ন প্রত্যয়টির প্রয়োগ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বর্তমানে 'উন্নয়ন' শব্দটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন: শিল্পায়িত সমাজ এবং কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য এবং কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও নগরায়ন। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শুধু রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন দ্বারা সমাজের উন্নয়ন হবে এমনটি ভাবার অবকাশ নেই। সমাজবিজ্ঞানী হবহাউজ তাঁর Social Development (1924) গ্রন্থে উন্নয়নের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। যথা- মাত্রা বা আয়তনগত বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, পারস্পরিকতার সম্প্রসারণ এবং স্বাধীনতা। তারঁ মতে, এসব জৈবিক বিবর্তনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। অন্যদিকে, হার্বার্ট স্পেনসার ও এমিল ডুর্খেইম উন্নয়নের তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে আয়তনগত বৃদ্ধির গুরুত্বকেই প্রাধান্য দেন। হার্বার্ট স্পেনসার, এমিল ডুর্খেইম, হবহাউজ, ম্যাকাইভার এবং পেজ তাঁদের রচনাসমূহে সামাজিক পৃথকীকরণের মাত্রাকে উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

সমাজবিজ্ঞানীরা 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টিকে দুটি ক্ষেত্রে প্রত্যয়টি ব্যবহার করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানী বটোমোরের মতে এই দুটি প্রত্যয় হল ঃ ১) জ্ঞানের বিকাশ এবং ২) কারিগরি ও অর্থনৈতিক দক্ষতা।

সাধারণত, সামাজিক 'উন্নয়ন' পরিমাপ করতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়-

১) সামাজিক সংহতির দৃঢ়তা;
২) সমাজের শাখা প্রশাখার দক্ষতা ও কর্ম ক্ষমতার উন্নতি;
৩) এসব শাখা-প্রশাখার মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ।

জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্যগতমান, শিক্ষার মান, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা, উৎপাদিত সম্পদের সঠিক বন্টন ও উপভোগ, ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ এবং প্রযুক্তির উন্নতির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার ইত্যাদি উন্নয়ন পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

প্রগতি

সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক উন্নয়নের ধারণা দুইটি প্রগতির ধারণার সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজবিজ্ঞানীগণ প্রগতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে প্রধানত ছয়টি উপাদানের নাম উল্লেখ করেছেন। যথা: (ক) মানুষের মর্যাদার উন্নয়ন, (খ) প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, (গ) আধ্যাত্মিক অন্বেষা ও সত্যানুসন্ধানের জন্য ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা, (ঘ) সৃজনশীলতার স্বাধীনতা এবং প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্টির নান্দনিক উপভোগের স্বাধীনতা, (ঙ) এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যা পূর্বোক্ত মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায় এবং (চ) এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা, মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাধীনতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ন্যায় বিচার ও সামাজিক সমতা সুনিশ্চিত করে (সেন ও নাথ: ২০১৩)। তাঁদের মতে, সমাজ সবসময় প্রগতির পথে নাও চলতে পারে। বিবর্তনই সর্বজনস্বীকৃত, প্রগতি নয়। প্রগতিকে পরিমাপ করতে গেলে অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট মাপকাঠিকে দিয়েই তা নির্ধারণ করতে হবে। আর এ মাপকাঠি হলো একটি আদর্শায়িত বিষয়, যা মোটেও বস্তুনিষ্ট নয়। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক প্রগতি নির্ধারণে একটি মাত্র মাপকাঠিই যথেষ্ট নয়। কারণ সমাজ একটি জটিল সত্ত্বা, যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে গঠিত। কখনো কখনো বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে অপর একটি নতুন সমাজের রূপ লাভ করতে পারে। তবে এ ধরনের পরিবর্তন পূর্ব পরিকল্পিত নয় এবং এর জন্য কোনো পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয় না।

অগাস্ট কোঁৎ (August Comte) মানব চিন্তার তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। যথা: ধর্ম-কেন্দ্রিক (Theological), অধিবিদ্যাগত (Metaphysical) এবং দৃষ্টবাদী (Positive) স্তর। মানুষ ধর্ম- কেন্দ্রিক থেকে অধিবিদ্যাগত চিন্তার পর্যায় পার হয়ে সবশেষে দৃষ্টিবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে যা সামাজিক প্রগতিকে নির্দেশ করে। সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) জীবদেহের সাথে সমাজদেহের তুলনা করে বলেন যে, জীবদেহ ও মানবদেহ উভয়ই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। জীবজগৎ ও সমাজ জগতের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই বিদ্যমান থাকায় জীববিজ্ঞানে ব্যবহৃত মাপকাঠি দিয়ে সামাজিক প্রগতিকে পরিমাপ করার যৌক্তিকতা রয়েছে।

পরিবর্তন

বিবর্তন, উন্নয়ন এবং প্রগতি প্রত্যয় তিনটি নিয়ে উপরের আলোচনার মাধ্যমে যে ধারণা পাওয়া গেল তা থেকে এটাই প্রতীয়মান যে, এগুলোর ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। আর এ কারণেই সমাজবিজ্ঞানীরা উক্ত জটিলতা নিরসন কল্পে যে প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন তার নাম 'পরিবর্তন'। পরিবর্তন বলতে এখানে মূলত সামাজিক পরিবর্তনকেই বুঝানোহয়েছে। সামাজিক ক্রিয়া ও সমাজ কাঠামো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় সামাজিক পরিবর্তন প্রধানত সমাজ কাঠামো এবং সামাজিক ক্রিয়ার পরিবর্তনকেই নির্দেশ করে। পরিবর্তনশীলতাই সমাজের প্রত্যাশিত লক্ষ্য। সমাজ প্রতিনিয়ত বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতির মাধ্যমে পরিবর্তিত হচ্ছে। 'বিবর্তন', ও 'প্রগতি' প্রত্যয় দুটি পরস্পর পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতির মাধ্যমেই সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**প্রগতি ও উন্নয়নের তিনটি করে পার্থক্য লিখুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বিবর্তন, উন্নয়ন, প্রগতি ও পরিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এদের যে কোনো একটির ব্যাখ্যা অন্যটির সাথে জড়িত। বিবর্তন প্রক্রিয়াটি কয়েকটি পর্যায় পার হয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। মানব চিন্তার ক্রমবিবর্তনকে প্রগতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতির মধ্য দিয়েই সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চার্লস ডারউইন একজন-
(ক) সমাজতত্ত্ববিদ
(খ) প্রাণীতত্ত্ববিদ
(গ) অর্থনীতিবিদ
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) i ও ii

২। সমাজবিজ্ঞানীরা 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টিকে কয়টি ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন?
(i) দুটি
(ii) তিনটি
(iii)চারটি
কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii
(গ) iii (ঘ) কোনটিই নয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। সামাজিক পরিবর্তন প্রত্যয়টির প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ কে করেন?
(ক) অগাস্ট কোঁতে (খ) ম্যাক্স ওয়েবার
(গ) অগবার্ণ (ঘ) কার্ল মার্কস

২। "Contemprary Sociological Theories" বইটি কার লেখা?
(ক) সরোকিন (খ) মিশেল ফুকো
(গ) মর্গান (ঘ) ওয়েস্টারমার্ক

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বচনী প্রশ্ন

৩। সমাজবিজ্ঞানী জিন্সবার্গ সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বুঝিয়েছেন?
(i) সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন
(ii) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন
(iii) প্রযুক্তিগত পরিবর্তন
সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রফিক আর শফিক দুই বন্ধু। তারা প্রায়ই বিভিন্ন তর্কে লিপ্ত হয়। তাদের আজকের তর্কে সমাজের এই অবস্থানে আসার পেছনে বিভিন্ন যুক্তি স্থান। রফিক মনে সমাজ প্রাকৃতিক ভাবেই এ পর্যায়ে এসেছে। কিন্তু শফিক মনে করেন সমাজ এই অবস্থায় আসার পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানের অবদান। তবে তারা উভয়েই মনে সামাজিক পরিবর্তনে বিবর্তন, প্রগতি, উন্নয়ন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১) সামাজিক পরিবর্তন কী?
২) প্রগতি বলতে কী বোঝেন?
৩) উদ্দীপকের আলোকে সামাজিক পরিবর্তনে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
৪) উপরের উদ্দীপকের আলোকে বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়নের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২ ঃ ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪ ঃ ১। খ ২।ক

সামাজিক সমস্যা
Social problem

ইউনিট ১৩

'সামাজিক সমস্যা' একটি চিরন্তন এবং আপেক্ষিক বিষয়। প্রতিটি সমাজেই কিছু না কিছু সমস্যা থাকে। মধ্যযুগের সমাজে এক ধরনের সমস্যা আবার উত্তর-আধুনিক সমাজে ভিন্নতর কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে দরিদ্র, অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক সমস্যা থেকে উন্নত দেশের সামাজিক সমস্যা আলাদা। কিন্তু 'সমস্যামুক্ত সমাজ' নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসরমান একটি দেশ। এখানে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এর প্রভাব পড়ছে সমাজে। দেখা যাচ্ছে নানাবিধ নতুন নতুন সমস্যা। তবে চিরায়ত বাংলাদেশে দীর্ঘকালের কিছু সামাজিক সমস্যা রয়েছে যা থেকে আমরা এখনো পরিত্রাণ পায়নি। যেমন: দারিদ্র্য। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও দারিদ্র্যকে পুরোপুরি দূর করা যায়নি। দারিদ্র্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব। সীমিত ভূখণ্ডে অধিক জনসংখ্যা, নিরক্ষরতা এবং কর্মমুখী শিক্ষার অভাব বেকারত্ব হ্রাসের অন্তরায়। অধিক জনসংখ্যাও বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সামাজিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। মাদকাসক্তি, দুর্নীতি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা পরিবর্তিত সমাজের অনস্বীকার্য বাস্তবতা। এসব সমস্যার নানা কারণ যেমন আছে, তেমনি আছে প্রতিকার। এই ইউনিটে নির্বাচিত কিছু সামাজিক সমস্যা, এর কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৮ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৩.১: সামাজিক সমস্যা
পাঠ ১৩.২: দারিদ্র্য
পাঠ ১৩.৩: দারিদ্রের কারণ ও দারিদ্র্য নিরসনের উপায়
পাঠ ১৩.৪: বেকার সমস্যা
পাঠ ১৩.৫: জনসংখ্যা সমস্যা
পাঠ ১৩.৬: অধিক জনসংখ্যার প্রভাব
পাঠ ১৩.৭: মাদকাসক্তি
পাঠ ১৩.৮: দুর্নীতি

পাঠ-১৩.১ সামাজিক সমস্যা
Social problem

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- সামাজিক সমস্যার কারণ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক সমস্যা।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

সমাজে মানুষ কতগুলো স্থায়ী ব্যবস্থা তথা সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় জৈবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনসমূহ মিটিয়ে থাকে। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি সব সময় সাবলিল থাকে না। সেখানে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যাতে সমাজের একটি বড় অংশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং মানুষ বিপন্ন বোধ করে। সমাজে কোনো বিষয়ে এরূপ পরিস্থিতি তৈরি হলে তাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা হচ্ছে সমাজের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষের জন্য ক্ষতিকর, অস্বস্তিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ পরিস্থিতি।

সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা (Definition of social problem)

সমাজবিজ্ঞানী হর্টনের (P. B. Horton) মতে, "সামাজিক সমস্যা বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যা সমাজের অধিকাংশ মানুষের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং যা সমষ্টিগতভাবে মোকাবেলা করার প্রয়োজন হয়।" কোয়েনিগ (Samuel Koenig) বলেন, "সামাজিক সমস্যা হলো এমন ধরনের পরিস্থিতি বা অবস্থা যা সমাজ তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বা কল্যাণের প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করে এবং সে কারণে এগুলোর লাঘব বা উচ্ছেদের প্রয়োজন অনুভব করে।" ডেভিড ড্রেসলার বলেছেন, "সামাজিক সমস্যা হল মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট এমন একটি অবস্থা, যাকে সমাজের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিত বলে মনে করে এবং প্রতিকার বা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তা দূরীকরণে তারা বিশ্বাসী।"
সুতরাং সামাজিক সমস্যা হচ্ছে এমন একটি বিশেষ অবস্থা যা মানুষের স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত জীবন যাপন এবং সমাজের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সামাজিক সমস্যা খুব সাময়িক ঘটনা নয়; তবে এটি সমাধানযোগ্য। একটি সমস্যার সমাধান হলে সমাজে আবার নতুন কোনো সমস্যার আর্বিভাব হতে পারে।

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of social problem)

সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য কতগুলো বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে থাকেন। এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে কোনো সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন:

১। অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর: সামাজিক সমস্যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এটি এমন একটি অবস্থা যা মানুষের বাঞ্ছিত ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধার সৃষ্টি করে এবং সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

২। সমাজের অধিকাংশ মানুষকে প্রভাবিত করে: কোনো সামাজিক অবস্থা যখন সমাজের অনেক মানুষকে প্রভাবিত এবং ক্ষতিগ্রস্থ করে কেবল তখনই তাকে সামাজিক সমস্যারূপে গণ্য করা হয়।

৩। জনগণের সচেতনতা: যে সমস্যা সম্পর্কে সবাই জানে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের চেষ্টা করে তাকে সামাজিক সমস্যা বলে। তবে সমাজের অধিকাংশ মানুষ কোনো সমস্যা সম্পর্কে সচেতন না হলেও তা সামাজিক সমস্যা হতে পারে। যেমন: মধ্যযুগে বাল্যবিবাহ কিংবা নিরক্ষরতা সম্পর্কে মানুষ তেমন সচেতন ছিল না। কিন্তু বাল্যবিবাহ ও নিরক্ষরতার ক্ষতিকর প্রভাব ছিল এবং এগুলো তখনো সামাজিক সমস্যাই ছিল।

৪। সমাধান যোগ্যতা: কারণ নির্ণয় করে সামাজিক সমস্যার সমাধান দেয়া সম্ভব। সমাধান সম্ভব নয়– এমন কোনো বিষয়কে সামাজিক সমস্যা বলে বিবেচনা করা যায় না। যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাক সামাজিক সমস্যা নয়।

৫। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা: সামাজিক সমস্যাগুলো একটি অপরটি দ্বারা প্রভাবিত। যেমন দরিদ্রতার ফলে স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেয়। আবার স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি কর্মক্ষমতা হারিয়ে দরিদ্র হয়ে পড়ে।

৬। সমাজ থেকে উদ্ভূত: প্রতিটি সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকেই উদ্ভুত এবং এর পেছনে যুক্তিসঙ্গত বাস্তব কারণ থাকে। এ কারণসমূহ প্রধানত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। সম্পদের অপ্রতুলতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে সামাজিক সমস্যা জন্মলাভ করে।

৭। স্থায়িত্ব: সামাজিক সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর স্থায়িত্ব। সামাজিক সমস্যা চিরস্থায়ী না হলেও একটানা এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। ক্ষণস্থায়ী এবং অনিয়মিত কোনো সামাজিক বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাকে সামাজিক সমস্যা বলা যায় না।

সামাজিক সমস্যার কারণ (Causes of social problems)

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি, তেমনি এর কারণও বহুমুখী। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কতগুলো কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো:

১। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা: বাংলাদেশ প্রায় দু'শ পনর বছর পরাধীন ছিল। ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে যে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ইত্যাদি মূলত দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার ফসল।

২। মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণ: বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা। ২০২৪ সালেও দেশের প্রায় ৫.৬ শতাংশ মানুষ হতদরিদ্র, যাদের পক্ষে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ অসম্ভব। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অভাবে সমাজে নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৩। জনসংখ্যা বৃদ্ধি: বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ জনসংখ্যা স্ফীতি। বাংলাদেশের আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং তা দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। ফলে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, নিরক্ষরতা ইত্যাদি সমস্যা নিরসন কঠিন হয়ে পড়ে।

৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ: অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, নদীর ভাঙ্গন, বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগে প্রতি বছরই দেশের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সমাজে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৫। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন: অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে সমাজ জীবনে নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতা দেখা দেয়। কিশোর অপরাধ, পতিতাবৃত্তি, বস্তিসমস্যার মূলে রয়েছে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন।

৬। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা: স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজমান। রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ-মৌলবাদী অপতৎপরতা বেড়ে যায়।

৭। সমস্যার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও প্রতিক্রিয়া: একটি সমস্যা অপর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্য সমস্যাকে জটিল করে তোলে। যেমন, দারিদ্র্যের ফলে নিরক্ষরতাসহ অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তেমনি নিরক্ষরতা ও অন্যান্য সমস্যাও দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

৮। সম্পদের অসম বণ্টন: বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অনেক বেশি। সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

৯। অপসংস্কৃতির প্রভাব: আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মুক্ত গণ্যমাধ্যমের কল্যাণে আমাদের সংস্কৃতিতে অপসংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব পড়েছে। ফলে আমাদের কিশোর ও তরুণ সমাজের অনেকে বিপথগামী হচ্ছে।

১০। আন্তর্জাতিক চক্র: অস্ত্র, মাদক ও স্বর্ণ চোরাচালানের আন্তর্জাতিক চক্র বাংলাদেশকে রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের অপচেষ্টায় বাংলাদেশও মাদকের বড় বাজারে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক চত্রের প্রভাবে বাংলাদেশে নারী ও শিশু পাচার, মানব পাচারসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার: বাংলাদেশে এখনো প্রায় ২২ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)। দেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অজ্ঞ, অসচেতন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এ কারণে স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, যৌতুক প্রথাসহ বহু সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক সমস্যার কারণগুলো চিহ্নিত করুন	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজের এক অনিবার্য বাস্তবতা হচ্ছে সামাজিক সমস্যা। উন্নত কিংবা দরিদ্র, শিক্ষিত কিংবা নিরক্ষর, আধুনিক কিংবা অনগ্রসর যেকোনো সমাজেই সামাজিক সমস্যার অস্তিত্ব রয়েছে। তবে সময় ও স্থানভেদে সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি আলাদা। আবার অনেকে সময় একটি সমস্যা নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন অধিক জনসংখ্যা কিংবা দারিদ্র্য আরো অনেক সামাজিক সমস্যা তৈরি করে। বস্তুত সামাজিক সমস্যার কারণ বহুমুখী। এর সমাধানে নিতে হবে সমন্বিত এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক সমস্যা নয়।

(ক) দারিদ্র্য (খ) বাল্যবিবাহ

(গ) বিদ্যুৎসঙ্কট (ঘ) নিরক্ষরতা

২। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের কত শতাংশ মানুষ হতদরিদ্র?

(ক) ১১.৯ শতাংশ (খ) ১৩ শতাংশ

(গ) ১৩.৯ শতাংশ (ঘ) ১৪.৯ শতাংশ

৩। বাংলাদেশে একাধিক সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ি কোনটি?

(ক) নিরক্ষতা (খ) দারিদ্র্য

(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঘ) অধিক জনসংখ্যা

পাঠ-১৩.২ দারিদ্র্য
Poverty

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দারিদ্র্যের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- দারিদ্র্যের ধরনগুলো লিখতে পারবেন;
- দারিদ্র্যের কারণ এবং দারিদ্র্য নিরসনের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দারিদ্র্য।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি ব্যাপক ও জটিল সামাজিক সমস্যা। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনের কোনোদিকই এর কবল থেকে মুক্ত নয়। দারিদ্র্য নিরসন করা সম্ভব না হলে আমাদের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে। তাই দারিদ্র্য নিরসনে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা (Definition of poverty)

দারিদ্র্য হচ্ছে অর্থনীতির একটি নেতিবাচক অবস্থা। মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, অসচ্ছলতা ও অক্ষমতা হলো দারিদ্র্য। আভিধানিক অর্থে, 'দারিদ্র্য' বলতে অভাব বা অনটনকেই বুঝায়। দারিদ্র্য মানে মৌলিক সামর্থ্যের অভাব। ন্যূনতম খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। আয়ের স্বল্পতা, জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থতা, নিরাপত্তাহীনতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগের অভাবের মাধ্যমে দারিদ্র্যের প্রকাশ ঘটে।

দারিদ্র্য পরিমাপে এবং এর স্বরূপ বিশ্লেষণে 'দারিদ্র্য সীমা' ধারণাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বব্যংকের প্রতিবেদনে দৈনিক যাদের উপার্জন ২.৫ মার্কিন ডলারের (৩০০ টাকা) কম তাদেরকে দরিদ্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী গিলিনের মতে, "দারিদ্র্য এমন একটি অবস্থা যাতে কোনো ব্যক্তি তার সমাজের অন্যদের সমমানে জীবন যাপন করতে পারে না এবং সে কারণে কার্যকর সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা এবং দক্ষতা অর্জনে অক্ষম।"

একটি দারিদ্র্য পীড়িত সমাজে কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন: ক্ষুধার্ত মানুষ আছে, তাদের পর্যাপ্ত খাদ্য নেই; মানুষের প্রয়োজনীয় বস্ত্র, মানসম্মত বাসস্থান নেই; রোগাক্রান্ত মানুষ আছে, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা/সক্ষমতা নেই; কর্মক্ষম মানুষ আছে, তাদের কর্মসংস্থান নেই; বাজার আছে, ব্যবসায়ের পুঁজি নেই; দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা নেই, কথা বলার মানুষ আছে, বাকস্বাধীনতা নেই; দেশে সম্পদ আছে কিন্তু এর যথাযথ ব্যবহার নেই। সার্বিক বিচারে সম্পদ, শিক্ষা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে দারিদ্র্য। বস্তুত দারিদ্র্য কেবল আর্থিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত নয়। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা হচ্ছে দারিদ্র্য।

দারিদ্র্যের ধরন (Types of poverty)

সংজ্ঞা অনুসারে দারিদ্র্যকে তিনটি প্রধান স্তরে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হচ্ছে: (১) সাধারণ অর্থে দারিদ্র্য, (২) আপেক্ষিক দারিদ্র্য এবং (৩) চরম দারিদ্র্য।

১। সাধারণ অর্থে দারিদ্র্য (General poverty)**:** সাধারণ অর্থে দারিদ্র্য হচ্ছে অর্থনীতির এমন একটি পর্যায় বা অবস্থা যেখানে ব্যক্তি বা পরিবার কোনোমতে তাদের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করতে সক্ষম হয়। দৈনন্দিন জীবনের ন্যূনতম চাহিদার অতিরিক্ত কিছু তারা মেটাতে পারে না বা সচ্ছল জীবনযাপন করতে সক্ষম হয় না।

২। আপেক্ষিক দারিদ্র্য (Relative poverty)**:** সমাজের অন্যদের অপেক্ষা অনগ্রসর বা নিম্নতর আর্থিক অবস্থাকে আপেক্ষিক

দারিদ্র্য বলা হয়। উন্নত জীবনযাপনের উপকরণ সংগ্রহের আর্থিক ক্ষমতার তারতম্য হল আপেক্ষিক দারিদ্র্য। যেমন: একজন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বাস করে; অপরজনের ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা আছে, এর বেশি তার সঙ্গতি নেই। এখানে দ্বিতীয়জন প্রথমজন অপেক্ষা দরিদ্র। আবার পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশের দারিদ্র্য এবং বর্তমানের দারিদ্র্যের রূপ এক নয়। তেমনি কোনো উন্নত দেশের দারিদ্র্য আর বাংলাদেশের দারিদ্র্যেও ভিন্নতা রয়েছে। এটিও আপেক্ষিক দারিদ্র্য।

৩। চরম দারিদ্র্য (Absolute poverty)**:** চরম দারিদ্র্য বলতে এমন একটি আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বোঝায় যেখানে মানুষ মৌলিক চাহিদাসমূহ সঠিকভাবে পূরণ করতে পারে না। চরম দরিদ্র মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, সক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকে না। এমনকি চরম দরিদ্র মানুষ দৈনিক ৩০০ টাকা উপার্জন করতে পারে না। চরম দারিদ্র্যের পরবর্তী স্তর হল নিঃস্বতা। নিঃস্ব মানুষের অবলম্বন ভিক্ষাবৃত্তি।

শিক্ষার্থীর কাজ	দারিদ্র্যের ধরনগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য। দারিদ্র্য হচ্ছে মানুষের সুযোগ, সক্ষমতা ও স্বাধীনতার অভাব। দারিদ্রের কারণে মানুষ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। দারিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, খাদ্য, পুষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যা তৈরি করে। দারিদ্র্যের কয়েকটি ধরন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে সাধারণ দারিদ্র্য, আপেক্ষিক দারিদ্র্য এবং চরম দারিদ্র্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দৈনিক কত টাকার কম উপার্জন করলে তাকে হতদরিদ্র বলা হয়?

(ক) ৯০ টাকার কম (খ) ১০০ টাকার কম

(গ) ১২৫ টাকার কম (ঘ) ১৫০ টাকার কম

২। দারিদ্র্য প্রধানত কয় ধরনের/কয় স্তরের?

(ক) দুই ধরনের/স্তরের (খ) তিন ধরনের/স্তরের

(গ) চার ধরনের/স্তরের (ঘ) পাঁচ ধরনের/স্তরের

পাঠ-১৩.৩ দারিদ্র্যের কারণ ও দারিদ্র্য নিরসনের উপায়
Causes of poverty and means of poverty alleviation

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- দারিদ্র্যের কারণসমূহ বলতে পারবেন;
- দারিদ্র্য নিরসনের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গ্রামীণ দারিদ্র্য, নগর দারিদ্র্য, দারিদ্র্য নিরসনের উপায়।

দারিদ্র্যের কারণ (Causes of poverty)

দারিদ্র্য কোনো স্বয়ংসৃষ্ট সমস্যা নয়। নানা কারণে একটি দেশ বা সমাজ দারিদ্র পীড়িত হয়। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ প্রায় সোয়া দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন। দীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনায় বাংলাদেশ যেমন ক্রমশ সম্পদহীন হয়েছে, তেমনি সক্ষমতা অর্জনেও পিছিয়ে পড়েছে। আবার গ্রামীণ ও নগর দারিদ্র্যের কারণ সব সময় এক ও অভিন্ন নয়। এখানে গ্রামীণ ও নগর দারিদ্র্যের কারণগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো।

গ্রামীণ দারিদ্র্যের কারণ	নগর দারিদ্র্যের কারণ
১। সনাতন কৃষি ব্যবস্থা;	১। শিল্পে অনগ্রসরতা;
২। কৃষি ভূমির স্বল্পতা;	২। চাহিদা ও যোগ্যতানুসারে কর্মসংস্থানের অভাব;
৩। কুসংস্কার ও ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীলতা;	৩। অধিক জনসংখ্যা;
৪। শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব;	৪। সম্পদের অসম বণ্টন;
৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগ;	৫। শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব;
৬। সম্পদের সদ্ব্যবহারের অভাব;	৬। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা;
৭। কৃষিবহির্ভুত পেশায় কাজের সুযোগের অভাব;	৭। উদ্ভাবনী উদ্যোগের অভাব;
৮। পুঁজি ও উদ্যোগের অভাব; ইত্যাদি।	৮। দরিদ্র্যদের পুনর্বাসনের অভাব; ইত্যাদি।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় (Way of poverty alleviation in Bangladesh)

গত তিন দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছে। এ সময় চরম দারিদ্র্যের হার ৩৩ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ৩৩০ ডলার থেকে প্রায় ২,৭৮৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। কৃষির পরিবর্তে জিডিপিতে শিল্পের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, আইসিটিসহ নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে তরুণ জনশক্তির সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখানে দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। সামাজিক গবেষণা: সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে সঠিক তথ্য উদঘাটন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের কার্যকর উপায় বের করতে হবে।

২। কৃষি উন্নয়ন: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখনো কৃষির ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ১৭ কোটি মানুষের এই দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য ছাড়াও অর্থকরী ফসল, শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে কৃষি উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন অপরিহার্য।

৩। শিল্পায়ন: দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য শিল্পায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশে যতবেশি শিল্পায়ন হয়েছে সে দেশ ততবেশি উন্নত। শিল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানুষের আয় বৃদ্ধি দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৪। সেবাখাতের সম্প্রসারণ: বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনের জন্য সেবাখাতের সম্প্রসারণ অপরিহার্য। পরিবহন, ব্যাংক-বীমা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।

৫। প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার: বঙ্গোপসাগরে বিরাট মৎস্যভাণ্ডার, দেশের উর্বর ভূমি, জলাশয়, গ্যাসসহ খনিজ সম্পদের কার্যকর ও সমন্বিত ব্যবহার দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৬। জনশক্তির উন্নয়ন: দেশের বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম লোকের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে উৎপাদনশীল জনশক্তিতে পরিণত করা যায়। দেশে-বিদেশে এদের কর্মসংস্থান হলে দেশের দারিদ্র্য কমবে।

৭। নারীদের কর্মসংস্থান: দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাদের জন্য শিক্ষা এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হলে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।

৮। হতদরিদ্র ও প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন: হতদরিদ্র ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী কর্মসংস্থান তৈরি করে সমাজের মূলধারায় পুনর্বাসন করা করা হলে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

৯। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: দুস্থ, দরিদ্র, অক্ষম, অসহায় ও বয়স্ক মানুষ এবং দুর্যোগ-দুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান ও পুনর্বাসন কর্মসূচি দারিদ্র্য-বিনাসী কর্মসূচি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

১০। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদন ও কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

১১। ক্ষুদ্র ও উদ্ভাবনী উদ্যোগে সহায়তা প্রদান: ক্ষুদ্র ও উদ্ভাবনী উদ্যোগে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে।

১২। গণতন্ত্র ও সুশাসন: ধারাবাহিক ও গতিশীল গণতন্ত্রই পারে দেশকে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত বন্দরে নিয়ে যেতে। সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম কার্যকরী কৌশল।

শিক্ষার্থীর কাজ	দারিদ্র্য দূরীকরণে ১০টি সুপারিশ লিপিবদ্ধ করুন	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

যেকোনো সমাজের জন্য দারিদ্র্য একটি জটিল ও বহুমুখী সমস্যা। বিভিন্ন সমস্যা থেকে দারিদ্র্যের উদ্ভব হয় এবং ক্রমান্বয়ে প্রকট আকার ধারণ করে। আবার দারিদ্র্য সমাজে অনেক সমস্যার জন্ম দেয়। দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শোষণ ও বঞ্চনা, শিল্পে অনগ্রসরতা, শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব, অধিক জনসংখ্যা এবং আরো অনেক কারণে দারিদ্র্যের জন্ম হয়। আবার সামাজিক গবেষণা, কৃষির উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পের অগ্রসরতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ রাখতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি দারিদ্যের কারণ নয়।

(ক) জলবায়ুর পরিবর্তন (খ) অধিক জনসংখ্যা

(গ) সম্পদের অসম বণ্টন (ঘ) শিল্পে অনগ্রসরতা

২। নিচের কোনটি দারিদ্য নিরসনের উপায় হিসেবে কার্যকর?

(ক) জিডিপি বৃদ্ধি (খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

(গ) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি (ঘ) আধুনিকায়ন

পাঠ-১৩.৪ বেকার সমস্যা
Unemployment problem

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বেকারত্ব কী তা বলতে পারবেন;
- বেকারত্বের কারণসমূহ আলোচনা করতে পারবেন এবং
- বেকারত্ব থেকে মুক্তির উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বেকারত্ব, পূর্ণ বেকারত্ব, ছদ্ম বেকারত্ব, মৌসুমী বেকারত্ব।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সব দেশেরই বেকার সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশেরও অন্যতম সামাজিক সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব। জনসংখ্যার ঘনত্ব, সনাতন কৃষি ব্যবস্থা, শিল্প ও সেবা খাতের কাঙ্ক্ষিত সম্প্রসারণের অভাব বেকার সমস্যাকে আরো অনিবার্য করে তুলছে। প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে বেকারত্ব দেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বিপুলসংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠী দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকেও বাধাগ্রস্থ করছে।

বেকারত্বের সংজ্ঞা (Definition of unemployment)

সাধারণত কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের অভাবকে বেকারত্ব বলা হয়। সক্ষম কর্মহীন ব্যক্তি হচ্ছে বেকার। কেউ যদি ইচ্ছাপূর্বক কাজ না করে অলস-অবসর সময় কাটায় তবে তাকে বেকার বলা যায় না। সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থান না হওয়াকে বেকারত্ব বলে। অর্থাৎ কর্মক্ষম ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা হল বেকারত্ব। পঙ্গু, অক্ষম, কাজ করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির কর্মহীনতা বেকারত্বের আওতায় পড়ে না।

C. B. Mamoria-এর মতে, "Unemployment is a state of worklessness for a man fit and willing to work, that is a condition of involuntary and not voluntary idleness."

অধ্যাপক পিগুর মতে, "যখন কর্মক্ষম লোকেরা যোগ্যতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায়, অথচ কাজ পায় না, তখন সে অবস্থাকেই বেকারত্ব বলা হয়।"

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্মক্ষম মানুষ যদি প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজ পায়, তবে তাকে কর্মে নিযুক্ত ধরা যাবে। এর বাইরে যারা পড়েন তারা বেকার, অর্ধবেকার বা ছদ্মবেকার।

সুতরাং বেকারত্ব বলতে এমন এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে বুঝায়, যেখানে প্রচলিত মজুরিতে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষম জনগণ তাদের যোগ্যতা অনুসারে কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। যারা এ বঞ্চনার শিকার তারা হচ্ছে বেকার। উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে বেকারত্বের কতগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেমন: ক) কাজ করার সক্ষমতা আছে কিন্তু কাজ নেই, খ) প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়া, গ) কর্মসংস্থানের অভাব থাকা, ঘ) প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কাজের সুযোগ না পাওয়া ইত্যাদি।

বেকারত্বের প্রকারভেদ (Types of unemployment)

বেকারত্ব বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন:

১। **পূর্ণ বেকারত্ব:** কর্মসংস্থানের অভাবে সম্পূর্ণ কর্মহীন অবস্থা হলো পূর্ণ বেকারত্ব। পূর্ণ বেকাররা বেঁচে থাকার জন্য অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

২। **আংশিক/খণ্ড বেকারত্ব:** এ শ্রেণির বেকাররা পূর্ণকালীন, অর্থাৎ দৈনিক ৮ ঘণ্টা হারে স্থায়ী কোনো কাজ পায় না।

৩। **মৌসুমী/সাময়িক বেকারত্বঃ** এ শ্রেণির লোকেরা বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে কাজ করে, অন্য সময়ে কাজের অভাবে বেকার থাকে।

৪। **প্রচ্ছন্ন/ছদ্ম বেকারত্বঃ** কোনো কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমশক্তি নিয়োজিত থাকলে সে অতিরিক্ত শ্রমশক্তির নিয়োগকে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলা হয়। কারণ সেখানে নিযুক্ত শ্রমশক্তি অনুপাতে কাজের যোগান থাকে না।

৫। **প্রযুক্তিজনিত বেকারত্বঃ** প্রযুক্তির উন্নতিতে অনেক পণ্যের চাহিদা থাকে না। আবার প্রযুক্তির ব্যবহারে পেশারও পরিবর্তন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কিছু মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। এটিই প্রযুক্তিজনিত বেকারত্ব।

৬। **নৈমিত্তিক বেকারত্বঃ** হঠাৎ উদ্ভূত কোনো কারণে শ্রমশক্তির চাহিদা কমে গেলে কিংবা কোনো প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেলে যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয় তা হল নৈমিত্তিক বেকারত্ব।

বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণ ও প্রতিকার (Causes and Means to solve unemployment in Bangladesh)

বাংলাদেশের বেকারত্ব একদিনে কোনো একটি বিশেষ কারণে সৃষ্টি হয়নি। এর জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি অবস্থা বিশেষভাবে দায়ী। নিম্নে বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণ এবং প্রতিকার তুলে ধরা হলঃ

বেকারত্বের কারণ	বেকারত্বের প্রতিকার
১। কৃষির উপর নির্ভরশীলতা;	১। কারিগরী ও কর্মমুখী শিক্ষার সম্প্রসারণ;
২। দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা;	২। অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ;
৩। জনসংখ্যা বৃদ্ধি;	৩। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৪। কুটির শিল্পের অবলুপ্তি;	৪। শিল্পায়ন এবং সেবাখাতের সম্প্রসারণ;
৫। চাকরির মোহ;	৫। উৎপাদন ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি;
৬। বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব;	৬। নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্মসংস্থান;
৭। নিরক্ষরতা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব;	৭। জনশক্তি রপ্তানিতে কার্যকর পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান;
৮। জনশক্তি রপ্তানিতে দুর্নীতি ও অদক্ষতা;	৮। প্রযুক্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার;
৯। নারী কর্মসংস্থানের অভাব;	৯। ক্ষুদ্র এবং উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগে সহায়তা প্রদান
১০। ঘরমুখো স্বভাব ইত্যাদি।	১০। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বেকারত্বের কারণগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

কর্মক্ষম মানুষ তার প্রয়োজনে প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার চেষ্টা করেও যদি কাজের সুযোগ না পায় তবে তাকে বেকারত্ব বলে। বেকারত্ব অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও আছে। বেকারত্বের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে পূর্ণবেকারত্ব, খণ্ডবেকারত্ব, ছদ্মবেকারত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিক জনসংখ্যা, কৃষির উপর নির্ভশীলতা, শিল্পায়নের অভাব, শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতার অভাব ইত্যাদি কারণে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন বয়সের মানুষকে কর্মক্ষম বলে বিবেচনা করা হয়?
(ক) ১৮ থেকে ৬০ বছর (খ) ১৫ থেকে ৪৫ বছর (গ) ১৬ থেকে ৫০ বছর (ঘ) ২০ থেকে ৬৫ বছর

২। বেকারত্ব প্রধানত কয় প্রকার?
(ক) চার প্রকার (খ) পাঁচ প্রকার (গ) ছয় প্রকার (ঘ) সাত প্রকার

৩। বেকারত্ব দূরীকরণের সবচেয়ে ভালো উপায় কোনটি?
(ক) শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা (খ) দারিদ্র্য বিমোচন
(গ) পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা (ঘ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা

পাঠ-১৩.৫ জনসংখ্যা সমস্যা
Population problem

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জনসংখ্যা সমস্যা বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করতে পারবেন এবং
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জনসংখ্যা সমস্যা।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

কোনো দেশ বা সমাজের প্রধান উপাদান হচ্ছে জনসংখ্যা। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অনিবার্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে যেকোনো সমাজের জন্য জনসংখ্যা অপরিহার্য। কিন্তু এ জনসংখ্যাই আবার একটি সমাজ বা দেশের জন্য সমস্যা বলে বিবেচিত হতে পারে। বস্তুত জনসংখ্যা কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে অধিক জনসংখ্যা। আবার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা যায়। দক্ষ জনসম্পদ একটি সমাজের আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের সম্পদকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে মানব সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি দেশের সম্পদ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশি হয় তাহলে সেখানে জনসংখ্যা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

জনসংখ্যা সমস্যা কী (What is population problem)

সাধারণভাবে জনসংখ্যা সমস্যা বলতে কোনো দেশের প্রাপ্ত সম্পদ ও চাহিদার তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হওয়া। জনসংখ্যা তখনই সমস্যা যখন এটি কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাস ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত *'An Essay on the Principle of Population'* প্রবন্ধে বলেন, "কোনো দেশের জনসংখ্যা সে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় বেশি হলে তা জনসংখ্যা সমস্যা বা জনসংখ্যাস্ফীতি বলে।" তিনি আরও বলেন, "By nature human food increases in a slow arithmetical ratio. যেমন: ১, ২, ৩, ৪, ৫ হারে। But man himself increases in a quick geometrical progress on. যেমন: ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ হারে।" মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা। এর ফলে একটি দেশের মোট সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য থাকে। অধিক জনসংখ্যা দেশের আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তবে কেবল জনসংখ্যার আধিক্যই সমস্যা সৃষ্টি করে না, কোনো দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কম জনসংখ্যাও সমস্যার কারণ হতে পারে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অনেক দেশে জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি তাই সেখানে জনসংখ্যাস্ফীতিই অন্যতম সামাজিক সমস্যা। অন্যদিকে কানাডা, জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে, লিবিয়া ইত্যাদি দেশে প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক কম। ফলে এসব দেশে জনসংখ্যার স্বল্পতাই জনসংখ্যা সমস্যা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি (Population situation in Bangladesh)

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। আয়তনের তুলনায় দেশটির জনসংখ্যা অনেক বেশি। বিশ্বের অষ্টম এবং এশিয়ার পঞ্চম জনবহুল দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। ষাটের দশকের আগে এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক ছিল। তবে এরপর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। নিচে গত পঞ্চাশ বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১৯৬১-২০১৬)

(উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)

আদমশুমারির সন	মোট জনসংখ্যা	মোট বৃদ্ধি	বৃদ্ধির শতকরা হার
১৯৬১	৫,৫২,২২,৬৬৩	১,১০,৫৬,৯২৩	২.২৬
১৯৭৪	৭,৬৩,৯৮,০০০	২,১১,৭৫,৩৩৭	২.৪৮
১৯৮১	৮,৯৯,১২,০০০	১,৩৫,১৪,০০০	২.৩৫
১৯৯১	১১,১৪,৫৫,১৮৫	২,১৫,৪৩,১৮৫	২.১৭
২০০১	১২,৯২,৪৭,২৩৩	১,৬৮,৪৬,২৫৪	১.৪৭
২০১১	১৪,৯৭,৭০,০০০	২,০৫,২২,৭৬৭	১.৩৭
২০২২	১৬,৯৮,২৮,৯১১	২,০০,৫৮,৯১১	১.৩৭

১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী দেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করে ১১৭৭ জন। বর্তমানে এ হার প্রায় ১২০০ জনের কাছাকাছি। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। স্বল্পয়াতনের এ দেশে বিপুল জনসংখ্যা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যা তৈরি করে। আবার জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব হলে দেশের উন্নয়নের চাকা আরো সচল হতে পারে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ (Causes of population explosion)

যেকোনো দেশের জনসংখ্যার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মানুষের জৈবিক আন্তঃক্রিয়ার পাশাপাশি সামাজিক, ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধ বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। ভৌগোলিক কারণ: ভৌগোলিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং এর আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। ফলে এ দেশের মানুষ কম বয়সে প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

২। খাদ্যাভ্যাস: বাংলাদেশের মানুষ শ্বেতসার ও আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন ভাত, গম, আলু, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি গ্রহণে অভ্যস্ত। এ ধরনের খাবার মানুষের প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব অনস্বীকার্য।

৩। জন্ম ও মৃত্যুহারের ব্যবধান: জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যুহারের ব্যবধান। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য এবং মানুষের সচেতনতার ফলে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুহার যেমন হ্রাস পেয়েছে, তেমনি মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ: একজন নারী প্রজননক্ষম বয়সের পুরোটাই দাম্পত্য জীবনে অতিবাহিত করলে তার অধিক সন্তান জন্ম দেয়ার সুযোগ অনেক বেশি। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এবং একাধিক বিয়ে হয় তাহলে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫। দারিদ্র্য: দরিদ্র মানুষের বিনোদনের ব্যবস্থা কম। স্বামী-স্ত্রীর যৌনতাই তাদের প্রধান বিনোদন। ডি ক্যাস্ট্রো বলেন, "ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা তুলনামূলক বেশি"। বাংলাদেশেও দরিদ্র মানুষ অধিক সন্তান জন্ম দেয়।

৬। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাব: বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ নিরক্ষর, অজ্ঞ, অসচেতন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব ও কুফল সম্পর্কে তাদের ধারণাও সীমিত। ফলে তারা অধিক সন্তান জন্ম দেয়।

৭। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিয়ন্ত্রণকে অনেকেই ধর্মীয় মূল্যবোধ পরিপন্থী বলে মনে করে। "মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি" এ ধরনের মূল্যবোধ জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৮। পুত্র সন্তান লাভের ইচ্ছা: বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় অনেকের কাছে পুত্র সন্তানের গুরুত্ব বেশি। ফলে পুত্র সন্তান লাভের আশায় অনেকে ৩/৪ টি কন্যাসন্তানের পর ৫ম সন্তান জন্ম দিচ্ছে– যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

৯। নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবঃ বাংলাদেশে শিক্ষিত, সচেতন এবং কর্মজীবী নারীর সংখ্যা এখনো অপ্রতুল। ফলে তাদের অনেকেরই অল্প বয়সে বিয়ে হয়। সচেতনতা ও সক্ষমতার অভাবে তারা বেশি সন্তানের জন্ম দেয়।

১০। চিত্তবিনোদনের অভাবঃ দেশে স্বল্প কিংবা বিনা খরচে সুস্থ বিনোদনের অভাব রয়েছে। ফলে দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষ যৌন সম্পর্কক স্থাপনকেই তাদের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। যার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

১১। নারীর শিক্ষা, সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের অভাবঃ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে নারীর শিক্ষা, সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের অভাব। অধিক সন্তান ধারণ ও জন্মদানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অনেক নারী সচেতন নন। আবার জন্ম-নিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সন্তান ধারণের ক্ষেত্রেও অনেক নারী স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

শিক্ষার্থীর কাজ	জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যার নাম অধিক জনসংখ্যা। বস্তুত স্বল্পায়তনের এ দেশে ১৬ কোটি মানুষ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বাল্যবিবাহসহ আরো অনেক সামাজিক সমস্যা তৈরি করছে। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অসচেতনতা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামী ইত্যাদি কারণে দেশের জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে/পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে আর জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে' কে বলেছেন?

(ক) টমাস ম্যালথাস (খ) সিগমুন্ড ফ্রয়েড

(গ) কার্ল মার্কস (ঘ) ম্যাক্স ওয়েবার

২। ২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী দেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কত জন মানুষ বাস করে?

(ক) ৯৩৫ জন (খ) ১০১৫ জন

(গ) ১১০০ জন (ঘ) ১১৫০ জন।

৩। "ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা তুলনামূলক বেশি" কে বলেছেন?

(ক) টমাস ম্যালথাস (খ) সিগমুন্ড ফ্রয়েড

(গ) ডি ক্যাস্ট্রো (ঘ) বিল গেটস্

পাঠ-১৩.৬ অধিক জনসংখ্যার প্রভাব
Impact of over population

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যার প্রভাব লিখতে পারবেন;
- জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অধিক জনসংখ্যা প্রভাব, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

বর্তমানে বিশ্বের খুব কম দেশেই কাম্য জনসংখ্যা রয়েছে। কিছু দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কম জনসংখ্যা থাকলেও অধিকাংশ দেশে জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। জনসংখ্যাস্ফীতির পরবর্তী পর্যায়কে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে ১৯৭৭ সালে বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা বলেছিলেন, "পারমাণবিক যুদ্ধ ছাড়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে অন্যতম যে গুরুতর সমস্যা, তা হচ্ছে জনসংখ্যাস্ফীতি।" ম্যাকনামারার এ বক্তব্যের বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় বাংলাদেশে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। খাদ্য উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে চাপ: ১৬ কোটি মানুষের এদেশে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ মাত্র ০.২০ একর। বস্তুত স্বল্পায়তনের এ দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের খাদ্যের যোগান দেয়া খুব সহজ কাজ নয়। অধিক ও বহুমুখী উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি সাময়িকভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হলেও বাংলাদেশে খাদ্যের উপর বাড়তি চাপ একটি অনিবার্য বাস্তবতা।

২। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে ঘাটতি: বিপুল জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশেরই বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তাদের সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রায়ই অপুরণীয় থেকে যায়।

৩। দারিদ্র্য: বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ১৮.৭ শতাংশ মানুষ দরিদ্র্য, এর মধ্যে হতদরিদ্র হচ্ছে প্রায় ৫.৬ শতাংশ মানুষ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪)। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে জনসংখ্যাস্ফীতি। অধিক মানুষের শিক্ষা, দক্ষতার অভাবে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান হয় না। তাদের জীবনমান নিম্নমুখী এবং মৌলিক চাহিদাও থেকে যায় অপূর্ণ। ফলে আয়তনের তুলনায় অধিক জনসংখ্যাই বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান অন্তরায়।

৪। বেকারত্ব বৃদ্ধি: বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৩.৩ শতাংশ বা ৫০ লক্ষ প্রায়) প্রত্যাশিত কাজ থেকে বঞ্চিত। দেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। অধিক জনসংখ্যাই বেকারত্বের প্রধান কারণ।

৫। দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সমস্যা: কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অধিকতর ব্যয়বহুল এবং সুযোগও সীমিত। ফলে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আধুনিক ও কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সত্যিই কঠিন।

৬। গৃহহীন ভাসমান মানুষের সংখ্যাধিক্য: ১৭ কোটি মানুষের সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য। শিল্পায়ন ও নগরায়ন প্রতিনিয়ত গ্রামের মানুষকে শহরমুখী করছে। কিন্তু তাদের জন্য প্রত্যাশিত কাজ এবং নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। ফলে শহরে বস্তি এবং ভাসমান মানুষের সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭। চিকিৎসা সেবায় নাজুকতা: দেশের ১৭ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবার জন্য দক্ষ জনবল, অবকাঠামো, আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৮। আবাদি জমি হ্রাস পাচ্ছে: বাড়তি জনসংখ্যার জন্য প্রতি বছর বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, শিল্প কারখানা ও

অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ আবাদি জমি ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার জমি ভাগ বাটোয়ারার কারণে জমির খণ্ডায়ন হচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়ত আবাদি জমি হ্রাস পাচ্ছে।

৯। পরিবেশ বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা: অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বাড়িঘর নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিপুল যানবাহন, গাছপালা কর্তন ও বনাঞ্চল ধ্বংস করার কারণে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। মানুষের বিপুল চাহিদা অপরিকল্পিত শিল্পায়নকে উৎসাহিত করছে। মানুষের লোভ ও অসচেতনতায় বিলুপ্ত হচ্ছে বন্যপ্রাণি ও পশুপাখি। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০। সামাজিক বিশৃঙ্খলা: জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পদ ও সুযোগ বৃদ্ধি পায় না। ফলে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে সৃষ্টি হয় বাড়তি প্রতিযোগিতা। পরিণতি হিসেবে দেখা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, কলহ-বিবাদ, খুন, মারামারি, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, হতাশা, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি।

১১। যাতায়াত ব্যবস্থায় অত্যধিক চাপ: অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমার ইত্যাদিতে স্বাভাবিক চলাচল দিন দিন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থা এবং সড়ক-মহাসড়কগুলো বিপুল জনসংখ্যার চাপ নিতে পারে না। ফলে মানুষকে অসহনীয় ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের উপায়

এখন বিশ্বের অনেক দেশই অধিক জনসংখ্যাকে আর সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করছে না। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। বাংলাদেশেও জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের নানা উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বস্তুত বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়ন বা 'উন্নয়ন-মিরাকল'র মূলে রয়েছে বিশাল জনশক্তি। দেশের অভ্যন্তরে পোশাক শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে বিশাল শ্রমশক্তি এবং বিদেশে কর্মরত প্রায় ৮০ লক্ষ কর্মজীবীর প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করছে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র প্রকল্প, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র (এমডিজি) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)- এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে নানারকম সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি একদিকে যেমন দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখছে, তেমনি নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করছে। ফলে এখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নয়, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশাল শ্রমশক্তি আগামী এক দশকে দেশের চেহারা পাল্টে দিবে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের অনেকগুলো উপায় রয়েছে। যেমন:

ক) তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা;
খ) কারিগরী ও কর্মমুখী শিক্ষার বিস্তার;
গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
ঘ) উদীয়মান শিল্প-কারখানার সাথে সঙ্গতি রেখে মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা;
ঙ) পোশাক শিল্পের জন্য দক্ষ ডিজাইনার ও প্রশিক্ষিত কারিগর তৈরি করা;
চ) দেশব্যাপী কারিগরী কলেজ, ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা এবং তরুণদেরকে চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান;
ছ) শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত সবার জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র তৈরি করা।
জ) প্রশিক্ষণ, স্বল্পসুদে ঋণদান এবং অন্যান্য পৃষ্ঠপোশকতা দিয়ে দেশের লাখ লাখ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি করা; যারা কেবল নিজেদের নয়, অন্যেরও কাজের ব্যবস্থা করে দিবেন।

একটি দেশের অধিক জনসংখ্যা যদি জনসম্পদে রূপান্তরিত হয় তবে সেখানে আর জনসংখ্যা কোনো সমস্যা নয়। বরং রূপান্তরিত জনসম্পদ দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। কেবল দক্ষ জনসম্পদ তৈরি নয়, জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা যায়। তবে কাম্য জনসংখ্যার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

শিক্ষার্থীর কাজ	জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের পাঁচটি উপায় লিখুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে বিশ্বের অনেক দেশেই জনসংখ্যা কোনো সমস্যা নয়। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করা যায়। সবার জন্য কর্মসংস্থান তৈরি হলে কেউ আর সমাজের বোঝা নয়। সবাই মিলেই দেশ ও সমাজের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ কত একর?

(ক) ২.০০ একর (খ) ২০০ একর

(গ) ২০.০০ একর (ঘ) ০.২০ একর

২। বাংলাদেশে (২০১৬) মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ দরিদ্র এবং হতদরিদ্র?

(ক) ৫০ শতাংশ এবং ৩২ শতাংশ (খ) ৩২ শতাংশ এবং ২০ শতাংশ

(গ) ৩১.৫ শতাংশ এবং ১৭.৬ শতাংশ (ঘ) ২০ শতাংশ এবং ০৮ শতাংশ

৩। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের সবচেয়ে ভালো উপায় কোনটি?

(ক) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (খ) কারিগরী ও কর্মমুখী শিক্ষার বিস্তার

(গ) শিক্ষার হার বৃদ্ধি (ঘ) শিল্পায়ন

পাঠ-১৩.৭ মাদকাসক্তি
Drug addiction

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মাদকাসক্তি এবং এর উপসর্গ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মাদকাসক্তির কারণ এবং প্রতিরোধের উপায় নির্দেশ করতে পারবেন;
- সমাজে মাদকাসক্তির প্রভাব ব্যাখা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মাদকাসক্তি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

মাদকাসক্তি সমাজের জন্য এক অভিশাপ। কোনো পরিবারে মাদকাসক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি থাকলে কেবল তারাই এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারে। মাদকাসক্তি একটি সমাজে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ডেকে আনতে পারে। তরুণ সমাজ মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে তারা তাদের কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে। তখন আর ওই সমাজ সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। ফলে যেকোনো সমাজের জন্যই মাদকাসক্তি একটি সমস্যা। এর থেকে উত্তরণের জন্য সামাজিক সচেতনতা ও সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

মাদকাসক্তি কী (What is drug addiction)

মাদক দ্রব্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে মাদকাসক্তি। বিভিন্ন ব্রান্ডের তরল মদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের হিরোইন, ইয়াবাসহ এলকোহল সমৃদ্ধ যে কোনো দ্রব্যের প্রতি অনিয়ন্ত্রিত আসক্তি বা আগ্রহকে মাদকাসক্তি বলে। গাঁজা, চরস যেমন নেশাদ্রব্য হিসেবে পরিচিত এবং ব্যবহৃত হয় তেমনি ফেনসিডিলসহ কিছু ঔষধও নেশাদ্রব্য হিসেবে বহুলপ্রচলিত। পথশিশু বা বস্তির দরিদ্র ছেলে-মেয়েরা অনেকসময় পলিথিনের মধ্যে জুতার আঠা লাগিয়ে নেশা করে। টিকটিকির লেজ পুড়িয়েও নেশার কথাও শোনা যায়। উপকরণ যা ই হোক না কেনো, কোনো কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নেশাদ্রব্য গ্রহণের বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাকে মাদকাসক্তি বলে অভিহিত করা যায়। মাদকদ্রব্যে আসক্ত ব্যক্তি একসময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং অস্বাভাবিক আচরণ করে। সাধারণত যে যে দ্রব্যে আসক্ত হয়, সে ওই দ্রব্যটি গ্রহণেই তৎপর থাকে। মাদকে আসক্ত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট উপকরণের পাশাপাশি প্রায়শ সময়, স্থান এমনকি সঙ্গীও নির্দিষ্ট থাকে।

কোনো ব্যক্তি মাদকে আসক্ত হয়ে পড়লে তার মধ্যে কিছু উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা যায়। পরিবার ও বন্ধু-স্বজনদের সচেতন পর্যবেক্ষণে এসব উপসর্গ ধরা পড়ে। যেমন:

০১) ক্ষুধামন্দা, খাবারে অরুচি ও অনীহা;
০২) রাতজাগা, সকালে অধিকবেলা পর্যন্ত ঘুমানো,;
০৩) স্বাস্থ্যহানী এবং মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া;
০৪) স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক হাত-খরচ বা যেকোনো উপায়ে বেশি বেশি টাকা নেয়া;
০৫) নেশাগ্রস্থ বন্ধুদের সাথে উঠা-বসা, আড্ডা, সময় কাটানো;
০৬) বেশি রাতে বাড়ি ফেরা, বাড়ির বাইরে অনেক বেশি সময় অবস্থান করা;
০৭) নির্জীব এবং ঝিমমেরে থাকা
০৮) স্বাস্থ্য-চেহারার প্রতি উদাসীনতা;
০৯) লেখাপড়া, পরিবার ও অফিসের কার্যক্রমে অনীহা
১০) সবার সাথে মেলামেশায় স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব ইত্যাদি।

মাদকাসক্তির কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়

মাদকাসক্তির অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যেমন:

১) **সঙ্গী-সাথীর প্রভাব:** কিশোর-কিশোরী কিংবা তরুণ-তরুণীর মাদকাসক্তির প্রধান কারণ হচ্ছে মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথী। মাদক কোথায় পাওয়া যায়, কীভাবে সেবন করে ইত্যাদি বন্ধু-সাথীদের থেকেই জানা যায়।

২) **কৌতূহল:** কৌতূহল থেকে অনেকেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। ইয়াবা, গাঁজা, ফেন্সিডিল, মদ ইত্যাদি সেবন কিংবা পান করলে কেমন লাগে, কী অনুভূতি হয় তা জানার আগ্রহ থেকে অনেকে মাদকের জগতে প্রবেশ করে।

৩) **হতাশা:** অনেকে হতাশা থেকেও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। পারিবারিক অশান্তি, প্রেমে ব্যর্থতা কিংবা শিক্ষা ও পেশাগত জীবনের হতাশা ভুলতে অনেকে মদের নেশায় ডুবে যায়।

৪) **সহজলভ্যতা:** মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ হচ্ছে মাদকের সহজলভ্যতা। গাঁজা, ইয়াবা, ফেন্সিডিলসহ অনেক মাদকদ্রব্য হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। বিক্রেতারা চাহিদার ভিত্তিতে অনেক সময় ক্রেতার কাছে এগুলো পৌঁছেও দেয়।

৫) মাদক বাণিজ্য ও পাচার: মাদক বাণিজ্য ও পাচারের মাধ্যমে অনেকে রাতারাতি কোটিপতি হয়েছেন। দ্রুত ধনী হওয়ার জন্য অনেকে মাদক বাণিজ্য ও পাচারের যুক্ত হয়। এর প্রভাব পড়ে যুবসমাজের উপর। তারা সহজে মাদক পেয়ে যায়।

৬) **পরিবারের উদাসীনতা:** পরিবারের অসচেতনতা ও উদাসীনতা সন্তানদেরকে মাদকাসক্ত করে তুলতে পারে। বাবা-মা দু'জনই যদি অনেক বেশি ব্যস্ত থাকেন তবে সন্তানকে সময় দিতে পারেন না। বিত্তশালী পরিবার প্রায়শ সন্তানের হাতে পর্যাপ্ত টাকা তুলে দেন। বাড়তি টাকা সন্তানকে নেশার জগতে ঠেলে দিতে পারে।

৭) **আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির অভাব:** মাদক আমদানী, পাচার, পরিবহন, মজুদ, সংরক্ষণ, বিপনন, অপ্রাপ্তদের মাদক সেবন ইত্যাদি বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির অভাব রয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরেরও কার্যকর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ফলে মাদকের বিস্তার ঘটে।

৮) **মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞতা:** কিশোর-তরুণদের অনেকেই মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানে না। মজা করতে করতে কৌতূহলবশত তারা মাদকের অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে। কিন্তু এটি ধীরে ধীরে ধ্বংস এবং মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়– এ বিষয়ে তাদের অনেকেই সচেতন নয়।

৯) **মুক্ত গণমাধ্যম ও আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাব:** প্রচলিত টিভি-সিনেমা ছাড়াও এখন ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টগ্রামে দেশি-বিদেশি নাটক-সিনেমা, সিরিয়াল, পর্ণোছবি ইত্যাদি অনেক সহজলভ্য। এগুলোর প্রভাবে অনেকে মাদকের জগতে প্রবেশ করে।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে তা হচ্ছে: ১) পরিবারের সচেতনতা, সতর্কতা ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীলতা, ২) মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা, ৩) বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা, ৪) মাদকের উৎস নিয়ন্ত্রণ, ৫) আইনের কঠোর প্রয়োগ ইত্যাদি।

সমাজে মাদকাসক্তির প্রভাব (Impact of drug addiction in society)

মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। সমাজে মাদকাসক্তির বহুমুখী বিরূপ প্রভাব রয়েছে। বস্তুত মাদকাসক্তির কোনো সুফল নেই; কেবলই ক্ষতিকর প্রভাব। এখানে সমাজে মাদকাসক্তির প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

০১) **পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয়:** মাদকাসক্ত ব্যক্তি পরিবার ও সমাজের কারো সাথেই সুন্দর, সাবলিল ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে পারে না। তারা খিটখিটে স্বভাবের হয়, তুচ্ছ ঘটনায় রেগে যায় এবং নির্জনে একাকি থাকতে পছন্দ করে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয়।

০২) **অশান্তি তৈরি হয়:** যে পরিবারে একজন মাদকাসক্ত রয়েছে সে পরিবারে শান্তি বা স্বস্তি বলে কিছু থাকে না। মাদকাসক্তের মাতলামি, বেপরোয়া মনোভাব, টাকার জন্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণ পরিবার ও প্রতিবেশীর শান্তি বিনষ্ট করে। নেশার টাকার জন্য চুরি, ছিনতাই, পরিবারের সদস্যদের মারধোর এমনকি খুনের মত ঘটনাও বিরল নয়।

০৩) **তরুণরা তাদের কর্মক্ষমতা হারায়:** নেশা মানুষকে নির্জীব করে তোলে এবং ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

মাদকাসক্ত ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। কাজে অনিয়মিত, অদক্ষ এবং অক্ষম হওয়ায় মাদকাসক্ত ব্যক্তির পেশাগত ঝুঁকি তৈরি হয়।

০৪) **সমাজের বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়:** কোনো সমাজের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক তরুণ মাদকাসক্ত হলে ওই সমাজের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। একজন সুস্থ-সবল স্বাভাবিক মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রে যে অবদান রাখতে পারে, একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি কখনো তা পারে না। ফলে মাদকাসক্তি সমাজের বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে।

০৫) **নানা ধরনের রোগ-ব্যাধি হতে পারে:** ক্যান্সার, লিভার সিরোসিসসহ নানা ধরনের রোগ-ব্যাধির জন্য মাদকাসক্তিকে দায়ী করা হয়। এসব অসুস্থতা জটিল এবং ব্যয়বহুল এমনকি মরণঘাতী। ফলে মাদকাসক্ত একজন মানুষ একটি পরিবারকে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মাদকাসক্তির কারণ এবং সমাজে এর প্রভাবগুলো চিহ্নিত করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মাদকাসক্তি পরিবার ও সমাজের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। কোনো মানুষ যেকোনো ধরনের নেশাদ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তাকে মাদকাসক্তি বলে। মাদকের সহজলভ্যতা, পরিবারের উদাসীনতা, হতাশা-ব্যর্থতা, বেকারত্ব, লাইফ-স্টাইল, মাদক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, আইনের কঠোর প্রয়োগের অভাব ইত্যাদি মাদকাসক্তির প্রধান কারণ। পরিবার ও সমাজের সচেতনতা, আইনের কঠোর প্রয়োগ ইত্যাদি মাদক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। মাদকাসক্তি প্রতিহত করতে না পারলে পরিবার ও সমাজ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি মাদকাসক্তির উপসর্গ?

(ক) আড্ডাবাজ হওয়া (খ) ক্ষুধামন্দা, মেজাজ খিটখিটে হওয়া

(গ) কর্মতৎপরতা (ঘ) অধিক মাত্রায় ঘুমানো

২। মাদকাসক্তির প্রধান কারণ কোনটি?

(ক) অধিক উপার্জন (খ) দারিদ্র্য

(গ) অধিক জনসংখ্যা (ঘ) পরিবারের উদাসীনতা ও সঙ্গী-সাথীর প্রভাব

৩। নিচের কোনটি মাদকাসক্তির প্রভাব?

(ক) নিরক্ষরতা (খ) অপরাধ প্রবণতা

(গ) পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয় ঘ) কুসংস্কার

পাঠ-১৩.৮ দুর্নীতি
Corruption

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- দুর্নীতির সংজ্ঞা ও ধরন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- দুর্নীতির কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দুর্নীতি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

সম্পদ আহরণ ও ভোগের প্রবৃত্তি থেকেই জন্ম নেয় দুর্নীতির। মানুষের অনিবার্য মৌলিক চাহিদা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা, লোভ, উচ্চাশা থেকে দুর্নীতির উদ্ভব। এটি একটি মানসিক প্রবৃত্তি। দুর্নীতি সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ। দুর্নীতি দারিদ্র্য ও বৈষম্য বাড়ায় এবং সমাজের ন্যায়নীতিকে বিপন্ন করে তোলে। আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, শাসন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জনগণের জন্য রাষ্ট্রীয় সেবা, মানবাধিকার সর্বত্র দুর্নীতির কালো থাবা। সমাজ ও সংস্কৃতিতে দুর্নীতি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। বাংলাদেশ বার বার বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এখনই রুখে না দাঁড়ালে দুর্নীতি আরো ভয়াবহ রূপ লাভ করবে।

দুর্নীতির সংজ্ঞা (Definition of corruption)

সাধারণ অর্থে দুর্নীতি হচ্ছে সততা ও নীতি-নৈতিকতা (Morality) পরিপন্থী কাজ। ব্যাক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে দুর্নীতি (Abuse of entrusted power for personal gain)। দুর্নীতি প্রায়শ ক্ষমতার সাথে যুক্ত। যে দুর্নীতি করে সে কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার অধিকারী। তবে সব ক্ষমতাধর ব্যক্তিই দুর্নীতিবাজ নন। ঘুষ লেনদেন, সম্পদ আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতি, চাঁদাবাজী, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি দুর্নীতি বলে পরিগণিত।

বস্তুত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি তার বা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করেন তবে তা হবে দুর্নীতি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যা করার কথা তা না করা কিংবা যা করার কথা নয় তা করাকে দুর্নীতি বলে। বিশ্বের সর্বত্রই কম-বেশি দুর্নীতি ছিলো, আছে এবং হয়ত আগামীতেও থাকবে।

দুর্নীতির ধরন (Types of corruption)

দুর্নীতি প্রধানত দু'প্রকার। যথা:

ক) ক্ষুদ্রকার দুর্নীতি (Petty corruption) এবং খ) বৃহদাকার দুর্নীতি (Grand corruption)

ক্ষুদ্রকার দুর্নীতি হচ্ছে ছোট পরিসরে, স্বল্পমাত্রার দুর্নীতি। সাধারণত দৈনন্দিন প্রয়োজনে স্বল্পমাত্রার ক্ষমতাধারীরা এ ধরনের দুর্নীতিতে যুক্ত থাকে। ক্ষুদ্রাকার দুর্নীতিতে টাকার অঙ্ক যেমন কম থাকে তেমনি এর ক্ষতিকর প্রভাবও খুব বেশি নয়। পঞ্চাশ/একশ থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ লেনদেন বা অর্থ আত্মসাৎ, পরিবার, আত্মীয়-বন্ধুকে ছোট-খাটো চাকরি বা সুবিধা প্রদান, দায়িত্বে অবহেলা, অফিস ফাঁকি ইত্যাদি ক্ষুদ্রাকার দুর্নীতির উদাহরণ।

বৃহদাকার দুর্নীতি হচ্ছে ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ বা নীতিনির্ধারকদের বড় আকারের দুর্নীতি। এ ধরনের দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়। এর ক্ষতিকর প্রভাবও অনেক বেশি। সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিবিদ, জায়ান্ট ব্যবসায়ী প্রমুখ বৃহদাকার দুর্নীতির সাথে যুক্ত। সাধারণত কোনো কোম্পানীকে কাজের অনুমতি বা ছাড়পত্র, টেন্ডার, সরকারি কেনাকাটা, সরকারি সম্পদ ইজারা প্রদান, নির্বাচন, ক্ষমতার পালাবদলে কারসাজি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৃহদাকার দুর্নীতি সংঘটিত হয়।

দুর্নীতির কারণসমূহ (Causes of corruption)

দুর্নীতি একটি মানসিক প্রবণতা। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা কারণে মানুষের এ প্রবণতা সক্রিয় হয়ে উঠে। পদ্ধতিগত (Systematic) দুর্বলতাও দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। এখানে দুর্নীতির বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হলো।

১) মৌলিক চাহিদা পূরণে নাজুকতা: দুর্নীতির অন্যতম কারণ হচ্ছে ব্যক্তি ও পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে সৃষ্ট নাজুকতা। ক্ষুদ্রায়তনের দুর্নীতির একটি বড় অংশ মৌলিক চাহিদার সাথে সম্পর্কিত। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' প্রবাদটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

২) লোভ বা উচ্চাশা: লোভ মানুষের নৈতিকতাকে হত্যা করে। উচ্চাশা মানুষকে বেপরোয়া করে তোলে। বিদ্যমান বেতন, সম্পদ, সম্মান ও অবস্থান নিয়ে অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তারা স্বল্প সময়ে সংক্ষিপ্ত উপায়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে কোনোকিছু করতে দ্বিধা করে না। ফলে দুর্নীতির বিস্তৃতি ঘটে।

৩) অন্যের সাথে তুলনা: সহকর্মীদের কেউ কেউ ঝলমলে জীবন-যাপন করেন। তাদের বাড়ি-গাড়ী, গহনা, পোশাক-পরিচ্ছদ অন্যের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বিত্তশালী এসব সহকর্মীদের দ্বারা অন্য অনেকে প্রভাবিত হন। 'অমুক পারলে আমি কেন নয়'? চূড়ান্ত বিচারে দুর্নীতির চর্চা বৃদ্ধি পায়।

৪) পরিবার, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রভাব: স্ত্রীর উচ্চাভিলাষ, স্বামীর লোভ, সন্তানের অবাঞ্ছিত আবদার, পিতা-মাতা কিংবা ভাই-বোনের সীমাহীন চাহিদা ব্যক্তিকে দুর্নীতির দিকে ঠেলে দেয়। নির্দিষ্ট উপার্জন অপেক্ষা অতিরিক্ত, অপ্রত্যাশিত, অবাঞ্ছিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ আয় সম্পর্কে নীরব থাকা দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে।

৫) ক্ষমতার অপব্যবহার: দুর্নীতি মূলত ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। রাজনীতিবিদ, সরকারের আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, পুলিশ, প্রশাসন, নিরীক্ষা অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সবাই নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। ক্ষমতাবান এসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে দুর্নীতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

৬) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব দুর্নীতির উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে। তথ্য গোপন এবং জবাবদিহিতার অভাব ক্ষমতাবানদের স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। অফিসের দায়দায়িত্ব, মানুষের অধিকার, সরকারি সেবা ইত্যাদি বিষয়ে অবারিত তথ্যের অভাব দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। আবার জনগণ, রাষ্ট্র কিংবা বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহিতা না থাকলে দুর্নীতির অবাধ সুযোগ তৈরি হয়।

৭) আইনের শাসনের অভাব: আইনের শাসনের অভাব দুর্নীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আইন, বিধি-বিধানকে পাস কাটিয়ে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা, বিশেষ কোনো সম্পর্ক দ্বারা শাসন ব্যবস্থা প্রভাবিত হলে সেখানে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়।

৮) সুশাসনের অভাব: অবাধ তথ্য প্রবাহ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন হচ্ছে সুশাসনের মূল ভিত্তি। সুশাসনের অভাবে দুনীতির বিস্তার ঘটে। যে দেশ যত বেশি সুশাসনের চর্চা করে তারা তত কম দুর্নীতিগ্রস্থ।

৯) দুর্নীতিবাজদের শাস্তির অভাব: অধিকাংশ দুর্নীতিবাজ খুব চতুর, কৌশলী এবং ক্ষমতাধর। প্রমাণের অভাবে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা এবং শাস্তি নিশ্চিত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। যেকোনো উপায়ে তারা প্রায়ই পার পেয়ে যায়। ফলে দুর্নীতির চর্চা আরো বেড়ে যায়।

১০) দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানের অকার্যকারিতা: দুর্নীতি দমন কমিশন, অডিট এন্ড জেনারেল অফিস, এনবিআর, জাতীয় সংসদ এবং এর বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি, বিচার বিভাগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ভূমিকার অভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় (Way of combat corruption)

দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন বহুমুখী উদ্যোগ। এখানে দুর্নীতি প্রতিরোধের কিছু উপায় তুলে ধরা হলো:

১। রাজনৈতিক সদিচ্ছা: বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধের পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা (Political will)। গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় মূল ক্ষমতা রাজনীতিবিদদের হাতে। শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অবলম্বন করেন তবে তার সরকারের অন্য কেউ দুর্নীতি করার সাহস দেখাবে না।

২। দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ভূমিকা: দুর্নীতি দমন কমিশন, অডিট এন্ড জেনারেল অফিস, এনবিআর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখলে দুর্নীতি প্রতিরোধ অনেকাংশে সম্ভব।

৩। আইনের শাসন এবং দুর্নীতিবাজদের শাস্তি নিশ্চিত করা: 'আইন সবার জন্য সমান' এ শ্বাশ্বত বাক্যকে বাস্তব রূপ দিতে হবে। সবরকমের স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব পরিহার করে দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। 'দুর্নীতি করলে ক্ষমা নেই' এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে অনেকেই দুর্নীতি করতে সাহস পাবে না।

৪। সুশাসন এবং স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতার চর্চা করা: দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসনের বিকল্প নেই। সুশাসনের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা। 'গোপনীয়তার সংস্কৃতি' থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছতার চর্চা করা জরুরি।

৫। গণমাধ্যমের বলিষ্ঠ ভূমিকা: দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণমাধ্যম অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দুর্নীতির খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। আবার দুর্নীতির খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার ভয়ে অনেকে দুর্নীতি থেকে বিরত থাকেন।

৬। দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন: দুর্নীতি প্রতিরোধে সমাজের সব স্তরের, সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সোচ্চার ও সক্রিয় হতে হবে। নাগরিক সমাজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন, দুর্নীতির কুপ্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে পলিসি এ্যাডভোকেসি করতে পারে। 'যেখানে দুর্নীতি সেখানে প্রতিরোধ' নীতিতে তরুণ সমাজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হতে পারে। দুর্নীতিবিরোধী গবেষণা ও সামাজিকভাবে দুর্নীতিবাজদেরকে বয়কট করার মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে আরো বেগবান করা যেতে পারে।

৭। মৌলিক চাহিদা পূরণ ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধি: ছোট পরিসরের দুর্নীতির একটি বড় অংশের প্রধান কারণ হচ্ছে অভাব, মৌলিক চাহিদা পূরণে সীমাবদ্ধতা। বেতন-ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মধ্যমে এ ধরনের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৮। সম্পদের সুষম বণ্টন ও ন্যায়বিচার: ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা গেলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের অধিকার ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রিত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	দুর্নীতির কারণসমূহ এবং প্রতিরোধের উপায়গুলো লিখুন।	**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

দুর্নীতি হচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা। অতীত-বর্তমান, উন্নত-অনুন্নত প্রতিটি দেশ ও সমাজে কমবেশি দুর্নীতি ছিল এবং আছে। সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে দুর্নীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। আবার এগুলোর চর্চা এবং দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দুর্নীতি প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলনও বিশেষভাবে কার্যকর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দুর্নীতির মূলে রয়েছে–
(ক) উচ্চশিক্ষা (খ) রাজনীতি
(গ) দারিদ্র্য (ঘ) ক্ষমতার অপব্যবহার

২। দুর্নীতি প্রধানত কয় ধরনের?
(ক) দুই ধরনের (খ) তিন ধরনের
(গ) চার ধরনের (ঘ) পাঁচ ধরনের

৩। নিচের কোনটি দুর্নীতি প্রতিরোধে অধিকতর কার্যকর?
(ক) বেতন-ভাতা বৃদ্ধি (খ) সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা
(গ) শিক্ষার হার বৃদ্ধি (ঘ) আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. বাংলাদেশে বর্তমানে (২০১৭) কত শতাংশ মানুষ নিরক্ষর?
ক) ২০ শতাংশ খ) ২৫ শতাংশ গ) ৩০ শতাংশ ঘ) ৩৫ শতাংশ

২. বর্তমানে (২০১৬) বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
ক) ০.৭৯ শতাংশ খ) ১.৩৭ শতাংশ গ) ১.৭৯ শতাংশ ঘ) ২.১১ শতাংশ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩। সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য-
i. অবাঞ্চিত ও ক্ষতিকর
ii. গৌণ বিচ্যুতি
iii. জনগণের সচেতনতা
সঠিক উত্তর কোনটি?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:

রুমা তাদের গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেছে। হঠাৎ তার বাবা মারা যান। গ্রামে কোনো কলেজও ছিল না। তাই তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। দু'বছর সে বাড়িতেই বসে থাকে। দরিদ্র মা তার বিয়ের চেষ্টা করলেও রুমা তাতে রাজি হয়নি। সে মাকে সহযোগিতার জন্য কাজ খুঁজছিল। কিন্তু তার যোগ্যতা ও প্রত্যাশিত মজুরির কোনো কাজ পাচ্ছিল না। সে দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ছিল।

(ক) রুমা যে অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তাকে কী বলে? ১
(খ) বেকারত্ব কয় প্রকার ও কি কি? ২
(গ) বেকার সমস্যার কারণগুলো কি কি? ৩
(ঘ) বেকার সমস্যা প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আপনার সুপারিশ তুলে ধরুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১	ঃ	১। গ	২। খ	৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২	ঃ	১। ঘ	২। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩	ঃ	১। ক	২। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫	ঃ	১। ক	২। খ	৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৬	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৭	ঃ	১। খ	২। ঘ	৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৮	ঃ	১। ঘ	২। ক	৩। খ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। গ	২। খ	৩। খ